রমলা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

পরম পূজ্যপাদ মাতামহদেব

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ., বি.এল.

শ্রীচরণকমলেষু

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

উপন্যাস

জীবনায়ন

সহযাত্রিণী

ছোট গল্প

সোনার হরিণ

কল্পলতা

ঋতুপর্ণ

ছেলেদের বই

অজয়কুমার

সোনার কাঠি

রক্তের মত রাঙা লালমাটির পথ। আলোছায়াময় দিগন্তের কোল হইতে নামিয়া, কত গিরিমালার তট দিয়া, কত শালবনের তলে তলে, কত গ্রামের পাশে পাশে আঁকিয়া বাঁকিয়া, কত নদী ডিঙাইয়া, কত প্রান্তর পার হইয়া পথটি চলিয়াছে; চলিতে চলিতে কখন যেন শ্রান্ত হইয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া পড়িয়াছে, আবার লাফাইয়া উঠিয়া সুদূর দিগন্তের নীল মায়ার দিকে ছুটিয়াছে।

পথ দিয়া একটি পুস্‌পুস্‌-গাড়ি অতি ধীরে চলিয়াছে। সাধারণতঃ পুস্‌পুস্‌-গাড়ি এত আস্তে যায় না; কিন্তু গাড়ির মধ্যে যে যুবকটি একা বসিয়া সান্ধ্যশ্রী দেখিতেছিল, সে পুস্‌পুস্‌ওয়ালাদের অতি ধীরে চালাইতে বলিয়াছে। তাহারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল, এত আস্তে চলিলে কাল সকালে হাজারিবাগ পৌছানো যাইবে না। যুবকটি জানাইল, তাহাতে কিছু আসে-যায় না। পথের ধারে গ্রামে গ্রামে খাবার পাইলে সে এই পার্ব্বত্যশোভাময় পথে কয়েকদিন কাটাইয়া যাইতে রাজী আছে।

যুবকটি একজন চিত্রশিল্পী। তাহার ছয়ফিট দীর্ঘ সুঠাম দেহ মাংসমেদ-বহুল নয়, পাৎলা ছিপছিপে চেহারা যেন প্রাণের ফোয়ারা; চুলগুলি একটু লম্বা, কোঁকড়ানো, ডান দিকে টেরি কাটা। রেখাবিহীন প্রশস্ত ললাটে যৌবনের টীকা জ্বলিতেছে। মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয়, ইহার অন্তরে কিসের আগুন অহর্নিশি জ্বলিতেছে, স্বপ্নময় দীর্ঘ চোখ দুইটির উপর চশমার কাঁচ দুইটি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। সরু লম্বা নাকে প্যাঁস্‌নের নাকীটি সুন্দরভাবে লাগানো। দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখের

গঠন একটু লম্বা। চোয়াল দৃঢ় প্রশস্ত হইলেও চিবুক-অধর অতি সুকুমার কোমল, তরুণীর আননের মত তারুণ্যমণ্ডিত। চুলগুলি লম্বা বলিয়াই হউক বা মাথার পিছনটা একটু উঁচু বলিয়াই হউক, মাথার তুলনায় গলাটা একটু সরু দেখায়; সবচেয়ে সুন্দর তাহার লম্বা আঙুলগুলি, যেন রঙের আগুনের শিখা। হাঁটু উঁচু করিয়া তাহার উপর দুই হাতের আঙুলে আঙুলে জড়াইয়া হাত রাখিয়া দূরপথের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। হাতে সোনার আংটির নীলাটি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

পিছনে নীল পাহাড়ের সারি সুন্দরীর নীলাম্বরী শাড়ীর মত গোধূলির আলোয় ঝলমল করিতেছে। দুই পাশের শালের বনে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ অন্ধকার রহস্যলোকের মত জমা হইতেছে। পথটি সেখানে অনেকখানি নামিয়া আসিয়া, অতি ঋজুভাবে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। গাড়ি হইতে নামিয়া যুবকটি গাড়ির আগে আগে জোরে চলিতে লাগিল। সে যেন বীরপথিক, দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া কাহাকে সে জয় করিবার জন্য চলিয়াছে, মনে এই ভাবটি জাগাইয়া পায়ে পায়ে চলিয়া সে চড়াই পথে উঠিতে লাগিল। পথের উচ্চ সীমায় উঠিতেই সম্মুখে সূর্য্যাস্তের অপরূপ রূপে স্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইল। তেপান্তরের মাঠের মত শূন্য প্রান্তর দিগন্তের সহিত গিয়া মিলিয়াছে। তাহারই উপর চক্রবাল রাঙাইয়া রক্তমেঘস্তূপে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, যেন কোন নীড়-হারা পথিক-বিহঙ্গ দুই রাঙা ডানা মেলিয়া দিনশেষে রাত্রির অনন্ত তারা-লোকের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে, কোন্ প্রেম-বেদনায় তীর-বিদ্ধ তাহার চঞ্চল বক্ষ হইতে রক্ত চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, পাহাড়ের মাথায় মাথায়, শালগাছের পাতায় পাতায় তাহারই বুকের রক্তবিন্দু উপলমণির মত জ্বলিতেছে। ওই রক্ত মেঘগুলি তাহারই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পালকের দল, এই প্রান্তরভরা রাঙা আলো তাহারই বুকের আগুন; বনের মর্ম্মরে, শূন্যপ্রান্তরে হাওয়ায় নৃত্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে

তাহারই পক্ষসঞ্চালনের শব্দ শোনা যাইতেছে, রাত্রির অন্ধকারপারে কোন্ নব অরুণ লোকের দিকে হু হু করিয়া সে উড়িয়া চলিয়াছে—

যুবকটি লাফাইয়া উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।"

গাড়িটি যখন যুবকের নিকট আসিয়া পৌছাইল, সে চালকদিগকে তাহাদের চীৎকার ও গাড়িচালানো থামাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইতে বলিল। নিকষমণির মত কালো এই পাহাড়ের ছেলেরা তাহাদের যাত্রীটির দিকে অবাক হইয়া তাকাইল, প্রতিদিনের সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন কি অসামান্য সৌন্দর্য্য আছে, যে, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যুবকটি আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার গাড়ি থামাইয়া গাড়ির ভিতর হইতে সে চাম্ড়ার ব্যাগটা বাহির করিল। ব্যাগটা খুলিয়া আঁকিবার সরঞ্জাম তুলিগুলির পাশ হইতে লেপ্চা বাঁশীটা তুলিয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া নাগ্রা জুতাটা খুলিয়া গাড়ির সম্মুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গাড়ি চালাইতে বলিল। গাড়ির চাকা লাল ধূলি উড়াইয়া করুণ আর্ত্তনাদে চলিল; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বাঁশীতে এক নেপালী গান বাজাইতে লাগিল। সরল দীপ্ত পাহাড়ী সুরে কুলিদের মনগুলিও সাড়া দিয়া উঠিল, বাঁশরী-তান-মুখর রাঙা-আলো-ভরা পথ দিয়া তাহারা আনন্দের সঙ্গে গাড়ি টানিতে টানিতে চলিল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নির্ব্বিবাদে বাঁশী বাজানো চলিল না, পিছন হইতে এক মোটরকারের হুঙ্কারধ্বনি বনপথ ধ্বনিত করিয়া আসিতে লাগিল। মেল্ সার্ভিসের মোটরকার ষ্টেসন হইতে যাত্রী লইয়া আসিতেছে।

মোটর-লরি তখন কিছু দূরে ছিল ; তবু কুলিরা অতি সন্ত্রস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়া, পথের এক পাশ দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ি টানিতে লাগিল, পাশের বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে যেন তাহারা বাঁচিয়া যায়। যন্ত্রযানের গর্জ্জনের সঙ্গে বাঁশী অনেকক্ষণ পাল্লা দিল বটে, কিন্তু কল-দৈত্যের হুঙ্কারেব সঙ্গে ব্যাকুলবেণু কতক্ষণ পারিয়া উঠিবে—বিরক্ত হইয়া যুবকটি গাড়িটা পথের এক পাশে রাখিতে বলিয়া নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুই রক্তবর্ণ চক্ষু জ্বালাইয়া মোটর-লরি নিকটে আসিল এবং তাহাদেরই সম্মুখে আসিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। কি একটা যন্ত্র খারাপ হইয়াছে বলিয়া ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নামিয়া কল ঠিক করিতে শুরু করিল।

যুবকটি পথের পাশে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল, মোটরকারের দিকে চাহিয়া দেখা আবশ্যক বোধ করে নাই। কিন্তু মোটর থামিলেই তাহার মনে হইল, কে যেন পিছন হইতে তাহার দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, গাড়িভরা যাত্রী যেন তাহারই দিকে চাহিয়া, অস্পষ্ট আলোয় তাহাদের স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কেবল কতকগুলি নানা রংএর ছায়ামূর্ত্তি। তবু প্রথম বেঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে যে মূর্ত্তিটি রাঙা নদীজলের মত টলমল করিতেছিল, তাহাকে সে চিনিল। ওই শ্যাম্পেন রংএর শাড়ীপরা মেয়েটির সঙ্গেই তো সে কলিকাতা হইতে এক ট্রেনে এক কম্পার্টমেণ্টে আসিয়াছে। তাহার চম্পক-মুখে গোধূলির আলো যেন লোধ্ররেণু মাখাইয়া দিয়াছে। ওই আবেশময় চোখ দুইটি রঙীন স্বপ্নে ভরা, অজন্তার চিত্রশিল্পীরা আপন অন্তরের রং ও আনন্দ দিয়া নারীর যে আঁখি আঁকিয়া গিয়াছেন, সেই দীর্ঘপল্লবঘন সারঙ্গ-নয়ন তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল, গণ্ডের কালো তিলটি দেখা যাইতেছিল না, শুধু তমাল-দীঘির সন্ধ্যাজলের মত দুইটি স্নিগ্ধ চোখ।

কল ঠিক করিয়া ড্রাইভার মোটরে উঠিল। মোটর-লরি আবার গর্জ্জন করিয়া নড়িল। তরুণীর স্থির চোখ দুইটি নদীর ঢেউয়ের মত দুলিয়া ছলছল করিয়া উঠিল, দীপ্তমুখে কি দুষ্টামিভরা হাসি খেলিয়া গেল। তার পর সেই তরুণী হাতের নীল রুমালটা তাহারই দিকে, হাঁ, তাহারই দিকে নাড়িতে নাড়িতে পথের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

মোটর-লরি যখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পিছনের আলোটা আর দেখা যাইতেছে না, শুধু সম্মুখে পথের শেষপ্রান্তে দুইটি তারার আলো জ্বলজ্বল করিতেছে, যুবকটি তখন ধীরে গাড়িতে উঠিয়া বসিল এবং জোরে গাড়ি চালাইতে বলিল। বাহকেরা চীৎকার করিতে করিতে গাড়ি লইয়া ছুটিল।

বাঁশী বাজাইতে আর ইচ্ছা রহিল না। গাড়ির সব জান্‌লা খুলিয়া একটা বালিশে অর্দ্ধহেলান ভাবে বসিয়া যুবকটি পকেট হইতে এক সিগার বাহির করিল, কিন্তু দেশলাইটা বাহির করিয়া দেখিল, ট্রেনে সব কাঠি নিঃশেষিত হইয়াছে! কুলিদের নিকট হইতে একটা দেশলাই চাহিয়া লইয়া সে তাহাদিগকে সিগারেট দিতে গেল। তাহারা একটু আশ্চর্য্য হইয়া আপত্তি জানাইল, পরের গ্রামে গিয়া তাহারা তামাক খাইবে। শুধু দলের মধ্যে যে সব চেয়ে অল্পবয়স্ক ছিল, সে একটা সিগার চাহিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল।

গিরিবনপ্রান্তরে সন্ধ্যার কালো ছায়া নিবিড় হইয়া আসিতেছে, পশ্চিমের রক্তমায়া মিলাইয়া যাইতেছে, যেন রাঙা গোলাপের পাতাগুলি ধীরে ধীরে কালো হইয়া আসিতেছে। একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে।

বালিশে হেলান দিয়ে সিগার টানিতে টানিতে এই আলো-ছায়াময় উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া অনেক কথাই যুবকটির মনে পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সম্মুখে নবমীর চাঁদ উঠিল; তাহারই রুপালী

আলো শালবনের অন্ধকারে দৈত্যপুরে সুপ্ত কোন্ রাজকন্যার জন্য যেন পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে ; ছোট পাহাড়গুলিকে দেখাইতেছে যেন দৈত্যেরা সারি বাঁধিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই তারাভরা আকাশের তলায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে জ্যোৎস্নার মায়ালোকে রূপকথা-রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়, অন্তরের অনন্তকালের রাজপুত্র জাগিয়া উঠে, এই গিরিবন লঙ্ঘন করিয়া তেপান্তরের মাঠের পর মাঠ পার হইয়া কোথায় যাইতে চায় ; অসীম তাহার আশা, দুর্জ্জয় তাহার শক্তি, দুর্গম তাহার পথ, সুদূরের বাণী তাহাকে ঘর ছাড়া করিয়াছে।

সিগার পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। তরুণীর বসিবার ভঙ্গীর অপূর্ব্ব সুষমাময় ছবিটি তাহার চোখে বার-বার জাগিতে লাগিল। ফুলের গন্ধে মৌমাছি যেমন আকুল হইয়া উঠে, এই তরুণীর মুখ তাহার মনে তেমনি নেশা জাগাইয়াছিল। বার বার সে ভাবিতেছিল, এ মুখ সে আজকে ট্রেনে নয়, ইহার পূর্ব্বেও কোথায় দেখিয়াছে ; ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিল না।

সিগারেটের বাক্স খুলিয়া একটি সিগারেট তৈরি করিয়া ধরাইল। এতক্ষণে মনে পড়িল, রসেটির আঁকা একখানা ছবি দেখিয়াছিল, তাহারই মত এই মুখখানি ; ছবিটার নাম মনে পড়িল না, নাই পড়ুক, রসেটির সেই ছবিখানি মূর্ত্তিমতী দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে শুধু এ মুখের গণ্ডে একটি তিল। প্রিয়ার তিল সম্বন্ধে হাফেজের কবিতা যখন সে পড়িয়াছিল, তখন সে তাহা কবির পাগ্‌লামী ভাবিয়াই মনে মনে হাসিয়াছিল ; আজ মনে হইল, সত্যই একটি তিলের জন্য ত্রিভুবন দেওয়া যায়।

বাহিরের প্রকৃতির মত সেও আপন মনে মায়াজাল বুনিতে লাগিল। তাহার এই তেইশ বছরের জীবন অনেক তরুণীর স্পর্শেই চঞ্চল রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও সে আশ্রয় খুঁজিয়া পায় নাই।

সূর্য্যাস্তের যে রক্ত-বিহঙ্গ রূপ সে দেখিয়াছিল, তাহারই মত তাহার প্রাণ, এ নীড়-হারা পথিক-পাখী নব নব সৌন্দর্য্যালোক পার হইয়া উড়িয়া চলিয়াছে।

তাহার প্রথম প্রেম হইয়াছিল এক পুতুলের সঙ্গে। সে যখন তিন বছরের, তখন তাহার মামা তাহাকে যে-জার্ম্মান পুতুলটা কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেই নানা রংএর সাজপরা মেমটাকে বুকে জড়াইয়া সে প্রথম রাত ঘুমাইতেই পারে নাই। তাহার বয়স যখন সাত বৎসর, সে তাহার সমবয়স্ক এক জ্যেঠতুতো বোনকে বড় ভালবাসিত; আচার চুরি হইতে লাট্টু ঘোরানো, পুকুরে নাওয়া, কুলগাছে চড়া, সব বিষয়ে বোনটিকে সঙ্গী না পাইলে কিছুই করিতে পারিত না। নয় বছর বয়সে সে তাহার এক বন্ধুর বোনকে ভালোবাসে। তাহাকে সে একদিন গাড়ি চড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিল মাত্র; পরদিন মাসিক পরীক্ষায় অর্দ্ধেক আঁক না কষিয়া ও অর্দ্ধেক আঁক ভুল কষিয়া আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে বন্ধুকে ডাকিতে যাইয়া বন্ধুর বোনকে গাছে দোল খাইতে দেখিত, তাহার সঙ্গে কোন দিন কথা হয় নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সে তাহার বোনের এক বন্ধুকে ভালোবাসে। সেবার তাহারা পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই সমুদ্রতীরে ঝিনুক-কুড়ানোর ভালোবাসা, যত সুন্দর ঝিনুক পাইত, সে তাহাকে আনন্দের সঙ্গে উপহার দিত। যাইবার সময় তাহার-দেওয়া অর্দ্ধেক ঝিনুক মেয়েটি ফেলিয়া গেল দেখিয়া সে সমস্ত রাত কাঁদিয়াছিল।

তার পর ঘরে বাহিরে পথে বিপথে কত তরুণীর চাউনিতে কৈশোরের কত দিন নেশার মত কাটিয়াছে, কত বিনিদ্র রাত্রিতে জ্যোৎস্না-সুধা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সেই শিশুকাল হইতে এ যৌবন পর্য্যন্ত সে যাহাদের ভালোবাসিয়াছে, তাহাদের অনুপম আনন্দের হাসি, যাহারা তাহাকে ভালোবাসিয়াছে তাহাদের তারার মত আঁখির আলো এই

মাধবীরাত্রে তাহার চারিদিকে স্বপ্নমায়া সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাক্স খুলিয়া আর-একটি নূতন বাঁশী বাহির করিয়া সে বাজাইতে শুরু করিল।

কয়েক ঘণ্টা চলিয়া কুলি বদল করিতে এক গ্রামের কাছে গাড়ি থামিল। এক আমগাছের তলায় বসিয়া কুলিরা তামাক খাইতে শুরু করিল। যুবকটি একটা সিগারেট ধরাইয়া গাড়ির পাশে পথের মাঝে দাঁড়াইল। মাথার উপর আকাশের স্নিগ্ধ নীলপর্দ্দার ঘেরাটোপ, তাহাতে মাঝে মাঝে তারার চুম্‌কিগুলি জ্বলিতেছে, চারিদিক অস্পষ্ট, আব্‌ছায়া, মাঝে মাঝে কালো রংএর ছোপ। সম্মুখে তরুছায়াসমাচ্ছন্ন গ্রামটি ঘুমন্ত। তাহার পাশ দিয়া পথের কালো রেখা তারালোকের সহিত গিয়া মিশিয়াছে, ঝিল্লী ও বাতাসের সন্ সন্ শব্দ হইতেছে।

সহসা একটা মোটরকারের হুঙ্কার শোনা গেল, যুবকটি সরিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই নিমেষের মধ্যে একখানি মোটরকার ভাঁটার মত চোখ জ্বালাইয়া তাহারই পাশে আসিয়া থামিয়া গেল। গাড়ি হইতে কোটপ্যাণ্ট পরিহিত একটি যুবক রুক্ষস্বরে বলিল—এই কুলি, হিঁয়া পানি মিলে গা?

একে মোটরকার তো তাহাকে চাপা দিতে দিতে রহিয়া গিয়াছে, তারপর এরূপ সম্ভাষণে যুবকটি সিল্কের পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইয়া—Who the devil! বলিয়া অগ্রসর হইল। মোটরের আলোয় তাহার চোখ এত ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে গাড়িতে কে বসিয়া আছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। অগ্রসর হইয়া দেখিল সাহেব নয়।

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখে মুখে চাহিয়া রহিল। তারপর বাঙ্গালি-সাহেবটি মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আনন্দের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—হ্যালো রজত, তুমি এখানে! এমন unearthly placeএ তোমায় দেখ্‌বো আমি dreamও কর্‌তে পারি নি! Excuse me, তোমায় mean করে' আমি কিছু বলিনি, বুঝ্‌তে পার্‌ছো!

যতীন রজতের হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিল।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল—তুমি যেরকম মোটর হাঁকিয়ে আস্‌ছিলে, আর যেরকম সাহেবী পোষাক পরে' ইংরেজী বল্‌চো, তোমায় চিন্‌তে আমার ভয় কর্‌ছে যতীন।

—Oh never mind! এই দেখো না, কুলিগুলো কি fool, গাড়িটা ডান দিকে রেখেছে, আর একটু হলে একটা accident হয়েছিল।

তাহাকে বাধা দিয়া রজত হাসিয়া বলিল,—না, আমাকে তুমি নেহাৎ এবার গাড়ি চাপা দিতে পার্‌লে না। মনে পড়ে, ইস্কুলে একদিন বেঞ্চি চাপা দিতে চেয়েছিলে? তা'ও তো পার নি।

উচ্চস্বরে প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়া রজতকে এক ঝাকুনি দিয়া যতীন বলিল,—হ্যালো ওল্ড বয়, কতদিন পরে দেখা বল তো?

—ও, অনেক দিন পরে। তা তুমি জল জল কি চেঁচাচ্ছিলে, তোমার তেষ্টা পেয়েছে?—বলিয়া রজত গাড়ি হইতে চিনেমাটির চিত্রিত ছোট কলসী বাহির করিল।

—না, না, আমার জলতেষ্টা নয়, আমার গাড়িটার।

—ও, তোমার ও দানবের তৃষ্ণা তো আমার এই এক কুঁজো জলে মিট্‌বে না।

৬/৯.৭৮

—তা মিট্‌বে না। তোমাদের কুলিদের আমি বরং জল আন্‌তে বল্‌ছি, তুমি ততক্ষণ একটা সিগারেট দাও দেখি।

কুলিদের ডাকিয়া জল আনিতে বলিয়া দুই বন্ধু পথের পাশে এক বড় কালো পাথরের উপর বসিল।

যতীন তাড়াতাড়ি ঘড়িটা দেখিয়া বলিল,—আমি তোমায় আধঘণ্টা সময় দিতে পারি। তা এ পথে কোথায় যাবে? আচ্ছা, মোটর সার্ভিস হয়েছে তো এ গাড়িতে কেন? চিরকাল দেখেছি, তুমি দেরি কর্‌তে পার্‌লে শীগ্‌গির কর্‌বে না।

—এমন সুন্দর রাত্তির আর চমৎকার পথটা, মোটরে সেই দম আটকে হুহু করে' গেলে কি সুখ বলো ?

—ও তোমার আর্টিষ্টের মত কথা হোলো বটে। আচ্ছা, আর্টিষ্ট হলেই কি কুঁড়ে হতে হবে ? তাতে কি কাজ চলে ? পশ্চিমের লোকেরা এগিয়ে চলেছে দেখো, এই মোটরকারের মত ; আর আমাদের দেশ—গোরুর গাড়ির মত ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে আর্ত্তনাদ করতে করতে কোনমতে চলেছে। প্রাণ চাই ! একে তো দেশটা ঝিমিয়ে পড়েছে, তার ওপর তোমরাও যদি আলস্যের মৌতাত লাগাও—

—তা হলে দেশের আর কোন আশাই নেই। ও নিরুদ্দেশ ছুটে মরার চেয়ে পথটা উপভোগ করতে করতে যাওয়া ভালো—

—যাক্ তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, ছোটবেলা থেকেই আমি যে-পাতায় অঙ্ক কসেছি, তার পাশেই তুমি ছবি এঁকেছো। তোমায় আমায় গরমিল হয়ে আস্‌ছে। এখন যাচ্ছ কোথায় ?

—হাজারিবাগে।

—বেড়াতে ?

—বেড়াতে ঠিক নয়, ছবি আঁক্‌তে।

—সেই বেড়াতেই হোলো।

—তা নয় হে, একটি ধনী ভদ্রলোক এক আর্টিষ্ট চান, তাঁর ঘরের দেওয়ালে ছবি এঁকে দেবে, তা ছাড়া বোধ হয় কয়েকখানা portraitও আঁক্‌তে হবে। আমার আঁকা ছবি exhibitionএ দেখেছিলেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তা হলে এদেশে আর্টিষ্টেরা নেহাৎ starve করে না দেখ্‌ছি ! আচ্ছা, ভদ্রলোকের কি রকম টাকা বল তো ? জমিদার ?

—তা তো বল্‌তে পারি না, ভাই।

—দেখ, যাচ্ছ, ও-সব খোঁজ রাখনি? আমি একটা apitalist খুঁজ্ছি, বেশি নয়—এখন বিশ লাখ টাকা হ'লেই বে, একটা কয়লার খনি, একটা মাইকার, আরও কয়েকটা আইডিয়া াছে।

—তা তুমি এখন কি করছ?

—আমি? ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সেই ফিরিঙ্গি প্রফেসারটার সঙ্গে ামার বক্সিং লড়াই জানো। তার সঙ্গে মারামারি করে' তো কলেজ ছড়ে দিলুম। তার পর কপাল-ঠুকে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়্লুম। ামেরিকায় বছর দেড় ছিলুম, জার্ম্মানিতে মাস ছয় কাটিয়ে এই কয়েকমাস ালো দেশে এসেছি। হাঁ আশ্চর্য্য দেশ জার্ম্মানি। একটা দেশ বটে, orth living…

—তা এখানে কি করছ?

—এখন ঝাঁঝায় একটা খনি তৈরি করবার কনট্রাক্ট পেয়েছি। আর ই ছোটনাগপুরে boring করে' বেড়াচ্ছি; কয়লাটয়লা নয়—এখানে ান্য কোন ধাতু নিশ্চয় আছে—

—গুপ্তধনের সন্ধানে আছ বলো!

—ঠিক বলেছ, দেখি ভাগ্যে যদি থাকে। তবে কি জানো, আলা-দীনের যে-আশ্চর্য্য প্রদীপ না হ'লে দৈত্য আসে না, রত্নও পাওয়া যায় না, সই প্রদীপটা বুঝ্লে তো রূপচাঁদ ভাই, রূপচাঁদ—

—তা আর বুঝ্ছি না, তবে ভাই আমি যে-রত্নের সন্ধানে আছি, তা তামার ও প্রদীপেও মেলে না; সে সাত রাজার ধন এক মানিক, প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে খুঁজতে হয়।

কাহার দুইটি স্বপ্নময় চোখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

—ওঃ, তুমি এখনও সেই ছেলেমানুষের মত আছ—খালি তরুণী! ছোটবেলায় আমরা পয়সা পেলেই চানাচুর, কি বেগুনি, কি লাট

কিন্‌তুম, আর তুমি কিন্‌তে জলছবি, কি বাঁশী, কি ফুল—ও-সব বাঁশী, ফুলে পেট ভরে না, বুঝ্‌লে ?

—এখনও ভাই বুঝ্‌তে আরম্ভ করিনি।

—বুঝ্‌বে একদিন। এই যে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে সব ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে—ও যতই কুইনিন-মিক্‌শ্চার খাও আর বন কেটে মশারি টাঙিয়ে মশা তাড়াও, কিছুতেই কিছু হবে না। সেদিন সিল্‌ভার টনিক্ পেটে পড়্‌তে শুরু হবে, দেখবে কোথায় ম্যালেরিয়া—ওই কুলি-গুলো জল নিয়ে এসেছে—মোটরটা কি শুধু শুধু তেতেছে, ধরো প্রায় একশো মাইল drive করে আস্‌ছি, আবার আধ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেসনে পৌছতে হবে।

কুলিগুলি জল ঢালিয়া মোটরের চাকাগুলি ঠাণ্ডা করিতে লাগিল। যতীন যদিও রজতের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু তাহার দৃঢ়মাংসপেশীবহুল দেহ দেখিলেই মনে হয়, এ যেন একটা শক্তির ডাইন্যামো, গোলগাল ভরা মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ দু'টি সর্ব্বদা সজাগ, চারিদিকে ঘুরিতেছে। রজতের দীর্ঘ দেহ ; দেখিলেই মনে হয়, এ যেন প্রাণরসের ফোয়ারা, বিদ্যুৎশিখার মত কাঁপিতেছে। তাহার লীলায়িত দেহখানি যতীন লোহার মত দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিল,—স্বপ্ন সব ছেড়ে দাও ভাই ; dreamsএ দেশের এই দশা, কাজ চাই, কাজ—

রজত মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—তুমি কি কাজ করছ ভাই ?

—আমি ? ওই তো বল্লুম টাকা পাচ্ছি না, না হলে দেখতে, এখানে লোহা তৈরি করবার কারখানা করতুম—লোহা, বুঝ্‌লে ? লোহা হচ্ছে এ যুগের দেবতা, এদেশে তার জন্ম দিতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেদিন জার্ম্মানীর মত হবে—

যতীনের উদ্দীপ্ত বাক্যধারায় বাধা দিয়া একটু ব্যঙ্গের সুরে রজত বলিল,—তবেই ভারতের মুক্তি ?

—নিশ্চয়! দেখবে সেদিন সে পরাধীন নেই! যদি শক্তি পাই, আমি এখানে ইঞ্জিন তৈরী করব, মোটর, এই ফোর্ডকারের মত Dutt-car, তোমরা চড়বে। এসো লেগে যাও আমার কাজে -বলিয়া নিজের মোটরটা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল।

—কেন ভাই? এই সাম্‌নে শান্ত গ্রাম ঘুমোচ্ছে দেখছ, তোমার কাজের চোটে এদের দিনেরাতে নিদ্রা থাক্‌বে না, থাক্‌বে অতৃপ্ত জ্বালা, এ গ্রামের জায়গায় আস্‌বে কুলিদের বস্তির কদর্য্যতা আর বীভৎসতা, মদের দোকান আর বারবণিতা; তোমার কলে এক ঘণ্টায় একশ মাইল যাবে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে কথা শুনবে, এক মিনিটে একখানা কাপড় হবে, এক সপ্তাহে একখানা বাড়ি হবে, আবার এক নিমিষে মানুষ মেরে ফেল্‌বে, নগর পুড়িয়ে দেবে, পাহাড় ডিঙোবে, সাগর পেরোবে, আকাশে উড়্‌বে—সব মান্‌লুম কিন্তু সত্যি সুখ দিতে পার্‌বে কি?

—সুখ দিতে পার্‌ব না? এই কলের জন্য কত material comforts বেড়ে গেছে, এই রেলগাড়ি, মোটর, ইলেকট্রিকের আলো, আর কত বল্‌ব—silly! তোমার মত ভাবুকদের বোঝাতে পারব না—ওসব থিওরি বুঝি না, আমি বুঝি কাজ, কাজ,—

—আচ্ছা, অনেকক্ষণ তো মোটরের গান শুন্‌লে, এখন আমার বাঁশীটা একটু শুন্‌বে, স্কুলে বাঁশী শোন্‌বার জন্যে আমায় কতই না ক্ষেপাতে—

রিষ্ট-ওয়াচটার দিকে আবার দেখিয়া যতীন বলিল,—না ভাই আজ সময় নেই, হাজারিবাগে শীগ্‌গির আস্‌ছি, তখন শোনা যাবে, কোথায় উঠছ?

—যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি।

—যোগেশচন্দ্র—আচ্ছা মনে থাক্‌বে, আর দেরি কর্‌লে মেল্ পাব না।

রজতের কোমল হাত তাহার শক্ত হাতে ধরিয়া মোটরের দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া দীপ্ত স্বরে যতীন বলিল,—কাজ—কাজ—কাজ চাই ভাই, সব স্বপ্ন ছেড়ে দাও। ভাবতে হবে কি করছ তুমি। এই মানবশক্তির জন্য, মানবসভ্যতার উন্নতির জন্য কি করছ—science, civilisation, happiness—

মোটরের দরজাটায় এক থাপ্পড় দিয়া যতীন বলিতে লাগিল,—এই যে মোটরটা—এ কি একটা শুধু জড় কল ভাবো? আমার মোটেই তা মনে হয় না। এ আমার জীবন্ত বন্ধু, আমার চলার শক্তি, আমার পায়ের সবচেয়ে বড় muscle, তেজী ঘোড়া হাঁকিয়ে যা আরাম, তার চেয়ে আরাম একে চালিয়ে। আচ্ছা, ভাই, আজ আসি—বলিয়া সে মোটরে লাফাইয়া উঠিল। মোটর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাদের শব্দে তাহাদের au revoir ডুবিয়া গেল, কালো পথে হুঙ্কার করিতে করিতে মোটর নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

আবার সব স্তব্ধ, হাওয়ার সন্‌সন্‌ শব্দ। ধীরে এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইয়া রজত অতি আস্তে গাড়িতে উঠিল। তরু-ছায়ায় ঘুমন্ত গ্রামের দিকে চাহিল, তারাভরা উদার আকাশের দিকে চাহিল, দিগন্তে কালোপাহাড়ের সারির দিকে চাহিল। এই পাহাড়গুলো যেন অচল বস্তুপুঞ্জ নয়, রহস্যময় রেখার ছন্দে নীলাকাশের পটে তাহাদের প্রাণের গতিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়াছে। তেমনি তাহার প্রাণ কোন্ রং‌এর রেখাপথ দিয়া যাইবে?

জান্‌লার ফাঁক দিয়া একটু চাঁদের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িল। সেই জ্যোৎস্নাময় নীলিমার দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে মানবসভ্যতার উন্নতির জন্য কি করিতেছে? বিজ্ঞান, সভ্যতা, মানবের সুখ—যতীনের কথাগুলি ব্যঙ্গের সুরে, কি

বেদনার সুরে তাহার কানে বাজিতে লাগিল, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

বালিশ ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বিপুলরহস্যময় দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই কি চাই? অজন্তার চিত্রশালা, না কয়লার খনি? রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, না লোহার কারখানা? এইসব সরল নগ্ন গ্রাম্য-জীবন, না নগরের কৃত্রিম মুখোস-পরা সভ্যতা? দুই-ই চাই? বাঁশীর সুরের সঙ্গে মোটরকারকে কে বাঁধিতে পারিবে?

আবার সে ধীরে শুইয়া পড়িল। তারাগুলি যেন মাথার গোড়ায় প্রদীপের শিখার মত দপ্ দপ্ করিতেছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজে সমস্ত আকাশ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এ-সমস্ত ভাবিতে তাহার ভালো লাগিল না। তারাগুলির দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন হয় তো সেই তরুণী বাড়ি পৌছিয়া গিয়াছে; সেও হয় তো তাহারি মত এদেশে নূতন আসিয়াছে, এ অজানা দেশ, এই জ্যোৎস্না রাত্রির মায়া, তারও অপূর্ব্ব লাগিতেছে; সেও হয় তো এমনই বিছানায় শুইয়া মাথার গোড়ার জান্‌লা খুলিয়া ছিন্নমালার ফুলদলের মত তারাগুলি দেখিতে দেখিতে সারাদিনের যাত্রার কথা, তাহার কথাও একটু ভাবিতেছে, তাহার কেশে, মুখে, নীল বেশে এমনই জ্যোৎস্না ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, অপূর্ব্ব দ্যুতিময় তাহার চোখ দু'টি ওই তারাটির দিকে চাহিয়া আছে।

ভাবিতে ভাবিতে রজতের চোখ নিদ্রায় ভরিয়া আসিল।

২

পরদিন রজত যখন হাজারিবাগে পৌছাইল, তখন সুন্দর প্রভাত। পাহাড়ের গা হইতে স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকা উড়িয়া যাইতেছে, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিশিরের বিন্দুগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতেছে। শহর হইতে

মাইল তিন দূরে এক খোলা প্রান্তরের মধ্যে বড় লালবাড়ির সামনে কুলিরা গাড়ি থামাইল। বাড়িটি পথ হইতে কিছু দূরে, উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। লতা-মণ্ডিত গেটের সম্মুখে নামিয়া লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া রজত বাড়ির দিকে উঠিয়া চলিল। পথের দুই পাশে ইউ-ক্যালিপটাস ও পাম-গাছের সারি, তাহার মাঝে মাঝে ক্রোটনের সার, লতাকুঞ্জ, পুষ্পবীথি।

প্রায় অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া পথের এক বাঁকে রজত দেখিল, এক ঝাউ-গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে বসিয়া একটি মেয়ে নিবিষ্টমনে বই পড়িতেছে। বাসন্তী রংএর শাড়ীর উপর লাল রংএর বইখানি, সাদা-পাতাগুলির উপর সোনার বালাগুলি ঝিকিমিকি করিতেছে। পাঠনিরতা তরুণী মূর্ত্তির পাঠভঙ্গীর অপূর্ব্ব সুষমাময় চিত্রের দিকে চাহিয়া রজত চুপ করিয়া দাঁড়াইল। লুটাইয়া-পড়া শাড়ীর পাড় হইতে ঝুলিয়া পড়া চুলগুলি পর্য্যন্ত দেহের সব রেখা যেন বইখানির উপর পরম প্রীতিতে নত হইয়া পড়িয়াছে ; মুক্ত কালো কেশে অর্দ্ধেক মুখ ঢাকা। রজতের কেমন ধারণা হইয়াছিল, কালকের পথে-দেখা মেয়েটিকে সে এ বাড়িতে আসিয়া দেখিতে পাইবে, অবশ্য এ বিশ্বাসের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহাকে না দেখিয়া সে যতখানি ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াছিল তাহা হইল না।

মেয়েটি তাহার দিকে লক্ষ্যই করিতেছে না দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া রজত একটু মেকী কাশিয়া নাগ্‌রা জুতাটা কাঁকরে ঘষিল। শব্দে চমকিত হইয়া হাত দিয়া চুলের গুচ্ছগুলি মুখ হইতে সরাইয়া চাহিতেই এক অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া মেয়েটি অতি অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। রজত দেখিল যেন মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা। সে একটি ছোট নমস্কার করিল। প্রতিনমস্কার করিতে গিয়া হাত হইতে বইখানি সশব্দে পড়িয়া যাইতে মেয়েটির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। রজত বইখানি

তুলিয়া তাহার হাতে দিতে সে সিঁদুর মাখানো মুখে তাহার দিকে চাহিল।

রজত ধীরে বলিল, এটা কি যোগেশ-বাবুর বাড়ি?

প্রশ্নটি অবশ্য নিষ্প্রয়োজন, কেননা এটা যে যোগেশ-বাবুর বাড়ি সে সম্বন্ধে কুলিরা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছে। কিন্তু কাহারও সহিত, বিশেষতঃ কোন মেয়ের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিতে হইলে, এই নিরর্থক নিষ্প্রয়োজনীয় কথাগুলিই সবচেয়ে কাজে লাগে।

নতদৃষ্টিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল, হাঁ। আপনি?

—আমাকে তিনি আস্‌তে লিখেছিলেন, একজন আর্টিষ্টের দর্‌কার ছিল না?

দীপ্তচক্ষে রজতের দেহ ও বেশভূষার দিকে চাহিয়া পরিচিত-জনের মত বলিল, ও, আপনি, আসুন।

তারপর লজ্জাজড়িত চরণে ভেল্‌ভেটের চটিজুতাটা পরিয়া কাঁকরে-লুটানো শাড়ীর আঁচলটা গেরুয়া-রংএর ব্লাউজের উপর টানিয়া সে ধীরে অগ্রসর হইল। রজত চলিল ঠিক তাহার পাশেও নয়, ঠিক তাহার পিছনেও নয়।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বলিল, পুস্‌পুসে এলেন বুঝি?

—হাঁ।

রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য মুখ ফিরাইয়া মেয়েটি বলিল, আমরা আপনাকে কাল expect করেছিলুম।

তাহার দেহের গতিচ্ছন্দের দিকে চাহিয়া রজত হাসিমাখানো স্বরে বলিল, ও!

আবার রজতের মুখ নিমেষের জন্য দেখিয়া লইয়া তরুণী বলিল, বাবা ভাব্‌লেন বুঝি এলেন না। তারপর রমলা বল্‌লে—বলিয়াই থামিয়া গেল! একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

রজত তাহার পাশে আসিয়া পড়িল। নীরবে পথের আর-একটা বাঁক উঠিতে রজত পথের ধারে ক্রোটনের পাতাগুলিতে হাত দিয়া বলিল, ভারি সুন্দর ক্রোটন তো, কি সুন্দর গোলাপগুলি!—বলিয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

মেয়েটি আর-একবার রজতের দিকে চাহিয়া বলিল, হাঁ, কাজীর ভারি ফুলের সখ, এই গাছগুলো ওর প্রাণ।

চোখে চোখ রাখিয়া রজত বলিল, ফুল সবাই ভালবাসে।

নতদৃষ্টিতে মেয়েটি বলিল, হাঁ।

বাকী পথটুকু আবার নীরবে কাটিল।

বাড়ির সিঁড়ির সম্মুখে আসিতেই স্মিতহাস্যে মেয়েটি রজতের দিকে চাহিয়া বলিল, আসুন! তারপর দুইজনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া ফুলের টবগুলির পাশ দিয়া বারান্দা পার হইয়া এক বড় হলঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেটি ড্রয়িং রুম। মেঝেতে সবুজ কার্পেট পাতা, দেওয়াল-গুলি নীল আর ছাদটা সোনালী-রং-করা, ছবি, সোফা, কোচ ইত্যাদি দিয়া ঘরটা সাহেবী ফ্যাসানে সাজানো বটে, কিন্তু চেয়ার-টেবিল সব ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন। ঘরের মাঝখানে ছাই-রং এর সুট পরিয়া এক বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার পাশে এক সিংহাসনের মত চেয়ারে গেরুয়া রংএর আলখাল্লা পরিয়া এক প্রৌঢ় মুসলমান এক ফার্সী বই পড়িয়া শুনাইতেছেন। বৈরাগীর মত কোঁকড়া চুল তাঁহার ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাঁচাপাকা দাড়ি খুব লম্বা নয়, খুব ঘনও নয়। চোখ দুইটি বাউলের মত ভাসাভাসা, যেন কোন স্বপ্নলোকে স্থিত; দেহ দীর্ঘ সুঠাম। মাঝে মাঝে দাড়িতে আঙ্গুল চালাইয়া মুসলমানটি ফার্সী পড়িতেছেন আর তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইতেছেন। তাহারই ছিন্নটুকরা কয়েকটি কানে আসিল—

কাজীসাহেব ওমার খায়াম পড়িতেছেন—

গোয়েন্দ্ বেহেশৎ-ই-ইদন্ ব-হুর্ খ্শস্ত্
মন্ মী-গোয়াম্ কে আব-ই-আঙ্গুর খ্শস্ত্।
ঈঁ নকদ বে-গীর, ও দস্ৎ আজ আঁ নসিয়াহ্ বে-দার্,
কে আওয়াজ-ব-নহল্ বরাদর্ আজ দূর্-খ্শস্ত্॥

লোকে বলে, অপ্সরী সঙ্গসুখে ইদন-স্বর্গ আনন্দময়, আমি, বলি, এই যে আঙ্গুরের রস, এই দ্রাক্ষারসই পরম আনন্দকর। হাতে এখন যা নগদ পাচ্ছ তাই উপভোগ কর, ওই আশা-দেওয়া ভবিষ্যৎ ধনের বিষয় সাবধান ; কি জান ভাই, ঢোলের আওয়াজ দূর থেকে শুনতেই মিষ্টি।

কাজী-সাহেব পড়িতে পড়িতে সহসা থামিয়া গেলেন দেখিয়া যোগেশবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কোণের পিয়ানোর কাছ হইতে কে যেন চঞ্চল চরণে সরিয়া গেল!

কন্যার দিকে চাহিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, কি মাধু মা? ইনি?

রজত একটি ছোট নমস্কার করিয়া বলিল, আমাকে আপনি আস্‌তে লিখেছিলেন—আমার নাম রজতকুমার—

তাহাকে বাধা দিয়া যোগেশ-বাবু প্রফুল্ল-মুখে বলিয়া উঠিলেন, ও! আর বল্‌তে হবে না, চিনেছি, আপনিই exhibitionএ সেই বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যার ছবি এঁকেছিলেন, আর খুকীর ছবিটা—

—আজ্ঞে হঁা।

—বেশ, বেশ! বসুন! দেখুন, ছবিটা আমাদের ভারি ভালো লেগেছিল, সেটা আগে কে কিনে নিয়েছিল বলে' আমার মেয়ের কি দুঃখ—বসো না তুমি—

হাতের বইয়ের পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে মাধবীর গণ্ড রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রজত ধীরে ধীরে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

যোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, হাঁ, আমি ভেবেছিলুম, কোন বয়স্ক আর্টিষ্টের আঁকা, যখন শুনলুম এক ইয়ং আর্টিষ্ট, তাই আপনাকে ডেকে পাঠালুম। কাজী সাহেব সেই কল্‌কাতার ছবিখানার কথা মনে নেই—ঝড়ের—

কাজী-সাহেব ওমার খায়াম উল্টাইতে উল্টাইতে স্নিগ্ধচোখে একবার রজতের দিকে চাহিলেন।

যোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন, ছবিটা আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে—কালো কালো মেঘে আকাশ কালীতে ভরা, সাপের ফণার মত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার তলায় ছিপ্‌টি-মারা কালো ঘোড়ার মত নদীর জল ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে, দু'ধারে গাছের সারি দিশাহারা, জলে স্থলে ধূলো-বালিতে মেঘে বাতাসে যেন রুদ্রের আবির্ভাব; আর একটা পাখী দুই সাদা ডানা মেলে তারি মধ্যে উড়ে চলেছে। আশ্চর্য্য আপনার রেখার টানগুলো! পাখীটা আমার চোখে ভাস্‌ছে, ঝোড়োবাতাসে ভরা নৌকোর পালের মত তার ডানা দু'টো!

কাজী-সাহেব মাথার চুলগুলি নাড়িয়া রজতের দিকে প্রফুল্লমুখে চাহিয়া বলিলেন, আমি তো বলেছিলুম, এ ছবি নয়, এ রংএর তৈরী ঝড়ের গান।

মাধবী রজতের দিকে চাহিতেই তাহার মুখ গর্ব্বসুখে রাঙা হইয়া উঠিল!

যোগেশ-বাবু বলিতে লাগিলেন, পাখীটা আশ্চর্য্য কৌশলে এঁকেছেন, ঠোঁট হতে ডানার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত রেখাগুলো এমন গতিশীল উত্তাল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে ঝড়ের গর্জ্জন যত বাড়্‌ছে, বায়ুর বেগ যত উন্মত্ত হচ্ছে, ততই তার বক্ষ নেচে উঠ্‌ছে, কণ্ঠে দীপক-রাগিণী বাজ্‌ছে, নির্ভয়ে মহানন্দে ঝড়ের মেঘের বুকে ছুটে সে চলেছে—দেখুন নদীর তট থেকে, গাছের পাতা থেকে, পাখীর ডানা থেকে বিদ্যুতের

আঁকাবাঁকা অগ্নিপথ পর্য্যন্ত রেখাগুলি যেন কোন রুদ্রতালে নাচ্‌ছে; উত্তাল তরঙ্গের মত এই রংএর ঝড় সৃষ্টি করেছে।

রজত বাধা দিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, যোগেশ-বাবু অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, তাই আপনাকে ধ'রে আন্‌লুম, আমাদের কয়েকখানা ছবি এঁকে দেবেন, বেশি নয়, আমার শোবার ঘরে খান চারেক, লাইব্রেরিতে খান তিনেক, এই ঘরটার যে ক'খানা হয়, আর আমার মেয়ে কি তার ঘরটা না সাজিয়ে ছাড়্‌বে—তাছাড়া কাজীর একখানা পোর্‌ট্রেট্‌।

কাজী-সাহেব চুলগুলি দোলাইয়া দাড়ি নাড়িয়া অতি বিনীতভাবে আপত্তি তুলিলেন, না—না, আমার কেন সাহেব, আপনারই—

যোগেশ-বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর আমার মেয়ের একখানা ভালো দেখে—এই—

মাধবী অকারণে পাশের টেবিলের বইগুলি গোছাইতেছিল, রাঙামুখ তুলিয়া বলিল, আর তোমার খানা বুঝি আঁক্‌তে হবে না, বাবা!

—সে কি আর না আঁকিয়ে ছাড়্‌বি—তা কি কি ছবি আঁক্‌বেন সে বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তবে আমার কতকগুলো আইডিয়া আছে, ধরুন—

স্নিগ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া মাধবী বলিল, বাবা—

—কি মাধু?

—উনি এইমাত্র আস্‌ছেন।

—ও! তাহলে এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আচ্ছা বিকেলে কথা হবে এখন। তুমি ওঁকে ঘর দেখিয়ে দাও—কাজী সাহেব শুরু করো—

হর্‌গিজ গম্‌ তু রোজ ম-রা য়াদ্‌ ন-কিশৎ······

কাজী তাঁহার ফার্সী কবিতায় মনোনিবেশ করিলেন।

মাধবী রজতকে লইয়া বারান্দায় বাহির হইল। বারান্দাটি বাড়ির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়াছে। ড্রইংরুমটি পশ্চিমমুখী। তাহারা সে দিকের বারান্দা পার হইয়া উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া পড়িল। রজত তাহার পিছন পিছন যাইতে যাইতে চুড়িগুলির দিকে চাহিতে তাহার হাতের বইখানির নাম সরবে চিন্তা করিবার মত ধীরে পড়িল, Great Hunger—

রজত বইখানির নাম উচ্চারণ করিতে, মাধবী একটু থামিয়া তাহার সঙ্গ লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, হঁা, বইখানি পড়েছেন ?

—পড়েছি—

—বড় দুঃখের কথা লেখে, ট্রাজেডি পড়তে আমার মোটেই ভালো লাগে না—

—ওইটাই জীবনের মর্ম্মের কথা।

মাধবী যাইতে যাইতে রজতের মুখের দিকে স্মিতনয়নে চাহিয়া বলিল, আপনি এই বয়সেই দেখ্‌ছি জীবনের সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

—আপনার চেয়ে বয়সে বড় বোধ হয়।

—তা বলে খালি কান্নার কথা লিখে কি লাভ বলুন ?

—জগতের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই কান্নার সাহিত্য।

—আমার মোটেই ভালো লাগে না, এত মন খারাপ হয়ে যায়।

—কিন্তু জীবনটা কি দেখুন, আমাদের দেশের লোকেরা বলে লীলা ; কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা ঠিক বলে, সংগ্রাম, বাহিরের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, আর সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে হানাহানি কাড়াকাড়ি—

তাহার দীর্ঘ বিপর্য্যস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, মাধবী খোলা চুলগুলি একটা খোঁপা করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, এ সব ফিলজফি আমি বুঝি না, যা

পড়ে’ বেশ আনন্দ হয় তাই লেখো, যাতে মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাই করো--

—কিন্তু জীবনটা যে দুঃখ কান্নায় ভরা—

—তা বলে’ কি হাস্‌তে মানা? সত্যি, যে লেখকের লেখা পড়ে’ খালি কাঁদ্‌তে হয় তার ওপর আমার এমন রাগ হয়—আসুন, এইটা আপনার ঘর—

উত্তরদিকের বারান্দা পার হইয়া তাহারা পূর্ব্বদিকের শেষ সীমান্তে এক ছোট ঘরের সম্মুখে হাজির হইল। পাশের ঘরে এক দুষ্টামিভরা হাসির শব্দ শোনা গেল, ঘর-দেখানো কাজটা কোন চাকর দিয়া করাইলে তো অতিথিকে সমাদরের বিশেষ ত্রুটি গৃহকর্ত্রীর হইত না, এই হাসির এই অর্থ। কর্ত্তব্যের মাত্রাটা একটু বেশি হইতেছে।

ঘরটি একটু ছোট, আস্‌বাবপত্র সাধারণ। চাকর স্যুটকেশ, ব্যাগ, বেডিং ইত্যাদি আগেই আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে কি কাজে পাঠাইয়া মাধবী একটু বিনীত স্বরে বলিল, দেখুন, আপনার জন্যে ওপরের একটা ভাল ঘর বাবা ঠিক করেছিলেন—

রজত বাধা দিয়া বলিল, না, না, এ ঘর তো সুন্দর! আমার কল্‌কাতার ঘর যদি দেখেন।

—আপনি কাল রাতে আস্‌বেন ভেবে, দোতলার ঠিক এর ওপরের ঘরটাই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আমার এক বন্ধু—

হ্যাঁ কিন্তু আমার এক বন্ধু—বলিয়া শাড়ীর রাঙা রং ও চোখের দীপ্ত হাসির ঢেউ তুলিয়া সমস্ত ঘর চঞ্চল করিয়া মাধবীর বন্ধুটি বাতাসের দোলায় দোদুল পুষ্পলতার মত রজতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে রজত দেখিল, কালকের পথে-দেখা সেই তরুণী

হাস্যমধুরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল, হ্যাঁ, কিন্তু এই বন্ধুটি এসে ঘরটি দখল করেছে, আর আপনি আসবেন জান্‌লে—

মাধবী লজ্জায় রাঙা হইয়া বিরক্তির সহিত বন্ধুটির দিকে চাহিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, ইনি রমলা আর ইনি—

হাসির স্বরে রমলা বলিল, থাক্, তোমায় আর ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়ে দিতে হবে না, রেল-কোম্পানি কালকেই ও-কাজটা সেরে রেখেছে! তার পর চোখে হাসির আগুন ঠিক্‌রাইয়া রজতকে বলিল, দেখুন, পুসপুসে এসে এই ঠক্‌লেন, ঘরটি বেদখল হয়ে গেল।

—ঠকে যা আনন্দ পেলুম আপনি জিতেও তা পান নি—

তাহাদের দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, মাধবী একটু যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রমলা বলিল, তা বটে, যে রকম বাঁশী বাজাতে বাজাতে আস্‌ছিলেন আমার লোভই হচ্ছিল মোটর থেকে নেমে আপনার গাড়িতে গিয়ে জুটি। আ, যেমন মোটরের মধুর সঙ্গীত তেম্নি তার মৃদু দোলা! ঝাঁকুনিতে গা ব্যথা হয়ে গেছে।

—ও ঝাঁকুনি থেকে আমিও ত্রাণ পাইনি, ওটা যানের দোষ নয় এ দেশের পথের।

—কিন্তু ভারি সুন্দর আপনার বাঁশী বাজছিল, আমার পাশের এক মেম তো প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছিল, সে নেপালী এক পাহাড়ীর মুখে এম্নি স্বর শুনেছিল।

—হাঁ, ওটা এক নেপালী গান। কাল কখন পৌছোলেন?

—সে অনেক রাতে, ঘড়ি দেখিনি ক'টা। আচ্ছা আপনার ভয় কর্‌ল না, পথে তো বাঘ বেরোয় শুনেছি।

—কই, ভাগ্যে তো দেখা মিল্‌লো না।

—আচ্ছা, সকালে কিছু খেয়েছেন?

—ও, এক গাঁয়ে এমন মিষ্টি দুধ দিলে, তা ছাড়া বাড়ি থেকে খাবার এনেছিলুম বাসি লুচি—

—বাসি লুচি—O lovely ! আমার favourite—কিন্তু ওই দুধটা, আঃ ! বলিয়া রমলা একটু নাক সিঁটকাইয়া রজতের হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি মোটেই খেতে পারি না, কেমন করে' যে লোকেরা খায় ! আচ্ছা, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম গরম কাটলেট ভাজছিলুম—আপত্তি নেই তো ?

—মোটেই না।

—আর এক-কাপ চা কি কফি ?

—না, এক-কাপ চা-ই পাঠান।

—আচ্ছা, হোষ্টেস্ কৈ ? বা ! মাধবী কোথায় ? কি আশ্চর্য্য মেয়ে—

মাধবী যে কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই।

নীল ভেল্‌ভেটিনের চটিজুতার হিলের উপর লাট্টুর মত ঘুরিয়া চারিদিকে হাসির আলো ঠিক্‌রাইয়া রমলা বাহির হইয়া গেল।

ব্যাপার তো অতি সামান্যই। কিন্তু মাধবী যে কেন তাহাদের মধ্যে দাড়াইয়া থাকিতে পারিল না, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ঘরে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, ধীরে পাশের ঘরে গিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। রমলা যখন রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

৩

নূতন জায়গাটির সহিত পরিচয় করিবার জন্য রজত বিকালে ঘর হইতে বাহির হইল, কিন্তু বাড়ির বারান্দাতেই আটক পড়িয়া গেল। সে ড্রইংরুমের পাশ দিয়া যাইতেছে, দেখিল রমলা ও মাধবী ভিতরে বসিয়া। রমলা পিয়ানোটা খুলিয়া টুংটাং করিতেছে, আর মাধবী কি একখানা সচিত্র বিলাতী মাসিকপত্রিকার পাতা উল্টাইতেছে। রজত দরজার গোড়ায় আসিয়া ঢুকিবে কি না ভাবিতেছে, রমলা পিয়ানোর উপর আঙ্গুলগুলি মৃদু খেলাইতে খেলাইতে বলিল, আসুন না। আপনি নিশ্চয় পিয়ানো বাজাতে জানেন।

রজত ধীরে তাহাকে একটি নমস্কার করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া আর একটি নমস্কার করিল। মাধবী চুপ করিয়া পত্রিকার পাতা উল্টাইয়া-যাইতে যাইতে মাথাটা কোনমতে নিচু করিল। রমলা হাসিয়া পিয়ানোর এক ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, দেখুন আসতে যেতে এত নমস্কার করলে হাঁপিয়ে উঠব, তার চেয়ে এসে একটু বাজান।

বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল, ওটা তো মোটেই জানি না, এই চাষী পাহাড়ীদের বাঁশী একটু বাজাতে পারি।

অতি উৎসাহের সহিত রমলা বলিল, তবে সেইটাই নিয়ে আসুন।

অনুনয়ের স্বরে রজত উত্তর দিল, না, দেখুন এখন নয়।

হাসির সুরের সঙ্গে একটু ঝাঁঝ মিশাইয়া রমলা বলিল, বেশ, আমি তবে পিয়ানো বন্ধ করলুম।

ক্ষমা চাহিবার ভঙ্গীতে রজত বলিল, না দেখুন—

মাধবী বই হইতে মুখ না তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, থাক্‌ই না এখন বাপু!

একটু কড়া স্বরে রমলা বলিল, না, আপনার সঙ্গে ঝগড়া, পিয়ানো বাজানো শুন্‌তে এসেছিলেন আর—

বাধা দিয়া রজত হাসিয়া বলিল, আর আপনি তো কাল বাঁশী শুনেছেন।

—তা হবে না—স্থিরকণ্ঠে বলিয়া রমলা সশব্দে পিয়ানো বন্ধ করিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিল।

রজত অতি অপ্রতিভ হইয়া কি করিবে ভাবিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাধবী কয়েকখানা ছবি উল্টাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, পারবেন না ওর সঙ্গে আপনি। ভালোয় ভালোয় বাঁশীটা নিয়ে আসুন।

রজত ধীরে দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই রমলা পিয়ানো খুলিয়া এক ঝঙ্কার দিয়া হাসি-মাখা স্বরে বলিল, আচ্ছা থাক, বাঁশীটা রাতের জন্য রইল।

রজত তবু দ্বার প্রায় পার হইল দেখিয়া সে একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, আসুন এখন বাঁশী শুন্‌বো না, দরকার নেই।

তারপর সে আপন মনে পিয়ানো বাজাইতে শুরু করিল।

নারীর, বিশেষতঃ তরুণীদের, অন্তরের লীলা চিররহস্যের, এ কথা রজত জানিত; আজ তাহার সত্যতা চোখের সম্মুখে প্রমাণিত হইল দেখিয়া অবাক হইল না। তাহার কবিবন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল, —নারী হচ্ছে পুরুষের কাছে এক জীবন-জোড়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন, নীল-সমুদ্রের মত অতল, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মত চঞ্চল, ওদের সম্বন্ধে কোন থিওরি তৈরি কোরো না, বুদ্ধি দিয়ে এ চিররহস্যময় যন্ত্রটিকে বুঝ্‌তে যেও না, পারবে না, প্রতিক্ষণে এর নব নব রূপ। প্রেমের সহিত স্পর্শ কর,

যখন সে স্থরে আঘাত করবে, তার যেমনই হোক ঝঙ্কার ঠিক পাবে। নারী-সেতারকে বুঝতে যেও না, প্রেমের হাতে আনন্দে বাজাও।,

কোন প্রকার বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া সে দেখিতে বসিল। তাহাদের পিছনে খোলা জান্‌লা দিয়া অবারিত মাঠ আর উন্মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছিল, সেই নীলাকাশের রক্তিমাভ পটে দুই তরুণী বন্ধু যেন ছবির মত আঁকা।

বিশ্বশিল্পী দুইজনকেই স্থন্দর করিয়া গড়িয়াছে বটে, কিন্তু একজনকে অতি আশ্চর্য্য কৌশলে গড়িয়া গড়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; আর এক-জনকে নিখুঁত ভাবে গড়িলেও, গড়া তার শেষ হইতে চাহিতেছে না। মাধবী যেন কোন গ্রীকভাস্করের গঠিত মূর্ত্তি, তাহার যৌবনপুষ্পিত তনু বসন্তব্রততীর মত পরিপূর্ণ কিন্তু টলমল করিতেছে না; তাহার দেহের বর্ণ স্থিরদামিনীর মত, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ প্রস্তরের শুভ্রতার মত; প্রতি অঙ্গ স্থগঠিত, কোথাও সৌন্দর্য্যের রিক্ততা নাই, তাহার নাক চোখ ঠোঁট মুখ হিসাব করিয়া সাজানো, প্রতি অঙ্গের সহিত প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য, এ মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা, মনকে মুগ্ধ করে বটে কিন্তু মত্ত করে না। আর রমলাকে দেখিলে মনে হয়, এ শিল্পীর তুলিতে আঁকা স্থন্দর ছবি; এ অনুকৃত শিল্প নয়, ভাবাত্মক; প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গী ভাবের ব্যঞ্জনায় ভরা, দেহের গঠনে বর্ণে সৌন্দর্য্য ফুরাইয়া যায় নাই, তাহার নাক চোখ মুখ একটু অসম ভাবেই গড়া, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য বাড়িয়াই গিয়াছে, চক্ষে গণ্ডে মাঝে মাঝে কিসের দীপ্তি ঝলসিয়া ওঠে, মুখের রং সব সময়ে এক রকম থাকে না, কখনও পদ্ম পরাগের মত রাঙ্গা হয়, কখনও শুক্‌না গোলাপ-পাতার মত কালো হয়, কখনও পলাশের মত জলজল করে, তাহার মনের ছন্দের মত, তাহার দেহ লীলায়িত; সব চেয়ে স্থন্দর তাহার সারঙ্গ-নয়ন, কখনও হাসির আলো, কখনও স্বপ্নের মায়া, কখনও দীঘির কালো, কখনও মেঘের ছায়া,—তাহার চক্ষু-তারকায় যে আলো জ্বলিতেছে, তাহা

সূর্য্যের নয়, তারার নয় তাহা বিদ্যুতের, তাহার দিকে চাহিলে সমস্ত জগৎ প্রাণময় প্রেমময় হইয়া ওঠে।

বেঠোভেনের একটি সোনাটা বাজাইয়া রমলা দীপ্তমুখে রজতের দিকে চাহিল। রজত উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, ভারি সুন্দর, আর-একটা বাজান না।

—বাজাচ্ছি, মাধু তোর গানের বইগুলো কোথায়?

—ওপরে আছে বোধ হয়, তোর তো বেশ হাত পিয়ানোতে, তোর কাছে রোজ শিখ্‌লে হয়।

—তুমি তো শিখ্‌ছিলে এখানকার কোন মেমের কাছে।

—সে আর বোলো না, আন্‌ব নাকি ওপর থেকে?

—থাক্, আমি এম্নিই বাজাচ্ছি, ভুল হলে কেউ তো আর ধর্‌তে পার্‌ছে না!—বলিয়া কৌতুক-ভরা চোখে রজতের দিকে চাহিয়া বেঠো-ভেনের এক ঝড়ের গান বাজাইতে শুরু করিল।

নির্নিমেষ নয়নে রজত এই পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিল, এ যেন একটা সুরের ছবি—চোখ দুইটির আনত কম্পিত রেখায়, রাঙা ঠোঁট দুইটির আনন্দে তরঙ্গিত টানে, পদ্মরাগের মত আঙ্গুলগুলির লীলায়িত ছন্দে, হেলিয়োট্রোপ রংএর শাড়ীর দুলিয়া-ওঠার ভঙ্গীতে, দেহের প্রতি রেখা সুরকে মূর্ত্ত, গানকে গতিশীল সাকার করিয়াছে, পায়ের তলে লুটানো লাল পাড় হইতে উদ্যত বেণীর কেশগুলি পর্য্যন্ত ছবির রেখাগুলি প্রাণের ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই রমলা-ছবিখানিতে বিশ্বশিল্পী রেখাকে বক্ষে একটু উঠাইয়া কটিতে একটু গড়াইয়া কণ্ঠে একটু টানিয়া কেশে বাড়াইয়া শাড়ীর পাড়ে দোলাইয়া কি বিচিত্ররূপ আঁকিয়াছে। এই দেহভঙ্গীর সুষমার দিকে চাহিতে চাহিতে রজতের চিত্ত কোন্ সঙ্গীতলোকে হারাইয়া গেল।

গানের সুরের কি আশ্চর্য্য শক্তি! আত্মার অন্তরতম গৃহের বদ্ধদুয়ার

সব খুলিয়া যায়, চিত্তের নীলাকাশে রক্তরাঙা সন্ধ্যার স্বপ্নমায়া বুলাইয়া দেয়। গানের সুর রূপকথার রাজপুত্রের মত সোনার কাঠির স্পর্শে চিত্তের ঘুমন্ত রাজপুরী জাগাইয়া তোলে, প্রাণ-শতদল-শায়িনী চিরবিরহিনী কোন সৌন্দর্য্যময়ী জাগিয়া ওঠে! রজতের মনে হইল তাহার হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ঘুমন্ত রাজকন্যা আজ জাগিয়া প্রাণের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারি সম্মুখে মূর্ত্তিমতী বসিয়াছে।

বাজানো শেষ করিয়া রমলা দীপ্তনেত্রে রজত ও মাধবীর দিকে চাহিল। দুইজনকেই স্তব্ধ দেখিয়া বলিল, কি হলো?

রজত বিমুগ্ধ হাসিয়া বলিল, যা সুরের ঝড় তুললেন।

—এখন তো কেটে গেছে। না, না, এখন একটু বেড়াতে যাওয়া যাক্ চলুন, বলিয়া রমলা চেয়ার হইতে একটু নাচের ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাঁশীর কথাটা যেন রাতে মনে থাকে, বলিয়া সে পিয়ানোটা বন্ধ করিল।

রজতের সঙ্গে সঙ্গে মাধবীও উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার নিকটের এক সোফায় বসিয়া পড়িল, তাহার সহসা মনে পড়িয়া গেল, এই অপরিচিত যুবকটির সহিত বেড়াইতে যাওয়া ঠিক হইবে না। অবশ্য কোন্ কারণে সে বসিল তাহা বলা শক্ত, যাইতে তাহার কোথায় বেদনা বোধ হইতেছিল।

রমলা তাহার নিকট ত্বরিতপদে অগ্রসর হইয়া বলিল, কি হলো তোমার!

—ভাই, এই গল্পটা শেষ করি।

—নাও, এই সন্ধ্যেবেলা তোমায় গল্প শেষ করতে হবে না, বলিয়া রমলা বায়স্কোপের ম্যাগাজিনটা টান মারিয়া কার্পেটে ফেলিয়া দিল।

রমলার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার মত শক্তি রজতও মনের মধ্যে

খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে পাশের দরজা দিয়া ধীরে ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু বিস্মিতনয়নে চাহিয়া বলিল, কোথায় ?

দীনভাবে রজত বলিল, ঘরে একটু কাজ আছে !

একটু তিক্তকণ্ঠে রমলা বলিল, আচ্ছা।

এ-সব ঢং সে মোটেই সহিতে পারে না।

বারান্দার কোণে কাজী-সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া সন্ধ্যার আলোয় পাহাড়গুলির দিকে তাকাইয়া ছিলেন। রমলা ছুটিয়া গিয়া প্রায় আল্‌থাল্লাটা টনিয়া বলিল, চলো তো কাজী সাহেব।

উদাসস্বরে কাজী-সাহেব বলিলেন, কোথায় ?

দীপ্তকণ্ঠে রমলা বলিল, চলো না, আমরা বেড়িয়ে এসে এমন বেড়ানোর গল্প বল্‌ব !—তার পর সোনার চুড়ির ঝঙ্কার তুলিয়া কাজী-সাহেবের স্কন্ধ ধরিয়া টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তার দিকে চলিল।

৪

রজত ঘরে যাইবে বলিয়া বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার ঘরে যাওয়া হইল না। পথেই চাকর মনিয়া আসিয়া জানাইল, সাহেব ডাকিতেছেন। দোতলায় যোগেশ-বাবুর লাইব্রেরিতে মনিয়া লইয়া গেল।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া যোগেশবাবু একখানা বই পড়িতে-ছিলেন, রজত প্রবেশ করিতেই বইখানি টেবিলে বইয়ের গাদায় রাখিয়া চশমাটা খুলিয়া বলিলেন, আসুন, আমি ভাব্‌ছিলুম আপনি বেড়াতে গেছেন।

নমস্কার করিয়া রজত জান্‌লার কাছে এক চেয়ারে বসিল, ধীরে বলিল, না, এই বেরুচ্ছিলুম।

—বেশ বেড়াবার জায়গা, কেমন লাগ্‌ছে আপনার ?

—খুব সুন্দরই লাগছে, কল্‌কাতার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তো—

—হাঁ, আমারও জায়গাটা ভারি পছন্দ, এই ধরুন retire করে' পাঁচ বছর হয়ে গেল বরাবরই এখানে আছি, তবে গ্রীষ্মকালটা কোন hillএ চলে যেতে হয়।

—পাঁচ বছর আছেন ?

—হাঁ, একবার বেড়াতে এসে আমার স্ত্রীর এ জায়গা ভারি পছন্দ হয়েছিলো, তাই পেন্‌সন নিয়ে এইখানেই বাড়ি কর্‌লুম। তা' তাঁকে আর এ বাড়ি ভোগ কর্‌তে হ'ল না, এসে প্রথম বছরেই মারা গেলেন—ওই যে পাশের ঘরটা, ওই ঘরটায়, ওটা বন্ধই থাকে —

বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠ উদাস হইয়া উঠিল, তাঁর শুভ্র ভ্রূর তলায় গ্রন্থপাঠ-খিন্ন বড় বড় কালো চোখ জল ছলছল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া রজত কথার ধারাটা অন্যদিকে চালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কিছু বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আপনাকে দমন করিয়া ধীরে বলিলেন, ওই মা-হারা মেয়ে আমার মা হয়ে আছে। কোথায় মাধবী-মা ?

—তিনি নিচে আছেন।

—আচ্ছা থাক্ !

—আপনার কোনো ছেলে নেই ?

—ছেলে ? কি জানো বাবা, তাদের সংসার হয়েছে, বুড়ো বাপের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বলো ? হাঁ, আছে বৈ কি, এক ছেলে রাওলপিণ্ডিতে ডাক্তার, আর এক ছেলে সিমলা সেক্রেটেরিয়টে আছে,—আর মেয়েই বা কি আপনি বলুন, মেয়েকেও তো পরের ঘরে পাঠাবার জন্যে মানুষ করা,

তা হলেও সে মেয়ে। এই ঘরভরা বই দেখ্‌ছেন, এই বই আর মা-টিকে নিয়ে বেঁচে আছি। যাক্‌, আপনাকে ডেকে পাঠালাম, আপনার ছবি ভারি ভালো লেগেছে; তুলির টানগুলো দিয়েছেন, যেমন bold তেম্নি আইডিয়ায় ভরা। ভাবলুম কত রাজ্যের বই কিনে তো টাকার শ্রাদ্ধ কর্‌ছি, দেশের একজন আর্টিষ্টের একটু সাহায্য করা যাক্‌—তাই—

—আমি আপনার ছবি যথাসাধ্য ভাল করেই আঁক্‌বো—ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকার সখ, সারাজীবন যদি রাখ্‌তে পারি—

—হাঁ, ছবি এঁকে এ দেশে পেট চলা মুস্কিল, তবে আপনার ছবি,—না, ছবি আঁকা কিছুতেই ছাড়বেন না। আর দেখুন, মাধুর ছবি আঁকার ভারি সখ, ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে। ও নিজে চেষ্টা ক'রে যা এঁকেছে, ওর একটা talent আছে বোধ হয়; না, আপনি জীবনে যে professionএই যান, ছবি আঁকা ছাড়বেন না।

যোগেশ-বাবু নীরব হইলেন। কথা শেষ হইয়া গেল ভাবিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইতেই যোগেশ-বাবু বলিলেন, ও কি উঠ্‌ছেন যে, বসুন।

রজত তাঁহার দুঃখরেখাঙ্কিত বার্দ্ধক্যজীর্ণ মলিন মুখের দিকের চাহিয়া বসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় সেই কালো কোট্‌-জড়ানো মূর্ত্তিকে বড় করুণ দেখাইতেছিল। বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া মৃদু হাসিয়া যোগেশ-বাবু উদাস স্বরে বলিলেন, কি জানেন রজত-বাবু, সুখ জিনিষটা বড় রহস্যের, বড় আশ্চর্য্যের। ও কখন আসে, কখন যে যায়। আজ আপনাকে দেখে কেমন একটা আনন্দ হচ্ছে, আর ওই রমলাকে দেখে কাল যে কি আনন্দ হয়েছিল, কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি, ও যে আস্‌বে ভাবিনি। কোথায় সে?

—তিনি কাজী-সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেলেন দেখ্‌লুম।

—আর, ওই কাজী, আশ্চর্য্য ও লোকটা, একটা রত্ন, সমস্ত পশ্চিম

ঘুরে আমি ওকে ধরে' এনেছি ; দিল্লীর কোনো বাইজীর গলায় ওর মত মিষ্টি গান শুনিনি। এখন ওর বুড়ো বয়স, ভাঙা গলা। বিশ বছর আগে ওর গলায় যা গান শুনেছি, আহা! এই বুড়ো বয়সে ওর কবিতা আর গজল শুনেই প্রাণটা তাজা রয়েছে। না হলে, এই যে বইয়ের স্তূপ দেখ্‌ছেন, এই যে কাব্যগ্রন্থ, আর্টের বই, ছবির বই, শুক্‌নো পাতা—সব শুক্‌নো পাতা, গোলাপের রাঙা পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন লাগে—words, words, words,—ডাক দি ওই কাজীকে, ভরপুর ওর প্রাণ, জীবনের রসে ভরপুর, এই আট বছর আমার সঙ্গে আছে, কোনোদিন দেখিনি কাজী বলেছে ভালো লাগছে না—বলিতে বলিতে আবার বৃদ্ধ থামিয়া গেলেন।

বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, সামনের পাম-গাছগুলি একটু মৃদু দুলিতেছে, ঘরটা যেন কি রহস্যমায়ায় ভরা।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, কি বল্‌ছিলুম?

রজত আপনার অজ্ঞাতে বলিয়া উঠিল, রমলার কথা কি বল্‌ছিলেন।

—হাঁ, রমলা, ওর মা আমার ভারি বন্ধু ছিলো, তাই ও মেয়েটাকে বড় ভালোবাসি। ওর বাবা আর আমি এক সঙ্গে বিলেত যাই। আমি আই. সি এস. পাশ করে' এলুম, সে ব্যারিষ্টার হয়ে এলো—ও, বেশ মনে পড়্‌ছে, সেনেদের বাড়ির সে রাতটা, তখন বিভার বয়স রমলার মতনই সতেরো আঠারো হবে, আর দেখ্‌তে—ও, কাল রাতে হঠাৎ যখন রমলা আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো—দেখো, তুমি রমলার একটা পোর্‌ট্রেট্ এঁকে দেবে।

বৃদ্ধের প্রদীপ্ত কণ্ঠ থামিয়া গেল, ঘরের অন্ধকারে তাঁহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, শুধু চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতেছে। রজত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধ ক্লান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, সে

বিভা কতদিন চলে' গেছে, তারপর তার স্বামীও গেছে। স্বপ্নের মত মনে হয় জীবনটা, সেদিন যেন শুরু হল, আর এই ফুরিয়ে গেল। রহস্য, মহা রহস্য, কোথায় নিয়ে চলেছো—

শেষ কথাগুলি কোনো অজানা শক্তির উদ্দেশে বলিয়া যোগেশ-বাবু ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। বাহিরের আকাশে কয়েকটি তারা দপ্-দপ করিতে লাগিল, ঘরের স্তব্ধ অন্ধকার যেন কিসের ভারে কাঁপিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সচকিত হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, হাঁ, কি বল্‌ছিলুম?

রজত ধীরে বলিল, আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, আর কথা বল্‌বেন না।

করুণ হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, শ্রান্ত নয় বাবা, পঙ্গু হয়ে পড়েছি এই বাতে। হাঁ, আচ্ছা, ওই যে অয়েল্-পেন্‌টিংটা দেখ্‌ছেন, অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? কিন্তু আমি জ্বলজ্বল দেখ্‌ছি, ও হচ্ছে আমার স্ত্রী, সেনেদের বাড়িতেই ওর সঙ্গে আলাপ হয় সেই নেমন্তন্নের রাতে। হাঁ, বেশ মনে পড়্‌ছে ও গাইলে রবিবাবুর একটা গান আর বিভা একটা ফ্রেঞ্চ গান, চোখ দু'টো ভারি করুণ লাগ্‌ছে, না? কিন্তু মুখের হাসিটা কি মিষ্টি, মাঝে মাঝে যেন ঠোঁট দু'টো নড়ে' ওঠে, কি কথা বল্‌তে যায়, পারে না, বোবা, ভাষা ভুলে গেছে—

যেন কোন ঘুমঘোর হইতে সজাগ হইয়া উঠিয়া যোগেশবাবু থামিয়া গেলেন। রজত শ্রোতা-রূপে বসিয়া থাকিলেও যোগেশবাবুর কণ্ঠস্বরে ও দেহের ভঙ্গীতে কাতর হইয়া পড়িতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, আপনি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, চলুন একটু বাইরের হাওয়ায়।

যোগেশ-বাবু এবার সহজ কণ্ঠে বলিলেন, হাঁ, ভারি সুন্দর রাত, আপনি বরং বাইরে একটু বেড়িয়ে আসুন, আর দেখুন, আপনার

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? মাধবী যথাসাধ্য দেখ্‌বে জানি, যদি কোনো অসুবিধে হয় জানাবেন।

—না, কোনো অসুবিধে নেই।

ধীরে মাধবী ঘরে ঢুকিয়া পিতার চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বাবা।

—কি মাধু, কি মা?

—চলো, একটু বারান্দায় বেড়াই।

যোগেশ-বাবুর চোখ আবার যেন ঘোলাটে হইয়া আসিল, অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন, আচ্ছা মাধু, বিভা মরার আগে কি বলেছিলো, জানিস্?

কাতরকণ্ঠে মাধবী বলিল, জানি বাবা, তুমি ওঠো।

রজত ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কানে যোগেশ-বাবুর করুণকণ্ঠ আসিল, বলেছিল সে আমাকে ভালোবাসে। মাধবীর প্রদীপ্ত কথাগুলি কানে আসিল—বাবা, চলো, তুমি আজ বড্ড বেশি পড়েছো। আবার যোগেশ-বাবুর ক্লান্তকরুণ স্বর, আর তোর মা বলেছিল—

আবার মাধবীর কান্নার সুরে ডাক, বাবা!

আবার যোগেশ-বাবুর উদাস সুর, আমি কি তোকে ভালোবাসি না না?

রজত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল কিন্তু মাধবীর দীপ্ত তীক্ষ্ণকণ্ঠ কানে আসাতে থামিয়া গেল, কে, কে দিয়েছে, কে দিয়েছে আবার বোতোল বের করে'? মনিয়া, হতভাগা ছোঁড়া।

—না মা, মনিয়া নয়, আমি নিজে।

ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁচের গেলাস ভাঙ্গার শব্দ হইল। যোগেশ-বাবুর কণ্ঠ—ও, তুমি কেঁদো না, তুমি কেঁদো না, ও poor dear, dear, ওই

তোর মা কি বল্‌ছে জানিস্‌, আমায় তো সারাজীবন জালিয়েছো, আমার মেয়েকে জালিও না—তোকে আমি কি কষ্ট দিই মা ?

—বাবা, চলো বাইরে।

পাগলের মত যোগেশ-বাবু বলিতেছেন, ও, ও-ঘরের দরজাটা কে খুলেছে ? বন্ধ করে দিয়ে এসো, না, না, আস্‌তে দিও না, তালা ভেঙে আস্‌বে !

একটা বোতোল ভাঙ্গার শব্দ হইল।

এবার মাধবীর ধীর কণ্ঠ, বাবা একটু স্থির হয়ে শোও !

রজত বাহিরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, লাইব্রেরির দিকে অগ্রসর হইতে মাধবী তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, আপনি নিচে যান, কাজী-সাহেব যদি থাকে পাঠিয়ে দেবেন, কাজীকে, রমলা যেন না আসে। শীগ্‌গির যান।

ধীরে রজত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

কান্নাভরা স্বরে মাধবীর ডাক কানে আসিল, বাবা।

কাজী-সাহেবকে ধরিয়া লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে রমলা এক ছোট নদীর ধারে গিয়া পড়িল। শীর্ণা স্রোতধারা অতি ঝিরিঝিরি বহিতেছে। বালির উপর কতকগুলি বড় বড় কালো পাথরের স্তূপ ; তাহারই উপর দুইজনে গিয়া বসিল। দূরে পাহাড়ের আড়াল দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সূর্য্যের রক্তাভা নদীর জলে ঝিলিমিলি, বালির উপর চিকিমিকি করিতেছে, অতি মৃদু বাতাস বহিতেছে।

নদীর স্থির জলে বালি ছুড়িতে ছুড়িতে রমলা বলিল, কাজী-সাহেব !

পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন, কি রমলা-মা ?

—আচ্ছা, কাজী, তোমার দেশ কোথায় ?

দাড়িতে হাত বুলাইয়া উদাস প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কাজী বলিলেন, আমার দেশ ? যেখানে থাকি সেই আমার দেশ।

—যাও, আমি বল্‌ছি, তুমি কোথায় জন্মেছিলে ? আমার মত তো তোমার বাবা মা নেই, কিন্তু তাঁরা কোথাকার লোক ছিলেন ?

—কেন মা ?

—তোমায় দেখ্‌লে মনে হয় তুমি যেন একটা রহস্য, তাই জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

—আমি জন্মেছিলুম—এম্নি মাটির বুকেই জন্মেছিলুম।

—যাও, বল্‌বে না, তাহলে তোমায় কক্ষনো পিয়ানো শোনাবো না, পাকা চুলও তুলে দেবো না।

—সত্যি মা, আমি পথের ধুলায় জন্মেছিলুম, কোন্ ঘরহারা মা যে আমায় পথে জন্ম দিয়ে গিছ্‌লো তাঁকে তো আমি জীবনে দেখিনি।

কাজীর একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা বলিল, সত্যি, তোমার গল্পটা বলো না—

—আগ্রায়, যমুনার ধারে এক গাছের তলা থেকে আমায় কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে যিনি মানুষ করেন, তিনি দিল্লীর এক প্রসিদ্ধা বাইজী—

—তারপর ? বা, তোমার জীবন নিয়ে দিব্য এক উপন্যাস আরম্ভ করা যেতে পারে।

উদাস স্বরে কাজী বলিলেন, তারপর আর কি, সেইখানে মানুষ হয়ে উঠেছিলুম।

রাঙা নদীর জলের দিকে চাহিয়া কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা ধীরে বলিল, আচ্ছা, কাজী, ওরা কি খুব খারাপ ? আমার মনে হয়

সমাজ ওদের যত খারাপ বলে তত নয়। আমার এত জানতে ইচ্ছে করে।

—খারাপ বলা যায় না মা, তবে কি জানো—

কাজী থামিয়া গেলেন। রমলা বলিল, না, বলো কাজী।

কাজী ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, এই দেখ আমার তো অর্দ্ধেকের ওপর জীবন ওই নরককুণ্ডেই কেটেছে, সুখ নেই মা ওখেনে, শুধু জ্বালা, জ্বালা। আমার মার কথা যখন ভাবি কান্না পায়—নাচে, গানে, মদে, টাকায় সুখ পাননি। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত, দেখি আমাকে জড়িয়ে তিনি সজলচোখে অশ্রান্ত চুমো খাচ্ছেন। এখনও হঠাৎ চমকে উঠি, কে যেন ডাকলো মানিক সোনা। সংসারের বিষটাই ওদের ভাগ্যে পড়েছে, অমৃতের স্বাদ সে ওরা মোটেই পায় না---আমার এত খারাপ লাগতো।

নদীর জলে-ভেজা বালির দিকে চোখ রাখিয়া কাজী চুপ করিল। কাজীর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া রমলা বলিল, আচ্ছা তুমি কোথাও চলে গেলে তো পারতে।

—পালাইনি কি? দু'তিন বার পালালুম, আবার ছুটে এলুম বাইজী মার কাছে। বাইরের লোক এত ঘৃণা করতো, কেউ যদি একটু ভালোবাসতো! কয়েকবার মা নিজে আমায় দু'তিন জায়গায় পাঠালেন, আবার নিজে টেনে নিয়ে গেলেন।

---আচ্ছা, তোমার মত সুন্দর বাঁশী বাজাতে আর গাইতে নাকি দিল্লী শহরে কেউ পারতো না?

একটু ব্যঙ্গের সুরে কাজী বলিলেন, হ্যাঁ, আর এমন মদ খেতে, ভণ্ডামি করতে, তালুকদারদের ছেলেদের উচ্ছন্নে দিতেও কেউ পারতো না।

—না না, কাজী তুমি খুব ভদ্র ছিলে।

—না, মা, এ কাজীকে যৌবনে দেখলে তুমিও ভয়ে পালাতে।

—আচ্ছা, কাজী, তোমার তাহলে সাদি হয় নি?

মৃদু হাসিয়া কাজী বলিলেন, সাদি হয় নি! স্বয়ং স্বরের হুরীর সঙ্গে আমার সাদি হয়ে গেছে।

কাজী কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারসের মত রাঙ্গা নদীর স্থির জলে কাহার মুখ ভাসিয়া উঠিল। কাজী স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সে তরুণী কিশোরীর মুখ নয়, পূর্ণবয়স্কা নারীর মুখ। তাজমহলের বাগানে এক জ্যোৎস্নার আলোয় তাহাকে দেখিয়া মদের পেয়ালা, পাপপুরীর জ্বালা সব ছাড়িয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজী মুখ তুলিয়া দীপ্ত নয়নে রমলার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহারও গণ্ডে এম্নি একটি তিল ছিল; হাস্যমধুর কণ্ঠে কাজী বলিলেন,

আগর্ আঁ তুর্ক্-ই-শীরাজী
বদস্ত্ আরদ্-দিল্-মারা।
বখাল-ই-হিন্দু-য়স্ বখ্শম্
সমরকন্দ্ ও বুখারা-রা॥

রমলা কৌতুকভরা মুখে উচ্চ হাসিয়া বলিল, ওটা কি হল কাজী-সাহেব?

—ওটা কিছু নয়, একটা ভোলা কথা মনে হল।

—ও, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার নয়? তোমার জীবনটা মনে করো না—

—হাঁ, মজারই বই কি, হাসি পায়, কান্নাও আসে—দোষ কাকে দি? রক্তের দোষ আছে, অবস্থার দোষ, ভাগ্যের দোষ আর নিজের দোষ তো আছেই। এই সাত বছর ধরে মদ ছুঁইনি, তবু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে—

মদ কথাটা কাজী উচ্চারণ করিতে রমলা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকারে বলিল, আচ্ছা কাজী, আমার দাদাকে তুমি এখানে এসে দেখোনি, মদ খেলে কেমন দেখায় বল তো ? আমার বোধ হয়—

—তার কি বিয়ে হয়েছে ?

—না, এই তো গেলো বছর বিলেত থেকে এসেছে।

দীপ্তকণ্ঠে কাজী বললেন, মদ ছেড়ে যেন বিয়ে করে সে, আর যদি ছাড়্‌তে না পারে, বিয়ে যেন সে না করে। বোলো, কাজী বলেছে, আমার মত জীবনটা জ্বালিয়ে ছাই করে' দেওয়াও ভালো, তব্—

আপন আবেগ দমন করিয়া কাজী থামিয়া গেলেন।

রমলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, চলো, কাজী, বড় অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে।

দুইজনে উঠিয়া লাল পথ দিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

রমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, এখন তোমায় ঠিক দেখাচ্ছে একজন মুসলমান ফকির, তোমার একতারাটা যদি আন্‌তে।

—বাঁশীর কাছে কি একতারা বাজানো ভাল লাগ্‌বে ?

রমলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ধীরে বলিল, রজত-বাবু কিন্তু ভারি সুন্দর বাঁশী বাজান।

নামটি উচ্চারণ করিতে রমলার পানে-রাঙা ঠোঁট দুইটি যে কিরূপ কাঁপিল, তাহা কাজী লক্ষ্য করিলেন না। রজতের সম্বন্ধে কথা বলা দুইজনেরই মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। রমলার বর্ত্তমান জীবনের কথা লইয়াই গল্প চলিল। তাহার বোর্ডিং-জীবন, দু'একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সম্বন্ধে নানা কৌতুক পরিহাস করিতে করিতে তাহারা বাড়ির গেটে আসিয়া পৌঁছিল।

গেট পার হইতেই রজত তাহাদের দিকে অতি ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া

আসিল। রমলা কিন্তু তাহার উদ্বিগ্নতা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, আমরা কতদূর বেড়িয়ে এলুম, নদী দেখে এলুম।

রজত কাজীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, কাজী-সাহেব, আপনি শীগ্‌গির ওপরে যান, আপনাকে ডাকছেন।

কাজী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আমায় কে ডাকছেন? মাধু?

রজত ব্যস্তভাবে বলিল, হাঁ, যান, আপনাকে দরকার।

কোনো অজানা ভয়ে শিহরিয়া কাজী অতি দ্রুতপদে বাড়ির দিকে ছুটিলেন। পিছনে রমলা ও রজত নীরবে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ নীরবে চলা রমলার সহ্য হয় না, সে বাড়ির সিঁড়িতে উঠিয়া বলিল, কৈ বাঁশীটা এবার—

—ভোলেন নি দেখ্‌ছি।

—না, ফাঁকি হচ্ছে না।

রজত করুণ-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, দেখুন, আমায় ক্ষমা করবেন, এখন আমি বাঁশী বাজাতে পারবো না।

রমলা কি বলিতে যাইতেছিল, রজতের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া গেল। ধীরে সে সিঁড়ির দিকে যাইতেছে দেখিয়া রজত বলিল, ওপরে যাবেন না।

বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রমলা বলিল, কেন?

—বারণ করে' দিয়েছেন।

—বারণ? কে?

কি বলিবে রজত ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, ধীরে বলিল, বারণ করে' দিলেন।

একটু রুক্ষস্বরে, আচ্ছা, বলিয়া রমলা পিছনে বাগানের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৬

রাত্রি গভীর না হইলেও. চারিদিক স্তব্ধ, বাড়িখানি নীরব। ঘরেই রজতের খাবার দিয়া গিয়াছিল। কোণের মার্ব্বেল টেবিলে খাবার চাপা দিয়া সে সে-ঘরের জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ঠিক পাশের ঘরে যে কাজী-সাহেব দুধের বাটি ঢাকা দিয়া দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন তাহা সে জানিত না। ধীরে একটিন সিগারেট ও তাহার বাঁশী লইয়া রজত ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে শুক্লাদ্বাদশীর চন্দ্র হইতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে, লালপথে অভ্রের কুচিগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে. একটু বাতাস বহিতেছে। গাছগুলি যেন নীরবে ভিজিতেছে।

রজত ভাবিল, বাড়ির সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে জানিত না খান্‌সামা আর চাকর মনিয়া ছাড়া সবাই নিজ নিজ ঘরে বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছে। ধীরে সে সাম্‌নের টেনিস্‌কোর্ট পার হইয়া কয়েকটি কস্‌মসের সার ছাড়াইয়া বড় রাস্তার নিকট এক কালো পাথরে বসিয়া সিগারেট ধরাইল। ধীরে একটু বাতাস বহিয়া পিছনের ফুলগাছ দোলাইল। কি ফুলের গাছ তাহা সে দেখিতে পাইতেছিল না, শুধু বাতাসে অজানাফুলের মাদক গন্ধ আসিল। ঐ পুষ্পলতার মত তাহার মনও এই জ্যোৎস্নাতে দুলিতেছে, কাহার সৌরভ তাহার অন্তর এমন উন্মনা করিয়াছে? চুপ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, সব চিন্তা যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে, গুছাইয়া সাজাইবার মত যেন ইচ্ছাশক্তিও নাই। সিগারেট অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলিয়া দিল, আর একটা ধরাইল। গিরিঝর্ণার মত চঞ্চলা কলহাসিনী এইরূপ তরুণীর সহিত এই প্রথম পরিচয়। ইহাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে

পারিতেছিল না। নারীহৃদয়ের রহস্যলোক, যে প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে প্রেমের প্রদীপ। সেই অগ্নিশিখাই কি, তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে? প্রেমেই নারীকে বোঝা যায়; তবু, সারাজীবন পাশাপাশি থাকিয়া সঙ্গী তাহার সঙ্গিনীকে চিনিতে পারে না কেন? বন্ধু ললিতের কথা মনে পড়িল, সে বলে, 'যদি কোন নারীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য অনুভব করতে চাও, তার অন্তরের অপরূপ মায়ালোকে প্রবেশ করতে চাও, তবে প্রথম তাকে ভালবাসো।' রজতের মনে হইতেছিল, তাহার জীবনধারা এই বাড়ির তটভূমিতে আঘাত খাইয়া যেন কোন নূতন দিকে প্রবাহিত হইবে।

সে ভাবিতেছিল, জীবনের মূল সমস্যাটা কি? বাস্তবিক কি চাই? নিছক আত্মসুখ অথবা পরের মঙ্গল অথবা আর্টের উন্নতি অথবা যতীন যাহা বলিয়া গেল, science, civilisation, মানবের কল্যাণ? তাহার জীবনের সত্য কাজ কি?

এই যে বৃদ্ধ আই. সি. এস্., এই যে প্রৌঢ় গায়ক, ইহাঁদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই দুই তরুণী আর তাহার মত কত যুবক তাহাদের শৈশব-কৈশোরের রূপকথার নদীগুলি পার হইয়া রঙীন পাল তুলিয়া সম্মুখে উচ্ছল জীবন-সমুদ্রে যৌবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে—কোন্ দিকে তরী বাহিতে হইবে, কোন্ দিকে? কোন পরমাশ্চর্য্য জীবনীশক্তি কি তাহাদিগকে অন্ধের মত আপন খুশিতে প্রখর ঘটনার স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইবে? আপন তরুণ স্বপ্ন কি যৌবনশক্তি দিয়া জীবনে সফল করিয়া তুলিতে পারিবে?

এই পাহাড়ের মালা ও তরঙ্গায়িত লাল মাটির দিকে চাহিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক মামার কথা, পৃথিবীর বিবর্ত্তনের ধারার কথা মনে পড়িল। কোন জীবনীশক্তি এক অগ্নিময় পিণ্ড হইতে এই শ্যামলা সুন্দরী পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, যুগে যুগে কতরূপে তাহার কত প্রকাশ, কত

কুৎসিত বীভৎস বীজাণু হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরী নারীর দেহ সে গড়িয়া চলিয়াছে, কেন্নো কেঁচো হইতে গোলাপ ফুল, diplodocus, archæopteryx, titanotheres, tetrabelodon হইতে আরম্ভ করিয়া কত রকম মাছ, পাখী, পশু, মানুষ—পৃথিবীর পর্ব্বে পর্ব্বে কত জীবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া সে চলিয়াছে। একদিকে সে যোদ্ধা, রক্তচক্ষু, ক্ষুধার্ত্ত, লালসাপীড়িত, তাই গাছের কাঁটা, বাঘের নখ, হাতীর দাঁত, গণ্ডারের চামড়া, সাপের জিহ্বা, আবার পাথরের বর্শা, লোহার বল্লম, তীর, বন্দুক, কামান, বারুদ। আর একদিকে সে প্রেমিক—ভোগ করিতে চায়, তাই গোলাপ-ফুল, রাঙা পালক, কুহর কণ্ঠ, নারীর আঁখি, শিল্পীর তুলি।

এই পৃথিবীর সৃজনধারায়, তাহার কোথায় স্থান, তাহার কি কাজ? বন্ধুর কথা তাহার মনে পড়িল, সে বলে, প্রতিজীবনের কাজ হচ্ছে আপনাকে বিকশিত করা। ধর্ম্ম কি? সবার ধর্ম্ম সমান নয়, সবার মুক্তিপথ এক নয়। কারো ধর্ম্ম ছবি আঁকা, কারো ধর্ম্ম লোহা পেটা, কারো ধর্ম্ম বাঁশী বাজানো, কারো ধর্ম্ম ইঞ্জিন চালানো, কারো কাজ ধ্যানে বসা, কারো কাজ লাঙ্গল চষা, কারো কাজ সেবা করা, কারো কাজ যুদ্ধে মরা। জগতে সত্য বীর কে? জীবন যে সত্যই কি তা সে জানে; তার দুঃখ বেদনা জেনেও তাকে ভালোবাসে।

আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে রজতের চিন্তাগুলি এম্নি এলোমেলোই আসিতেছিল। সাধারণতঃ সে এত ভাবে না, চোখে চাহিয়া উপভোগ করাটাই তাহার প্রকৃতি! কিন্তু আজ এ দুইটি তরুণী তাহার অন্তরের কোন গোপন দুয়ারে আঘাত করিয়াছে, সে জীবনটা বুঝিতে চাহিতেছে।

যৌবনে একটা সময় আসে যখন নাস্তিকতা মোহের মত তরুণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করে। এই ঈশ্বরে অবিশ্বাস মনের কোনো অসুস্থতা বা বিকৃতির

লক্ষণ নয়। এ উচ্ছল যৌবন-শক্তির নবসৃষ্টিশক্তিরই লক্ষণ, এই সন্দেহের বিদ্রোহ-পথ দিয়া সত্যের মন্দিরে পৌঁছান যায়।

রজতের মনে কিছুদিন ধরিয়া এরূপ এক নাস্তিকতা পাইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু এ মাধবী রাত্রে তারাভরা আকাশের স্নিগ্ধ প্রশান্তির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এই যে রূপের ঝর্ণা, এই যে রসের ফোয়ারা, এই যে অপরূপ রং-এর ঝোরা নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে, তুই চক্ষু ভরিয়া আনন্দে অহর্নিশি পান কর। এই চাঁদের আলো যেন কাহার হাসির অমৃতধারা। সে যাহা কিছু দেখিতেছে, যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছে, সবার পিছনে সে আনন্দ-হাসি উছলিয়া উঠিতেছে।

এ জ্যোৎস্নারাত্রি তাহার শিল্পী প্রাণকে স্পর্শ করিল। মোনা লিসা'র মুখের চিররহস্যময় আনন্দ-হাস্যের মত আজ এ নীলাকাশ ভরিয়া কাহার হাসি! সেই হাসির সুরে শুষ্ক রুক্ষ রক্ত মাটি হইতে সবুজ তৃণ মুখ তুলিতেছে, গাছে গাছে ফুল রঙীন হইয়া উঠিতেছে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঝর্ণার মৃদঙ্গ বাজিতেছে। মানুষ কি? সে কি সত্যই অমর আত্মা, অমৃতলোকের যাত্রী? না, সে বীজাণু, এক জীব-কোষ, মৃত্যুতে মাটিতে হাওয়ায় মিশিয়া যাইবে? এ সব ভাবিবার দরকার নাই, আজ রজত যাহা দেখিতেছে, যাহা স্পর্শ করিতেছে, চারিদিকে কি অনাহত বীণা বাজিতেছে, সবার পিছনে কাহার হাসির রঙের ধারা। বিশ্বশতদল-লীনা অনন্ত উর্বশীর জ্যোৎস্নাহাসির দিকে চাহিয়া রজত বাঁশীটি মুখে তুলিল।

রজত যখন জ্যোৎস্নার আলোয় বসিয়া ভাবিতেছিল, তখন যোগেশবাবু তাঁর শোবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় চুপ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। সে ঘরে মাধবী ছিল না বটে, কিন্তু সে পাশের ঘরে পিতার জন্য সজাগ হইয়া ছিল। জান্‌লার কাছে ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতায় চাঁদের আলো

করুণ চোখের মত ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া সে নিজ জীবনের কথাই ভাবিতেছিল। যতদিন তার মা ছিলেন, ততদিন সে মনের সহজ আনন্দে বাড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর স্কুল ছাড়িয়া পিতার গুরুভার বহিতে বহিতে সে যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তি পাইলে যেন সে বাঁচে, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে পিতার জন্য এমন সুনিবিড় প্রীতি আছে যে পিতাকে ছাড়িয়াও সে যেন কোথাও থাকিতে পারিবে না। এ বাড়িতে সে তাহার সমবয়স্ক কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী পায় নাই, শুধু মাঝে মাঝে রমলা ছুটির সময় আসে। বাড়িতে থাকিলেও তাহার শিক্ষার কোনো ত্রুটি হয় নাই। এক মেম শিক্ষয়িত্রী বরাবর ছিলেন, কয়েক মাস হইল তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কাজী-সাহেবের কাছে সঙ্গীত-চর্চ্চা হয়, পিতাও মেয়ের পড়াশুনা মাঝে মাঝে দেখেন।

তাহার এই উনিশ বছরের জীবনে খুব কম যুবকদের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে। দার্জ্জিলিং, কি সিমলা, কি পুরীতে গ্রীষ্মযাপনের সময় যে কয়জনের সহিত নমস্কারের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই তাহার মন স্পর্শ করে নাই। কিন্তু যে তরুণ শিল্পী তুলি দিয়া তাহার চিত্তের প্রশংসা লাভ করিয়াছে, সে আজ তরুণ আঁখি দিয়া তাহার চিত্তের প্রেমও লাভ করিতে চায়।

একা থাকিয়া থাকিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবা মাধবীর স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। স্থিরতাই তাহার প্রকৃতি; কিন্তু চোখের জলের মত করুণ চাঁদের আলোয় ভরা ঘরে সে আজ কেমন বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। একবার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিল, জান্‌লার কাছে গিয়া সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিল, আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। মনকে বুঝাইল, এ চঞ্চলতার কারণ তাহার পিতা। কাল রাত্রে এম্নি সময় রমলাকে দেখিয়া তাহার পিতা অত্যন্ত উত্তেজিত

হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার ভয়ই হইয়াছিল। সে অবশ্য জানিত তাহার পিতা রমলার মাকে ভালোবাসিতেন। কিন্তু রমলা পূর্ব্বেও তো বহুবার আসিয়াছে, কখনও তিনি এমন চঞ্চল হন নাই, আর জ্বালাময়ী প্রেম-স্মৃতিকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য মদের দরকার হয় নাই। এবার রমলা যেন একটা ঘূর্ণী-হাওয়ার মত আসিয়াছে। সে চারিদিকে গোলমাল, আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছে। নানা কথার মাঝে বার বার রজতের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে বৃদ্ধ যোগেশ-বাবু ঠিক কিছু ভাবিতেছিলেন না, তাঁহার চিন্তার সূতা খালি জোট খাইতেছিল, চক্ষু দিয়া দু'এক বিন্দু জলও ঝরিয়া পড়িতেছিল। স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যার পাশে বসিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, মদ আর ছুঁইবেন না, সে প্রতিজ্ঞা অবশ্য রাখিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এমন করিয়া কোনোদিন আত্মহারা হন নাই। কাল রাত্রে যখন রমলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বিভা বলিয়া ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়াছিলেন; বিবাহের রাত্রে রক্ত-পট্টবস্ত্রপরিহিতা বিভা ঠিক এম্নিই দেখাইয়াছিল। সে বিবাহে অবশ্য নবদম্পতি সুখী হয় নাই, আর তারপর তিনি যে বিবাহ করেন, তাহাতেও কেহ সুখী হয় নাই। শুধু একটু সময়ের গোলমালে কতকগুলি জীবন ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া গেল। তিনি যেদিন সন্ধ্যাবেলা বিবাহের প্রস্তাব করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, সেইদিন প্রভাতে বিভার বিবাহের লালচিঠি আসিল। সেই রাতে তিনি আবার মদের পেয়ালা শুরু করিলেন।

তার পর পূর্ণযৌবনে বিভা সহসা এক দিন অ্যাপোপ্লেক্সিতে তিন ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। তাঁর স্বামীও কয়েক বছর বাদে হঠাৎ নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, নিউমোনিয়া, মদ, ক্রিমিন্যাল ব্যারিষ্টারের রাত্রি জেগে খাটুনি, এ ত্র্যহস্পর্শ হলে কেউ বাঁচাতে পারে না। আর তাঁর স্ত্রীও তো তাঁহার অত্যধিক মদ্যপান ও

মানসিক অশান্তির জন্য অকালে মরিয়াছেন। সেই মদ আবার ছুঁইলেন কেন? জ্বালা, অসহনীয় জ্বালা, মাঝে মাঝে বিশ্বের বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, আগুন জ্বালিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে চায়। ভুলিতে চান, ভুলিতে চান। অস্পষ্টস্বরে শুধু বলিলেন, না মাধু, আর জ্বালাবো না। আবার বিভার কথা মনে জাগিতে লাগিল।

যোগেশ-বাবুর ঠিক নিচের ঘরটিতে আর একজন প্রৌঢ় তাঁহার যৌবন-স্বপ্ন ভাবিতেছিলেন। মর্‌চে-পড়া তার-ছেঁড়া পুরাতন বীণা ধূলায় ভরিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল, সহসা কিসের স্পর্শে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; পুরাতন মধুর গানগুলি বাজিতেছে। আজ সন্ধ্যায় রমলা কাজীর বুকের শুক্‌না পাঁজরগুলিতে যেন মৃদঙ্গ বাজাইয়া তুলিয়াছে। এম্নি জ্যোৎস্না-রাত্রে আগ্রায় এক মর্ম্মরের প্রাসাদে বসিয়া যে সাকীকে বীণ শুনাইয়া-ছিলেন, সে আজ কোথায় তাহা কেহ জানে না। তখন কাজীর বয়স সতেরো হইবে, বারবনিতাদের বীভৎসতা অসহ্য হওয়াতে কাজী পলাইয়া এক বাঙ্গালি ভদ্রলোকের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন, তার মেয়েকে গান শিখাইতেন। তাঁহার মনে পড়িল অর্দ্ধরাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন, সেই কিশোরীর ঘরের দিকে যাইবার জন্য উঠিলেন, ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া ভূতের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই রাতে আবার তাঁহার বাইজী মার কাছে ফিরিলেন। তারপর জীবনে তাহার সহিত একবার দেখা হইয়াছিল। তখন যৌবনের শেষঘাটে, মমতাজের অনুপম মর্ম্মর-সমাধির ছায়ায় শুধু ক্ষণিকের চাউনি। সে চাউনি প্রেমের সহিত বলিয়াছিল, আর কেন? এবার ও পেয়ালা ভেঙে ফেলো, আর তো সুধা কানায় কানায় উচ্ছল হয়ে উঠ্‌বে না, শুধু গরল তলায় জল্‌বে। সেই রাতে কাজী ফকির হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আজ রমলাকে দেখিয়া সেই নবজীবনদায়িনী নারীর কথা বার বার মনে পড়িতেছিল।

রমলা কিন্তু তাহার ঘরে ছিল না। সে বাহিরের জ্যোৎস্নায় বসন্ত-বাতাসেরই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছল যৌবনের অকারণ সুখে তাহার দেহ মন কানায় কানায় ভরা। যে-সব খুঁটিনাটি তুচ্ছ ঘটনায় অন্য মেয়েদের মনে মেঘ জমিয়া বজ্রগর্জ্জন এমন কি বারিবর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া যায়, সে-সব ঘটনা সে হাসির হাওয়ায় নিমেষে উড়াইয়া দিত। বেডিংএর বন্দীশালায় থাকিয়াও তাহার মনের সজীবতা, আনন্দ উপভোগের শক্তি পঙ্গু হইয়া যায় নাই। চানাচুর কি জ্যোৎস্নার রাত, গোলাপফুল কি ভালো ফিল্ম, ভালো গান কি কাপড়ের রং দেখিলেই সে নাচিয়া বলিয়া উঠিত, how lovely! তাহার দর্শনশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—এক I adore it; আর এক I hate it; মধ্যপথ কিছু নাই। সুখ জিনিষটা কি, কি করিয়া পাওয়া যায়, এ সব ভাবিবার শক্তি বা সময় তাহার ছিল না। রমলার দর্শন অনুসারে অতীতের জন্য দুঃখ করিয়াই বা কি হইবে, ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্ন গড়িয়াই বা কি হইবে, যাহা পাও, উপভোগ করো, আনন্দ নিংড়াইয়া লও। তাই মাধবীর গাম্ভীর্য্যকে সে পছন্দ করিত না, আর আনন্দ উপভোগের কোনো উপায় সম্মুখে থাকিলে তাহা বৃথা যাইতে দিত না। মোটর চড়াই হোক, আর ঘর ঝাঁট দেওয়াই হোক, রান্না করাই হোক, আর নভেল পড়াই হোক, গল্প বলাই হোক আর খুনসুটি করাই হোক—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের পেয়ালা যে আনন্দে ভরা, ইহাই সে জানিত। পিতার মৃত্যুর পর ডায়োসেসন্-বোর্ডিং তাহার বাড়ি হইয়া উঠিয়াছে। বরাবর যোগেশ-বাবুই তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, এখন তাহার দাদাই তাহার ভার লইয়াছেন। বোর্ডিংএর পচা রান্না, শক্ত চেয়ার টেবিল আর বদ্ধ প্রাচীর হইতে এ প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাইয়া সে স্বাধীনতা পূরাদমে উপভোগ করিয়া লইতেছিল। এখানকার ভেল্‌ভেটে মোড়া চেয়ারে বসিবার আরাম, সোফায় শুইয়া পড়িবার আয়েস, আপন খুশিমত রাঁধিয়া খাইবার

সুবিধা, মুক্তপথে যথেচ্ছা ঘুরিবার সুখ, খুশিমত পিয়ানো বাজাইবার আনন্দ, ইত্যাদি দেহমনের সব ছোটবড় সুখে সে পরম তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ছায়ায় ছায়ায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

রজত অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট মুখ হইতে ফেলিয়া বাঁশীটি মুখে তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ধীর বাতাসে বাঁশীর সুরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মাধবী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না-রাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সাথী-হারা এক কুহর করুণ কণ্ঠ ফুলের কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, এ ক্ষণস্থায়ী জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্যতীরে কোন চিরব্যর্থ প্রেমতৃষ্ণা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। যোগেশ-বাবুর চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল, তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়া জান্‌লাটা ভালো করিয়া খুলিয়া জ্যোৎস্নার আলোয় সোফায় বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিভার সেই গানের সুর জ্যোৎস্নায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কাজী-সাহেব ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় এক কোণে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার যৌবনস্বপ্ন সুরের রংএ ভরিয়া গেল। বীণ বাজাইয়া যে গজল তিনি কৈশোরের এক রাতে গাহিয়াছিলেন, তাহারি সুর-হুরী যেন তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।

আর রমলার মনে যে কি হইল তাহা বলা শক্ত, সে শুধু বেড়ানো বন্ধ করিয়া রাঙা কাঁকরের উপর বসিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ বাঁশী বাজাইয়া রজত থামিল। স্তব্ধ বাড়ির দিকে চাহিল। তারাভরা আকাশের নীল পটে আঁকা লালবাড়িটি মহারহস্যভরা, যেন রূপকথার সুপ্ত রাজকন্যার নিঝুমপুরী, রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁওয়া লাগিলেই জাগিয়া উঠে। ধীরে সে বাড়ির দিকে চলিল। দু'ধারে গাছগুলি নিদ্রিত দৈত্যের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া।

বাঁশী থামিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না ভরিয়া সে বাঁশীর তান যেন নীরবে বাজিতেছে। চারিদিক কি স্তব্ধ, শুধু তাহার ঘরের নিকটে আসিতে পাশের কুঞ্জ হইতে কে চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। তারাভরা নীলিমার মত তার নীলশাড়ীর ঝলমলানি।

৭

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে রজতের ডাক পড়িল। সাদা মার্ব্বেলের লম্বা টেবিলের একদিকে যোগেশ-বাবু বসিয়াছেন। তাঁহার এক পাশে কাজীসাহেব আর এক পাশে মাধবী। রমলা তাঁহাদের উল্টা-দিকে দাঁড়াইয়া চা তৈরী করিয়া দিতেছিল।

রজত ধীরে নমস্কার করিয়া ঢুকিতেই, রমলা স্মিতহাস্যে তাহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পাশের চেয়ার দেখাইয়া দিল। মাধবী একবার নির্নিমেষ নয়নে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু দুইটি চায়ের কাপে স্থাপিত করিল। কাজী-সাহেব প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। আসুন, বলিয়া যোগেশ-বাবু অভ্যর্থনা করিলেন। রজত চেয়ারটা রমলার পাশ হইতে একটু টানিয়া ধীরে বসিল।

চা তৈরী করিয়া রমলা দুষ্টামিভরা চোখে বলিল, চা খেতে কোন আপত্তি নেই তো, না দুধ এনে দেবো?

রজত যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এরূপ ভান করিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিল, আগে ওঁকে দিন।

রমলা যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, ঠিক বটে, ladies first।

সে কাপটা মাধবীকে দিয়া পরের কাপটা রজতের দিকে অগ্রসর করিতেই, রজত আবার বলিল, আপনি আগে নিন।

রমলা হাসিমাখাস্বরে বলিল, না guest first এবার।

চা দিয়া সবাইকে রুটিতে মাখন মাখাইয়া দিতে দিতে রমলা জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, আর এক কাপ ? কাজী-সাহেব ?

দাড়ি নাড়িয়া কাজী বলিলেন, না মা, আচ্ছা দাও, তোমার হাতে চা-টা আর-এক কাপ খেতে ইচ্ছে করছে।

কাজী-সাহেবকে আর এক কাপ্ দিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, মাধু, চা ? আপনি ?

রজত ধীরে কাজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল, আচ্ছা দিন আর-এক কাপ ! রূপালী কাপে সোনালী চা !

রমলা হাসিয়া বলিল, বা, ও তার চেয়ে কফি আরও সুন্দর দেখায়, lovely কফি। আচ্ছা কাকবাবু, আজ খেয়ে ওই ফার্সী নিয়ে পড়তে পাবেন না, তার চেয়ে কোথাও বেড়াতে চলুন।

কাপটা মুখ হইতে নামাইয়া যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধনয়নে রমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার যে বাত মা, বেশি চলতে তো পারবো না, এ ক'দিন আবার বেড়েছে।

কৌতুকভরা চোখে সবাইয়ের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, বাত ! ও, আমি একটা বাতের ওষুধ জানি--হিমাচলের এক সন্ন্যাসীর স্বপ্নলব্ধ ঔষধ।

কাজী-সাহেব পেয়ালাটার চা নিঃশেষ করিয়া প্লেট রাখিয়া বলিলেন, তাই না কি মা, বল তো।

রমলা মাধবীর প্লেটে রুটি দিয়া বলিল, ও সে বা ভয়ঙ্কর, নিশ্চয় মাধবী ভয় পাবে।

মাধবী ধীরে ধীরে বলিল, বলই না বাপু।

মাখন-মাখা রুটিটা নাড়িতে নাড়িতে রহস্যভরা স্বরে রমলা বলিতে আরম্ভ করিল, শুনুন কাকাবাবু, কুড়িটা কালো কাঁকড়া-বিছে, এ সাধারণ বিছে নয়, সে না কি কোন্ পাহাড়ের জঙ্গলে পাওয়া যায়,

সাপের মত বিষাক্ত, কেঁচোর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, কুচকুচে কালো, আর চারটে ধুত্‌রো-বিচি, এক তোলা গাঁজা, এক তোলা আফিম, আধ পো গরগরে লাল লঙ্কা, এই না দেড়সের সরষের তেলে ফেলে আগুনে চড়িয়ে সেদ্ধ কর্‌তে হবে, তার পর তেল যখন ফুটবে ওই জীবন্ত বিছে-গুলো ফেলে দিতে হবে। সেই তেল মরে' মরে' আদসের থাক্‌তে নামাতে হবে, তার পর তাই ছেঁকে যে কালো কুচকুচে তেল বেরোবে কয়েক-দিন মাখ্‌লেই—এখন সে বিছে পাওয়াই মুস্কিল।

রজত হাসিয়া বলিল, সে বিছেও কোনো পাহাড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর সে তেলও কেউ তৈরি কর্‌তে পার্‌বে না।

রমলা নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরি করিতে করিতে বলিল, কেন হনুমান যদি এ যুগে থাক্‌তো, তবে হুকুম দিলেই পাহাড় শুদ্ধ এনে হাজির কর্‌ত।

রজতের গণ্ড একটু লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে রুটি চিবাইতে লাগিল। সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত না করিয়া রমলা চীৎকার করিয়া উঠিল, এ মা, কি পিঁপড়ে জেলিটায়! কাকা-বাবু, আর রুটি? না?

জেলির শিশি হইতে পিঁপ্‌ড়ে ঝাড়িতে ঝাড়িতে রজতের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, জানেন, একবার একদল লাল পিঁপ্‌ড়ে আমাদের বোর্ডিং আক্রমণ কর্‌লে, সে এমন কাণ্ড যে, চিনি রেখে চা তৈরি কর্‌তে কর্‌তে চিনি উড়ে যেতে লাগ্‌লো।

রজত রুটিখানি শেষ করিয়া বলিল, ও, যেমন হ্যাম্‌লিন শহরে ইঁদুরেরা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ছেলেদের বোর্ডিএ তো অমন পিঁপ্‌ড়ে হয় না—

রমলা উত্তর দিল, তাঁরা বিনা চিনিতে চা খান বলে। শুনুন না—সে এমন পিঁপ্‌ড়ে, কাজী তো শুনেছো—

কাজী দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন, হাঁ, আর তার সঙ্গে ছার-পোকা আরশোলার আক্রমণটা বাদ দিচ্ছো যে ?

রমলা চাম্‌চে করিয়া চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে বলিল, আমাদের গান হল জানেন কি, কাকাবাবু—

জ্যামেতে জেলিতে শাড়ীতে ফুলেতে
পিঁপ্‌ড়ে সকল ঠাঁই,
পাউডার আর পমেটমটিতে
পিঁপ্‌ড়েয় ভরা ভাই।
সাবান মাখাও দায়,
চানাচুর আর চকোলেট যত
নিমেষে উড়িয়া যায়।

যোগেশ-বাবু নিম্নস্বরে বলিলেন, কে লিখেছিলো গানটা ?

মাধবী ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, নিজেরই লেখা গান, শোনানো হচ্ছে।

রজত তাহার মুখের দিকে চাহিতেই রমলা সলজ্জভাবে নিজের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নিজের রুটিতে জ্যাম মাখাইতে মনোনিবেশ করিল।

কাজী রজতের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আর-একবার গাও তো, মা।

রমলা বলিল, বা, আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আপন রুটি চা-তে সে এতক্ষণে গভীরভাবে মনোযোগ দিল।

সবাই চুপচাপ দেখিয়া রজত ধীরে যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করবো ভাবছি।

রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে যোগেশ-বাবু বলিলেন, আজ থেকেই ! দু' একদিন বিশ্রাম নিতে পারেন।

রজত উত্তর দিল, না, দরকার নেই। ছবিগুলো একটু ভেবে

আঁকতে হবে, কতকগুলো বড় ছবি আঁকার কাগজ পাঠাতে আমার বন্ধুকে লিখে দিয়েছি, তবে পোরট্রেট্‌গুলো শীগগির আরম্ভ করা যেতে পারে।

যোগেশ-বাবু বলিলেন, তা বেশ, কা'র আরম্ভ কর্‌বেন? কাজী-সাহেব?

কাজী মাথা ও দাড়ি নাড়িয়া বলিলেন, না, না, আমার কেন, কি দরকার, আপনারই—

যোগেশ-বাবু স্নেহভরা চোখে মাধবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তবে, মাধুমা'র?

মাধবী বাপের দিকে শূন্য দৃষ্টি রাখিয়া একটু তিক্তস্বরে বলিল, না বাবা।

মৃদু হাসিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, তা হলে তো আমারই আরম্ভ কর্‌তে হয়।

চায়ের কাপ শেষ করিয়া রমলা বলিল, আমি বুঝি বাদ গেলুম?

অতি অপ্রতিভ হইয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, না, মা, তোমার কথাও ওঁকে বলেছি, তা হলে তোমারই—

তাঁহাকে বাধা দিয়া রমলা পরিহাসের সুরে বলিল, আমি চুপ করে' বসে থাক্‌লে তো উনি আঁকবেন, আমি sitting দেবো না, চুপচাপ বসে' থাক্‌তে পার্‌বো না—

রজত ঠোঁট মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, sitting দেবার দরকার হবে না।

তারপর ধীরে বলিল, কাজীসাহেবের ছবি আগে আরম্ভ করা যাক।

যোগেশ-বাবু বলিলেন, আচ্ছা, তাই বেশ আর মাধু-মাকে একটু আঁকতে শিখিয়ে দেবেন।

রজত বলিল, একটা সময় ঠিক কর্‌লে ভালো হয়।

মাধবীর দিকে ফিরিয়া যোগেশ-বাবু স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, কখন তোমার সময় হবে, মা।

চোখ না তুলিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে মাধবী বলিল, আমার সময় হবে না, বাবা।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কেন মা! শরীরটা ভালো নেই!

ধীরে বাবার দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া মাধবী বলিল, আচ্ছা, দুপুরে এক ঘণ্টা।

রজত যোগেশ-বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা হলে ভালো হয়।

যোগেশ-বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, ও এক ঘণ্টাই শিখুক আর এক ঘণ্টা নয় রমুকে—

রমলা রুটির অর্দ্ধেক হইতে ভাঙিয়া লইয়া বলিল, না, কাকাবাবু আমার ও সব ভালো লাগে না, ও-সব হবে না, ততক্ষণ পুডিং বাঁধলে—

কাজী হাসিয়া বলিলেন, বেশ মা, আমাদের তুমি রোজ নতুন নতুন পুডিং খাইও।

রমলা উৎসাহের সহিত বলিল, আচ্ছা, কি খাবেন? Almond Pudding, Custard Pudding, French Pudding, Quaking Pudding?

রজত বলিল, ও শেষেরটা নয়।

কাজী বলিলেন, সেই কি রমলা পুডিং খাইয়েছিলে?

—ও, বলিয়া রমলা তাহার রুটিতে মন দিল।

যোগেশ-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইতে কাজী ও মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একহাতে তাঁহার লাঠিতে আর-এক হাতে মাধবীর হাতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন। কাজী তাঁহার পিছন পিছন

চলিলেন। রজত একবার রমলার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া পাশের দরজা দিয়া বারান্দায় বাহির হইল। সবাই চলিয়া গেল, রমলা তাহার জ্যাম-মাখা রুটির শেষটুক্‌রা চিবাইতে চিবাইতে একটা চামচ লইয়া প্লেটে কাপে টুং টুং শব্দ করিয়া এক পিয়ানোর সুর বাজাইতে লাগিল।

হাসিভরা সুরে বলিয়া উঠিল, কেমন বাজ্‌ছে বল্‌ তো মনিয়া ?

কিশোর চাকরটি কালো টিকের মুখে আগুনের মত তাহার পানে রাঙা ঠোঁটগুলি আনন্দে কাঁপাইয়া বলিল, ভারি সুন্দর, দিদিমণি; কিন্তু যখন ঝন্‌ঝন্‌ করে' প্লেট ভেঙে পড়ে !

—তুই ভাঙ্‌তে পারিস্‌ এ প্লেটখানা ?

—খুব পারি !

—ভাঙ্‌ !

—বক্‌বেন, মাধু-দিদিমণি বক্‌বেন।

—আমি বল্‌ছি, তুই ভাঙ্‌।

—না, দিদিমণি।

—আচ্ছা, আমি ওর দাম দেবো, তুই বাজার থেকে কিনে আনিস্‌।

—না, দিদিমণি !

—যাঃ ভীতু, দেখ—

রমলা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া একখানি মাখন-লাগানো পাখীফুল আঁকা বড় প্লেট মেজেতে জোরে ফেলিয়া দিল। ঝনঝান শব্দে প্লেটখানি ভাঙিয়া সাদাটুক্‌রাগুলি চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। সহাস্য চোখে সেই ভগ্নখণ্ডগুলির দিকে চাহিয়া রমলা দাঁড়াইয়া রহিল।

প্লেটভাঙার শব্দে দুই দিক হইতে মাধবী ও রজত ছুটিয়া আসিল। মনিয়া ভীতমুখে মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দিদিমণির হাত থেকে প্লেটটা পড়ে' ভেঙে গেলো।

রমলা হাসির বাতাস তুলিয়া বলিল, যা মিথ্যুক্, একখানা প্লেট ভেঙে দেখ্‌লুম ভাই, কেমন শব্দ শুন্‌তে।

মাধবীর গম্ভীর মুখ হাসির আলোয় একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল দেখিয়া রজতের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, গোটের গল্প জানেন না? একবার তিনি রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কেউ নেই, সাদা ধপ্‌ধপে প্লেটগুলো টেবিলে সাজানো; একে একে সেগুলো তিনি জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেল্‌তে শুরু কর্‌লেন; প্রত্যেকখানা ঝঙ্কার দিয়ে ভাঙে আর তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন; তাঁর মা তো শব্দ শুনে ছুটে এসেছেন, গ্যেটে মনের আনন্দে প্লেটের পর প্লেট ভেঙে চলেছেন, মা এসেছেন খেয়ালই নেই, মা তাঁর ছেলের সুখের আনন্দের দিকে চেয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন, বকুনি দেওয়া হল না।

কথা শেষ করিয়া রমলা চাহিয়া দেখিল, মাধবী নাই, চলিয়া গিয়াছে।

সেইজন্যেই তিনি এত বড় কবি হতে পেরেছিলেন, বলিয়া রজতও মুচকিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

রমলা একটা পিয়ানোর সুর মৃদু গাইতে গাইতে মনিয়ার সঙ্গে প্লেটের ভাঙা অংশগুলি তুলিতে লাগিল।

৮

সেইদিনেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে বলিল বটে কিন্তু সমস্ত সকাল রজত আপন ঘরে হেলাফেলা করিয়া কাটাইল। প্লেটভাঙার ঝনঝনানি সুর তাহাকে ঘিরিয়া প্রভাতের আলোয় বাজিতে লাগিল।

সমস্ত দুপুর অলসভাবে কাটিল। একবার মাধবীকে চিত্রবিদ্যা শিখাইতে ড্রয়িংরুমে গিয়াছিল। মাধবী এরূপ আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল যে,

সে কলেজের প্রফেসারের মত মুখবন্ধ বক্তৃতা দিয়া আর মাঝে মাঝে কাগজে দু'চারিটি রেখা টানিয়া কোনমতে আধঘণ্টা কাটাইল। তার পর মাধবী, ভালো লাগ্‌ছে না, বলিয়া তাহাকে বিদায় দিল। একা ঘরে সে দিবা-স্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।

রজত বিকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইল, মাধবী ও রমলা পিয়ানোর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। ড্রয়িংরুমের পাশ দিয়া গেলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। সে ধীরে একা সাম্‌নের পথ ধরিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেল। নূতন অজানা জায়গার পথে ঘোরার মহারহস্য আছে, হঠাৎ কোন্ পথ যে কোথায় লইয়া যাইবে, কোন্ কোণে যে কি পরমাশ্চর্য্যকর বস্তুর সন্ধান মিলিবে, তাহা কে জানে। চঞ্চল উৎসুক চিত্ত লইয়া রজত পথ ধরিয়া বরাবর চলিল।

রমলা মাধবীর নিকট তাহার কলেজের গল্প করিতেছিল। রজত বারান্দা দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, ভাই মাধু, রজত-বাবু বেশ আঁক্‌তে পারেন, না?

একখানি সচিত্র বিলাতী পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাধবী বলিল, হুঁ।

চেয়ারটা একটু দোলাইয়া রমলা বলিল, কাল রাতে কি সুন্দর বাঁশী বাজাচ্ছিলেন! আমাদের বোর্ডিংয়ের সেই ফিরিঙ্গি মেয়েটা, মনে নেই যার মুখ ঠিক পানের মত, সে এক ছেলের বাঁশী বাজানো শুনে তাকে বিয়েই করে' ফেল্লে! এঁর বাঁশী শুন্‌লে কি কর্‌তো না জানি! আর আঁকেন তো চমৎকার, অবশ্য আমি ছবির কিছুই বুঝি না।

মৃদু হাসিয়া মাধবী পত্রিকাখানা মুড়িয়া বলিল, গুণের তো ব্যাখ্যা হল, এবার তোমার 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ কর।

রমলা যখন কাহাকেও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার বন্ধুরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, কতগুলি প্রিয় সত্য ও মিথ্যার পর না জানি

কি অপ্রিয় তীক্ষ্ণ সত্যকথা বাহির হইবে। সে কাহারও দোষ বলিতে গেলে আগে তাহার গুণের তালিকা দিয়া শুরু করে।

চেয়ারে স্থির হইয়া বসিয়া রমলা বলিল, না, কিন্তুটা থাক্, তুমি তা হলে যা চট্‌বে!

—বেশ মেয়ে! বা, আমি চট্‌ব কেন?

রমলা মাধবীর কাছে চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া তাহার দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, আচ্ছা, ভাই, ওঁর বাড়ি কোথায়, বাবা মা আছেন নিশ্চয়?

একখানি নূতন মাসিকপত্রিকা নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল, তা আমি কি জানি, ছবি আঁক্‌তে এসেছেন, তাঁর বাড়ির খবর কে জিজ্ঞেস কর্‌তে গেছে?

মাধবীর বাম গালটা টিপিয়া রমলা বলিল, আঁক্‌তেই তো এসেছেন, তোমার মনে কিছু না আঁকেন তাই বল্‌ছি।

রমলার হাতটা জোরে টিপিয়া মাধবী বলিল, যা, বাজে বকিস্ না, কার মনে কে কি আঁকে তা দেখা যাবে।

রমলা ধীরে উঠিয়া মাধবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার হাতে খোলা পত্রিকার উপর যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল, এবার এসে তোকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মেমগুলোর ছবি দেখ্‌ছিস্ ওদের চেয়ে তোকে দেখ্‌তে ভালো, দেখ্ তো, রং যেন ফেটে পড়্‌ছে।—বলিয়া তাহার রক্তিম অধরে এক চুম্বন করিল।

—আ, কি করিস্, আর জালাতন করিস্ না রমু।

—বেশ কর্‌বো, বলিয়া তাহার ডান গালটা সজোরে টিপিয়া রমলা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

মাধবীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, তুমি কিন্তু এবার এমন গম্ভীর হয়ে গেছো, আমার এসে প্রথম ভয়ই করেছিলো।

তার পর পিয়ানোর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া রমলা বলিল, এবার প্রাইজের সময় যে গানটা বাজিয়েছিলুম্ শুন্‌বি ?

পত্রিকা উল্টাইতে উল্টাইতে মাধবী বলিল, আচ্ছা, বাজা।

রমলা পিয়ানোয় ঝঙ্কার দিল।

একা একা বেশিদূর যাইতে রজতের ইচ্ছা হইল না। সে যখন বেড়াইয়া ফিরিল, সন্ধ্যা হয়-হয়। রমলা পিয়ানোর পাশে চুপচাপ বসিয়া আছে, মাধবী উপরে পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

রজত ড্রয়িংরুমে ঢুকিতে রমলা তাহাকে লক্ষ্য করিল না দেখিয়া সে যেন অন্ধকার ঘরটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আজ অনেক দূর বেড়িয়ে এলুম।

রমলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, মোটেই না এই মাত্র তো গেলেন।

অপ্রস্তুত হইয়া রজত বলিল, অনেক দূরই তো বোধ হল, বেশ জায়গাটা।

রমলা কোনো উত্তর না দিয়া চেয়ারটাকে মৃদু দোলাইতে লাগিল। রজত ধীরে বাহির হইয়া গেল। বারান্দা পার হইয়া লাল পথ দিয়া গেটের দিকে চলিল। এবার সে সত্যই বহুদূর ঘুরিয়া অনেক রাতে বাড়ি ফিরিল।

৯

এইরূপে রজতের কয়েকদিন কাটিয়া গেল। সকালবেলা কাজী সাহেবের পোরট্রেট আঁকিয়া, যোগেশ-বাবুর সঙ্গে ছবি আঁকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটিয়া যায়; দুপুরের কিছুক্ষণ মাধবীকে ছবি আঁকা শেখানো হয়, বাকী সময়টুকু রজত নিজের ঘরে বসিয়া আপন খুশিমত ছবি আঁকে বা লাইব্রেরিতে গিয়া ছবির বই দেখে, অলসভাবে কাটায়,

সন্ধ্যাবেলা ও রাত্রি একা বেড়াইয়া বাঁশী বাজাইয়া নভেল পড়িয়া কাটিয়া যায়।

ছবি আঁকা শেখানোর সময় মাধবী অতি আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই বলে না। মাঝে মাঝে দু'একবার পেন্সিল বা তুলির টানের মধ্যে তাহার কাঁচের মত স্বচ্ছ চোখ রজতের অগ্নির মত দীপ্ত চোখের উপর গিয়া পড়ে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তৃতীয় দিন একবার ও চতুর্থ দিন দুইবার রজতের আঙুলের সঙ্গে মাধবীর আঙুর-আঙুল নিমিষের জন্য ঠেকিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রজত কিছুই চঞ্চল হয় নাই। মাঝে মাঝে রজতের কথা শুনিতে শুনিতে মাধবী যেন তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য হারাইয়া ফেলিত, মাঝে মাঝে মনে হইত যেন তাহার মাথায় কিছুই ঢুকিতেছে না। হঠাৎ, সে অতি শ্রান্ত বলিয়া, তাহার ছবি রজত কিরূপভাবে সংশোধন করিতেছে তাহা না দেখিয়া উঠিয়া যাইত; আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিত।

মাধবীর জন্য রজতের মনে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য ছিল না, কিন্তু রমলা তাহাকে মাঝে মাঝে সত্যই চঞ্চল করিয়া তুলিত। রমলার সহিত বেশি মেশা যে মাধবী পছন্দ করে না তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল। ভদ্রতা-অনুসারে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, কি কথা বলা যায়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; সে যতই এটিকেটের পাহাড় তুলিয়া রমলার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহিত, ততই সে গিরিঝর্ণার মত কলগানে সব বাধা ভাসাইয়া দিত। রজত কাজীর ছবি আঁকিতেছে, সহসা সে ঘূর্ণী-হাওয়ার মত কোথা হইতে আসিয়া কাজী-সাহেবের চেয়ার টানিয়া রজতের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া চলিয়া গেল; মাধবীকে ছবি আঁকা শিখাইতেছে, জান্‌লা বা দরজার আড়াল দিয়া তাহার দুষ্টুমিভরা চাউনি সহসা জ্বলিয়া উঠিল, কখনও বা ঘরে ঢুকিয়া মাধবীর ঘাড়ে ঝুঁকিয়া ছবি সম্বন্ধে অফুরন্ত মন্তব্য অনর্গল বকিয়া কোন কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল।

লাইব্রেরিতে রজত ছবি দেখিতেছে, সেও একখানি ছবির বই টানিয়া লইয়া কোন সূত্র ধরিয়া কয়েকমিনিট গল্প করিয়া চলিয়া গেল। তাহার সহিত যে কিরূপে মেশা যায় তাহা রজতের সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সহিত বেড়াইতে যাইবার সুবিধা বা একা থাকিবার সুযোগ সে দিত না, দিতে কেমন ভয় করিত।

এখানে আসিয়া রজত খুব ভোরে উঠিত। তাহার ঘরের সম্মুখেই দিগন্তভরা প্রান্তর, তাহার একদিকে পাহাড়, আর-একদিকে শালবন; এই উন্মুক্ত পার্ব্বত্যদেশে শিশির-ঝলমল উষার অরুণোদয়ের শোভা তাহাকে প্রথম দিনেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

সেদিন ভোরে উঠিয়া লালরংএর আলোয়ানটা গায়ে দিয়া সাম্‌নের মাঠে সে বেড়াইতেছিল, তখন সূর্য্য উঠে নাই, কয়েকটি তারা পশ্চিম-দিকের পাহাড়ের মাথায় জ্বলিতেছে, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার স্নিগ্ধ আবরণের মত চারিদিক ছড়াইয়া। চারিদিক স্তব্ধ. একটা কিসের শব্দে পিছনে মুখ ফিরাইয়া রজত দেখিল, দোতালার ঘরে জান্‌লা খুলিয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই আলোক ছায়ায় তাহাকে মূর্ত্তিমতী উষার মত দেখাইতেছিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া রজত আবার পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই উষার আলোয় স্তব্ধ স্নিগ্ধ উদার প্রান্তরের মধ্যে রজতের দীর্ঘ রঙীন দেহ, তাহার বিপর্য্যস্ত কালো কেশ, দীপ্ত চাউনি মাধবীর সদ্যজাগরণফুল্ল অন্তরে কি নেশার অরুণিমা ধরাইয়া দিল; তাহার বিজন যৌবন-পথ এই প্রথম পুরুষের পায়ের স্পর্শে যেন উষার আকাশের মত কাঁপিতেছে; ওই প্রান্তরের মত তাহার জীবন. রিক্ত, উদাস, স্তব্ধ, শুভ্রকুয়াসায় ভরা পড়িয়া রহিয়াছে—প্রেমারুণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঙা-আলোময় পুষ্পেভরা গীতমুখর হইয়া উঠিবে। চকিতপদে সে ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পূরবীসুরের মত কথাগুলি রজতের কানে বাজিয়া উঠিল, আপনি এত সকালে উঠেছেন যে ?

মাধবীকে তাহার পাশে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া রজত বলিল, ভারি ভাল লাগে ভোরবেলাটা।

মাধবীর সমস্ত দেহ বেলফুলের মত সাদা শালে জড়ানো, সদ্য-জাগরণফুল্ল মুখখানি বিকচপদ্মের মত অকারণ আনন্দে রাঙা, বিপর্য্যস্ত মুক্ত বেণী সাদা শালের উপর দুলিতেছে, কয়েকটি অলক কপোলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; দূর হইতে যাহাকে মূর্ত্তিমতী ঊষার মত বোধ হইতেছিল, নিকটে সে নবরূপে প্রকাশিত হইল।

মাধবী দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, ভারি সুন্দর ভোরবেলাটা।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল, হাঁ, ভারি সুন্দর।

মাধবী কোন অজানা আনন্দের আবেগে বলিল, চলুন না, ওদিকে একটু বেড়িয়ে আসি।

চলুন, বলিয়া রজত ধীরে তাহার পাশে পাশে চলিল। চারিদিক শান্ত, স্নিগ্ধ। এ পবিত্র স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা বলিতে কেহই পারিল না, দুইজনেই নীরবে চলিল। প্রান্তরের মধ্যে তিনখানি খুব বড় কালো পাথরের নিকট আসিয়া দুইজনে থামিল ; পাথরগুলি শিশিরে ভিজিয়া গিয়াছে, মনে হয় তাহাদের বুক হইতে জল ঝরিতেছে ; মাধবী একটা ছোট পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল, রজত তাহার পাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, দূরে পাহাড়ের সারির পাশ দিয়া সূর্য্য উঠিতেছে। পূজার মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে পূজারী যেমন প্রতিমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়ায়, তেম্নি দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে চক্রবাল রাঙা করিয়া সূর্য্য উঠিতে লাগিল, ঘাসে ঘাসে পাথরে পাথরে শিশির-বিন্দু ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, পাহাড়ে পাহাড়ে শালবনের অন্ধকারে হাওয়া জাগিয়া মাতামাতি শুরু করিল। সূর্য্য যখন সম্পূর্ণ উঠিয়া দিনের যাত্রা শুরু করিল, মাধবী

একবার দীপ্তনেত্রে রজতের দিকে চাহিল, রজত দেখিল, তাহার স্থির শুভ্র নয়ন আজ কি স্বপ্নের রংএ রাঙিয়া উঠিয়াছে।

পাথর হইতে নামিয়া একটু অস্বাভাবিক স্বরেই সে বলিল, আচ্ছা, ঐ শালবনটা কতদূর ?

—মাইল তিনেক হবে বোধ হয়।

—আচ্ছা, ওখানে গেলে চায়ের আগে ফিরে আসা যায় না ?

—তা যায়, কিন্তু আপনার জুতোটা যে রকম শিশিরে ভিজে গেছে।

—ও, চলুন না, ওই শালবনটায় যেতে এত ইচ্ছা করে।

—চলুন ; কিন্তু আস্‌বার সময় রোদ লাগ্‌বে।

—লাগুক, কিছু হবে না।

দুইজনে আবার নীরবে চলিল। মাঝে মাঝে দু'চারিটি অতি তুচ্ছ সামান্য কথাবার্ত্তা ; কিন্তু এ নীরবতা যে কি ভাষাভরা তাহা কে বলিবে।

অবশ্য শালবন পর্য্যন্ত যাওয়া হইল না, কিছুদূরে এক রক্তপদ্মভরা দীঘি ঘুরিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিল। মাধবীর খুব ইচ্ছা হইয়াছিল কয়েকটি পদ্ম লইয়া আসে, কয়েকটি পদ্ম তটের অতি নিকটেই ফুটিয়াছিল ; কিন্তু রজতকে তুলিয়া আনিতে বলা দূরে থাকুক, সে পদ্মগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিতে পারিল না, পাছে রজত তাহাকে তুলিয়া দেয়। দুইজনে যখন বাড়ি ফিরিল, তখন ঘাসে ঘাসে শিশির শুকাইয়া গিয়াছে, পাথরগুলি তাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদের চোখে আকাশের আলো তখনও পদ্মরাগে রঙীন।

সেদিন ছবি আঁকার সময় মাধবী বার বার চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, আঁকা সম্বন্ধে তাহার অনেক প্রশ্ন করিবার ছিল, সমস্ত সকাল সেগুলি ভাবিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু রজতের সম্মুখে বসিয়া সব কথা গুলাইয়া গেল, প্রশ্নগুলি ভুলিয়া গেল, মুখের কথাও

আটকাইতে লাগিল। আর রজতের কণ্ঠও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বিশেষতঃ যখন রমলা পাশের ঘরে কাজী-সাহেবের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাসিয়া উঠিতেছিল। সে হাসির সুরে রজতের তুলির অতর্কিত আঘাত খাইয়া মাধবীর হাতের সোনার চুড়ি দুইবার সুমধুর সুরে বাজিয়া উঠিল। সে দিন শিক্ষকতায় বহুক্ষণ কাটিল বটে, কিন্তু ছবি আঁকা বিশেষ কিছুই অগ্রসর হইল না।

পূর্ণিমার রাত্রি। নীলাকাশের তট ছাপাইয়া জ্যোৎস্না জুঁইফুলের অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই চন্দ্রালোক-উদ্বেলিত আকুল রাত্রির দিকে চাহিয়া রজত ঘরে থাকিতে পারিল না, পদ্মদীঘি তাহাকে যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে টানিতে লাগিল। ধীরে সে বাঁশী লইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সম্মুখের প্রান্তর পার হইয়া দীঘির দিকে চলিল।

দীঘির তীরে গিয়া রজত চুপ করিয়া বসিল। রক্তের মত রাঙ্গা পদ্মগুলি লাল মণির মত জ্বলিতেছে, তাহার চারিদিকে জল গলিত হীরক-স্রোতের মত টলমল করিতেছে, বাতাসে ফুলের ঝোপগুলি দুলিয়া উঠিতেছে, শালবনে বাতাস আনন্দ-বাঁশী বাজাইতেছে, পাহাড়গুলি স্বপ্ন-মায়ার মত দাঁড়াইয়া। ধীরে সে বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোৎস্না-আকুল রাত্রে বাঁশীর সুর কোন্ জন্মজন্মান্তরের অনন্ত প্রেম-বেদনার মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ; কত লক্ষ যৌবনের কত লক্ষ আশা, কে তাহাকে ভাষা দিবে !

বাঁশী যখন থামিল, প্রকৃতির স্তব্ধতা অতি অপূর্ব্ব বোধ হইল। সহসা সেই স্তব্ধতার বুক হইতে উৎসের মত কাহার হাসি ও করতালির ধ্বনি

উৎসারিত হইয়া উঠিল, যেন একটা বড় কালো পাথরকে ভাঙিয়া-চূরিয়া কে চারিদিকে টুক্‌রো টুক্‌রো হীরা-মণি-মাণিক্য ছড়াইয়া দিল। অতি আশ্চর্য্য হইয়া রজত চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, এখানে কে হাততালি দিল? ক্ষণিকের মধ্যে যে তরুণীমূর্ত্তি জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, নিমিষের মধ্যে তাহাকে সে চিনিল—সে রমলা। আর একটু দূরে চাহিয়া দেখিল, কাজী-সাহেবের শান্তমূর্ত্তি; এত নিকটে তাহারা, অথচ সে লক্ষ্যই করে নাই।

পূর্ণিমা-নিশীথে বিনিদ্র কুহুর মত রমলা বলিয়া উঠিল, ও, কি সুন্দর রাত, আর একটু বাজান না।

জ্যোৎস্নাধারায় ঝলমল নীল সিল্কের শাড়ী মণ্ডিতা রমলার দিকে রজত নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

আপনারা সকালে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, আমরা রাতে এলুম; ভাগ্যিস্ এসেছিলুম, তাই বাঁশী শুন্‌তে পেলুম। বা বাঁশী থামালেন যে—বলিয়া রমলা একটা পাথরে বসিয়া পড়িল।

রজত বলিল, অনেকক্ষণ বাজিয়েছি তার চেয়ে আপনি একটা গান গান।

—আমার গান শোনেন নি, আমি মোটেই ভালো গাইতে পারি না, কিন্তু এম্নি রাতে গান গাইতে আপনিই ইচ্ছে করে।

—বিনয় করাটা গায়িকাদের দস্তুর, অনেকক্ষণ অনুরোধ না করলে—

—না, না, সত্যি আমি ভালো গাইতে পারি না।

এ কয়দিন ধরিয়া দুই জনের মনে যে রুদ্ধভাবের স্রোত জমিতেছিল, তাহা চন্দ্রালোকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কাজী-সাহেব যে দূরে বসিয়া আছেন তাহা তাহাদের লক্ষ্যই রহিল না।

গান গাহিতে জানে না বলিল বটে কিন্তু অতি মৃদুকণ্ঠে রমলা গান ধরিল; একটি অতি পুরাতন হিন্দি গান, সে গান কে রচনা করিয়াছিল

তাহা কেহ জানে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী কত গায়কগায়িকার অন্তর-ব্যথায় কত জ্যোৎস্না রাত্রির স্পর্শে মধুর করুণ।

গান শেষ হইলে রজত বলিল, আপনাদের কলেজে হিন্দি গান শেখায়? বেঠোভেন বলুন আর বাখ্ই বলুন, এই হিন্দি গান কিন্তু কানে সবচেয়ে ভালো লাগে।

—এ গানটা কাজী-সাহেবের কাছে শিখেছি। কাজীকে দিয়ে একটা গান গাওয়ালে হয়।

দুইজনে ফিরিয়া দেখিল, কাজী-সাহেব কোথাও নাই, তিনি এতক্ষণ ধ্যানরতের মত পাথরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন; এই আলো, ফুল, বাঁশী, গানে তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, যৌবনের গীতমুখর সুন্দরী খচিত প্রেমলীলাময় রাত্রিগুলি উপন্যাসরাজ্যের নায়িকাদের মত তাঁহার মনে পড়িতেছিল, নিশি-পাওয়া মানুষের মত তিনি সম্মুখের পথ দিয়া কোথায় যাইতেছেন।

রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কাজী-সাহেব ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

যান না, ওপথ দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই বাড়ি যাবার বড় রাস্তা। কি সুন্দর পদ্মগুলো!—বলিয়া রমলা জলের নিকট গিয়া কয়েকটি পদ্ম ছিঁড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। রজতও ধীরে উঠিয়া জলের ধারে তাহার কাছে গিয়া বসিল। এ কয়দিন দুইজনের মনে যে কথাগুলি জমিতেছিল, সেগুলি মুক্তধারার মত অন্তর হইতে বাহির হইতে চাহিল।

রমলা পদ্মগুলি দোলাইতে দোলাইতে বলিল, দেখুন, বইয়ে কত পদ্মের কথা পড়েছি, পদ্ম এঁকেছিও, কিন্তু সত্যি পদ্ম ছেঁড়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম। কল্‌কাতায় থাক্‌লে ফুলের নাম মুখস্থ করেই তৃপ্তি। আপনার বাড়িও ত কল্‌কাতায়?

—হাঁ, সেইখানেই জন্ম।

—আচ্ছা, আপনার বাবা আছেন ?

—না।

—মা ?

—না।

—ভাই বোন্ ?

—একটি ছোট ভাই ছিল মারা গেছে, বোনও নেই।

—তবে আপনি একা, আমার মতনই কেউ নেই আপনার।

—কেউ না থাকারই মধ্যে।

ও!—বলিয়া রমলা সহসা থামিয়া পদ্মগুলির উপর জলের ছিটা দিতে লাগিল। জলবিন্দুগুলি মুক্তার মালার মত ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহার মনে যে-কথাগুলি কুঁড়ির মত জাগিতেছিল, রাঙাঠোঁটের বৃন্তে তাহা বিকচ হইল না। বস্তুতঃ বিধাতা নারীকে ভাষা দিয়াছেন, মনের কথা বলিবার জন্য নহে, প্রিয় মিষ্টি কথা বলিয়া পুরুষের মনে আনন্দ সান্ত্বনা দিবার জন্য। অবশ্য প্রতি নারী যদি তাহার মনের কথা সুস্পষ্ট-ভাবে বলে তবে জীবনের দুঃখের বোঝা বাড়ে কি কমে তাহা বলা শক্ত। সে যাহাই হোক, রমলা তাহার মনের কথা বলিতে পারিল না। নানা খুঁটিনাটি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল।

মধুর হাসিয়া রমলা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি কতদিন থেকে ছবি আঁক্‌ছেন ?

—মনে ত পড়্‌ছে না কতদিন থেকে। এ বিষয়ে কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌বেন জান্‌লে তারিখটা, মিনিট, সেকেণ্ডটা পর্য্যন্ত লিখে রাখ্‌তুম। বোধ হয় ন'বছর বয়সের সময়, আমার এক মামা আমার জন্মদিনে এক আঁক্‌বার বাক্‌স দেন, সেইদিন থেকেই—

—আমার কিন্তু ছবি আঁক্‌তে মোটেই ভালো লাগে না,

পারি না কি না। আচ্ছা ওই পাহাড়টায় বেড়াতে গেছেন কোনদিন ?

—না, চলুন না, একদিন পিক্‌নিক্ করা যাক্ ওখানে।

—আজকের পুডিংটা কি বিচ্ছিরি হয়েছিলো! নয়? যা পুড়ে গেলো!

—না, বেশ হয়েছিল ত, কিন্তু কালকেরটা চমৎকার হয়েছিল!

—কি চমৎকার রাত! না? কিন্তু বোধ হয় অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

—সুন্দর রাত, খুব বেশি রাত হয়নি, আচ্ছা চলুন, যেতে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে!

পদ্মগুলি নাচাইয়া কয়েকটি অলক মুখ হইতে সরাইয়া রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, মাঠ দিয়ে নয়, এদিকের রাস্তা দিয়ে যাবো, যে রাস্তায় এলুম সে রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে ভালো লাগে না।

দুইজনে নীরবে পাশাপাশি চলিল। পথের দুই পাশের গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো রাঙা-পথে-ছড়ানো অভ্রগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাস মাতিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেই প্রায় নীরবেই চলিল, মাঝে মাঝে দু'চারিটি ছোট ছোট কথা। সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত, এ স্তব্ধতার অনেক প্রভেদ। এ স্তব্ধতা যেন কি কল্লোলমুখর, অশ্রুতসঙ্গীত-ভরা, অসহনীয় সুখময়—সকল কথাগানের অবসান হইয়া শব্দের নীরব অতল পারাবারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জ্যোৎস্নাধারাধৌত তরুছায়া-স্নিগ্ধ মর্ম্মরমুখর রক্তিম মায়াপথ দিয়া তাহারা দুইজনে যেন কত কাল চলিয়া আসিয়াছে, যেন কতযুগ চলিয়া যাইতে পারে। কেহ কাহারও মুখে চাহিতে সাহস করিল না, হাতে হাতে ধরিতেও ইচ্ছা হইল না, অন্তর অন্তরে স্পর্শ করিয়াছে। রজতের কাছে এরূপ স্তব্ধতা নূতন নয়,

কিন্তু রমলা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে যেন পুষ্পভরা লতার মত নত হইয়া পড়িতেছিল।

বাড়ির সিঁড়িতে উঠিয়া জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া রমলা বলিল, অনেক রাত হয়েছে, যান শুয়ে পড়ুন্‌গে।

ফুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে সে সিঁড়ি দিয়া রঙ্গীন মেঘের মত তাহার ঘরে চলিয়া গেল। মাধবী তখন তাহার ঘরে আলো জ্বালাইয়া 'ভ্রষ্টলগ্ন' পড়িতেছিল—

"ফাগুন যামিনী প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে"।

হিন্দি গানটির সুর গুঞ্জরণ করিতে করিতে রমলা নিজের ঘরে ঢুকিল। এক কোণে আলো জ্বলিতেছে, এই ঘরটিকে এত অপূর্ব্ব কিন্তু এত ক্ষুদ্র তাহার কোনদিন বোধ হয় নাই। তাহার দেহের তট ভাঙ্গিয়া প্রাণ আনন্দের বন্যার মত এই জ্যোৎস্নালোকের সহিত মিশিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, এ ছোট ঘরে সে যেন থাকিতে পারিবে না। রমলা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, নিজের মুখ চোখ কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিল, কবরী খুলিয়া চুলগুলি টানিতে লাগিল, ব্লাউসটা খুলিয়া আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া বসিল। জ্যোৎস্না দ্বারে প্রতীক্ষমানা ছিল, আলো নিভাইতেই ঘরে বর্ষার ধারার মত আসিয়া প্রবেশ করিল। রমলা উঠিয়া ঘরের সব জান্‌লা একে একে খুলিতে লাগিল, বহুক্ষণ দিগন্তে তাকাইয়া রহিল। আপনাকে সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, দেহমনের এ অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ অজানা। বিশ্বের কোন্‌ রহস্যময় অজ্ঞাত স্রোত তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ভেল্‌ভেটিনের চটিজুতো খুলিয়া আবার বিছানায় আসিয়া বসিল। এ রাতে যে ঘুম হইবে তাহার কোন আশা নাই! কি অজানা আনন্দময় বেদনা! দেহের রক্ত কোন্‌ রুদ্র-তালে নৃত্য করিতেছে। রঙ্গীন

আলোয়ানটা আল্‌না হইতে পাড়িয়া মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া একটি পদ্মফুল শুঁকিতে লাগিল। এই বিকসিত পদ্মটি আপন গন্ধবর্ণের আনন্দময় অনুভূতিতে জ্যোৎস্নালোকে যেরূপ শিহরিতেছিল, তেমনি তাহার দেহ-মন শিহরিতেছে।

রজত নিজের ঘরে ঢোকেই নাই। তাহার ঘরের জান্‌লার ঠিক সাম্‌নে হাস্নাহানার বড় ঝাড়। এই ঝাড়ের পাশ দিয়া দেয়াল বাহিয়া লতার কুঞ্জ রমলার ঘরের জান্‌লা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; সেই হাস্নাহানার ঝাড়ের সম্মুখে আসিয়া সে দিগন্তের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন্ অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীর সন্ধানে তাহার শিল্পীপ্রাণ সাতরংএর আলো-ছায়ার রেখার পথ দিয়া তুলির টানে চলিয়াছে; বিশ্বকমলের সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে একবার দেখা দিবে না? সেই মানসসুন্দরী যদি এখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—এই রংএর ছায়া, এই আলোর মায়ায় নয়, রক্তমাংসে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী হইয়া সে কি আসিবে না? জ্যোৎস্নাসমুদ্র মথিত করিয়া জলস্থলআকাশের সব সৌন্দর্য্য ছানিয়া পৃথিবীর সব মাধুরী চুরি করিয়া মধুর মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইবে না? নদীর গতি দিয়া ফুলের গন্ধ দিয়া বসন্তের আনন্দ দিয়া তাহার তনুর সৃষ্টি, তারাভরা নীলাকাশ তাহারই নীলবাস, তাহারই স্বপ্ন-অঞ্চল বনে পর্ব্বতে জ্যোৎস্নায় লুটাইতেছে, তাহারই অঙ্গের হিল্লোল নানা ভঙ্গে লতায় বাঁকিয়া পাতায় হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহারই দেহের সৌরভ পুষ্পে পুষ্পে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই চরণের চাঞ্চল্যে পথে পথে বাতাসের নৃত্য, তাহার টলমল ললিত যৌবন নদী-সরোবরে ছলছল করিতেছে, পদ্মে পদ্মে তাহার আঁখির দৃষ্টি, এই স্তব্ধ রাত্রে নির্জ্জনগগনে কুন্দশুভ্র অনন্তযৌবনা একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে—সে কি রক্তধারার ছন্দে পুষ্পকোমলতনুতে মূর্ত্তিমতী হইবে না?

হাস্নাহানার ঝাড় সিন্ধুতরঙ্গের মত বাতাসে উদ্দাম হইয়া পড়িল,

একটি কোকিল ডাকিয়া উড়িয়া গেল, রজত ফিরিয়া দেখিল, ঝাড়ের পাশে তাহার সম্মুখে রমলা দাঁড়াইয়া।

দ্রাক্ষারসভরা পেয়ালার মত তাহার চোখদুইটির দিকে চাহিল, নবসৃষ্টির স্বপ্নরহস্যময় মুখের দিকে চাহিল, রূপকথার রাজকন্যার মত তনুবল্লরীর দিকে চাহিল। এমনি উন্মুক্ত আকাশের তলে জ্যোৎস্নাশুভ্র শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে পৃথিবীর আদিম মানুষ নারীকে যেরূপে চাহিয়াছিল তেমনি চাহিয়া রজত একটু অগ্রসর হইল।

কিন্তু সে অসভ্যযুগের পর কত শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, কত সমাজ-গঠন, কত বিবাহপদ্ধতি, কত ধর্ম্মব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান মানুষ আপনগড়া নিয়ম-শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে কোন্ স্বপ্ন-দেশের দিকে চলিয়াছে। যে সিংহ্-সর্পের দোসর ছিল, সে আজ শিল্পী। স্থির হইয়া রজত দাঁড়াইল, চিররহস্যময় তরুণীর কালো চোখ তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

হাস্নাহানার গন্ধে বাতাস সুরার মত সৌরভময় হইয়া উঠিল, ইউ-ক্যালিপ্‌টসের মসৃণ পাতা আলোয় ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল, লাল পথ গলিত স্বর্ণধারার মত জ্বলিয়া উঠিল, রং-বেরংএর ক্রোটনের সারিতে বর্ণের হোলিখেলা শুরু হইল, শালের বনে দুরন্ত বাতাসের মাতামাতি পড়িয়া গেল, উদার প্রান্তর ভরিয়া জ্যোৎস্না থম্‌থম্ করিতে লাগিল, গন্ধে বর্ণে গীতে আলোক-সম্পাতে দুই তরুণ-তরুণীর চারিদিকে মায়ালোক সৃষ্ট হইল, দুজনেই স্বপ্নমুগ্ধ দাঁড়াইয়া।

সহসা গোলাপকুঞ্জ হইতে একটি পাখী ডাকিয়া উড়িয়া গেল, একটি তারের ঝঙ্কার শোনা গেল। বহুদিন পরে কাজী-সাহেব তাঁহার ধূলাভর এস্রাজ লইয়া বাজাইতে বসিয়াছেন। সেই সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের ধ্বনি উপরের ঘরে উঠিল—"ভ্রষ্টলগ্ন" পাঠ শেষ করিয়া মাধবী জানলার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একবার সে নিমেষের জন্য

হাস্নাহানার ঝাড়ের দিকে চাহিল, তারপর বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ব্যথায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, সঞ্চারিণী লতার মত রমলা চলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত, কিন্তু সে নিমেষ অনন্তক্ষণ।

মাধবীর অস্ফুট আর্ত্তনাদের সঙ্গে কাজী-সাহেবের এস্রাজ বাজিতে লাগিল, রজতের রক্তধারার ছন্দে গন্ধে-উদাস বাতাস বহিতে লাগিল, রমলার এই অজানা হর্ষশঙ্কা-ঝঙ্কৃত অন্তরবীণায় জ্যোৎস্নার ধারা অশ্রুত-সঙ্গীত বাজাইতে লাগিল। আর ঘরের অন্ধকারে বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে রজত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাদা মার্ব্বেলের টেবিলের উপর একটি রক্তপদ্ম! চন্দ্রের চাহনিতে পদ্মের পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়, পদ্ম গন্ধে বর্ণে বিকসিত হইয়া উঠে, সেই সৃষ্টির বিকাশের আনন্দ সে তাহার দেহে মনে অনুভব করিতে লাগিল।

১১

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে নিশিজাগরণক্লান্তনয়ন তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু রমলা একবার রজতের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, এ মুখ তাহার যেন নূতন দেখা। সকলেরই চায়ের কাপের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সবাই চুপচাপ দেখিয়া যোগেশ-বাবু কথা শুরু করিলেন।

রজতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজীর পোর্ট্রেট শেষ হয়ে গেছে?

—আজ আধ ঘণ্টা বস্‌লেই হয়ে যাবে

—তার পর, মাধু-মায়ের ?

—না, বাবা আমার নয়, বলিয়া মাধবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। করুণ-কণ্ঠের সহিত এরূপ বিদ্রূপের দীপ্তসুর জড়ানো ছিল যে, যোগেশযবাবু তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ধীরে বলিলেন, তা হলে রমলা-মার ?

রমলা কিছু উত্তর দিবার শক্তি পাইল না, শুধু ধীরে অসম্মতির ঘাড় নাড়িল। কাজী-সাহেব একটু মুচ্‌কিয়া হাসিলেন। রজতের গণ্ড তরুণীর মত রাঙা হইয়া উঠিল। সে ধীরে বলিল, আমি একদিন বিশ্রাম নিয়ে আপনার ছবিই আঁক্‌তে আরম্ভ কর্‌ব।

যোগেশ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, আচ্ছা।

আবার সব চুপচাপ।

তৃতীয় কাপ চা শেষ করিয়া মাধবী বলিল, বাবা আমি আর ছবি আঁক্‌ব না।

—কেন মা ?

—ভাল লাগে না।

—বেশ, ভাল না লাগে শিখো না।

কাজী-সাহেব দাড়িতে আঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে আবার মৃদু হাসিলেন, সে হাসি তাঁহার দাড়ির তলায় চাপাই পড়িল। সেদিন চা খাওয়া খুব শীঘ্র শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গেল।

গেটের কাছে যে জামগাছ-তলায় রজত প্রথম মাধবীকে দেখিয়াছিল, সেই স্থানটি মাধবীর বসিবার অতি প্রিয় স্থান ছিল। কত উদাস দ্বিপ্রহরে কত রঙ্গীন সন্ধ্যায় সে ওই জায়গাটায় একখানি বই হাতে করিয়া বসিয়া সুদূরে-হারা লালপথের দিকে চাহিয়া থাকিত। সেদিন সকালে সে একখানি টুর্গেনিভের নভেল লইয়া গাছের ছায়ায় এক সাদা বেতের চেয়ারে গিয়া বসিল। সম্মুখে ঢেউ-খেলানো মাঠে আলো প্রখর, লাল রাস্তার

দুইধারে সবুজ গাছের সারি বাতাসে করুণ স্বরে দুলিতেছে; দূরে ধূসর পাহাড়, একটি গোরুর গলার ঘণ্টার ক্লান্ত করুণ ধ্বনি কানে আসিতেছে, চারিদিকে পতঙ্গদলের গুঞ্জরণ, রুক্ষকঙ্করময় ভূমিতে মাঝে মাঝে ঘাসের সবুজ প্রলেপ—চারিদিকে শব্দে বর্ণে প্রভাত উদাস হইয়া উঠিয়াছে। গত প্রভাতে কি চাঞ্চল্য তাহাকে পীড়িত করিয়াছিল, আজ মাধবী তাহার স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা স্থির গম্ভীর। ধীরে সে বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল।

ভ্যক্—ভ্যক্—ফট্—ফট্—ফটাস্

এক প্রচণ্ডশব্দে মাধবীর দিবাস্বপ্ন টুটিয়া গেল। দেখিল ঠিক তাহাদের গেট হইতে একটু দূরে একটি মোটরকারের পিছনের টায়ার ফাটিয়া গেল। পায়ে শিকারীর গুলি খাইয়া বাঘ যেমন গর্জ্জিয়া ওঠে, তেমনি কয়েকবার গর্জ্জন করিয়া মোটরটা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত একটি যুবক একা গাড়ি চালাইয়া আসিতেছিল, সে গাড়ি হইতে নামিল, এবার গেটের দিকে অগ্রসর হইল। গেট পার হইয়া তাহারই দিকে আসিতে লাগিল।

মাধবী ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। যতীন মাধবীর সম্মুখে আসিয়া একটু হতভম্ব হইয়া গেল, সে গুডমর্ণিং করিবে, না নমস্কার করিবে, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খাকী-রংএর হ্যাট্‌টা একটু তুলিয়া মাথা একটু নত করিয়া বলিল, Excuse me, এটা কি যোগেশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি?

তাহার টুইড্ স্যুটের দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল, হাঁ।

—রজত রায় কি আছেন?

—আছেন, আসুন।

—ও থ্যাঙ্ক্‌স্।

ধীরে যতীন মাধবীর পিছন পিছন চলিল। সে এই সৌন্দর্য্যময়ীর সঙ্গে একটু মুস্কিলে পড়িল। নারীর জগৎ তাহার প্রায় অজানা; নারী

সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করা সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে, নারীদের কর্ত্তব্য বা অধিকার সম্বন্ধে তাহার কোন থিওরি বা মত নাই, আর নারীদের বুঝিবার দুরূহ চেষ্টা সে কোনদিন করে নাই। এ তরুণীর সহিত অকারণ আলাপ করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এরূপ চুপচাপ যাইতেও অসোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়া বাড়িখানির গঠনপ্রণালী দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা দোতলার জান্‌লায় আর-একটি তরুণীর হাসিভরা মুখ দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল।

রমলা আজ সকালে রান্নাঘরে যায় নাই, সে আপন ঘরে বসিয়া এক বন্ধুকে চিঠি লিখিবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত ছিল। চিঠিখানি সচিত্র,—কাজী-সাহেব, মাধবী, এমন কি মনিয়ারও ছবি ও কথা বাদ যায় নাই; সে ইংরেজীভাষায় লিখিতেছিল বটে কিন্তু বাংলা অক্ষরে। তাহার কতকগুলি কথা পড়িলেই চিঠির ভাবটা বোঝা যাইবে—গ্লোরিয়াস্ নাইট, সিম্‌প্লি রিপিং, ডে ড্রিমিং, নাইস্, কাজী, ইণ্টারেষ্টিং ইত্যাদি। চিঠিখানি লিখিয়া তাহার উপর হিজিবিজি কাটিতে শুরু করিল। হিজিবিজির রেখাগুলি মিলিয়া অনেকটা রজতের মুখের মত হইয়া উঠিল দেখিয়া সে কাগজখানিকে শতছিন্ন করিয়া জান্‌লা দিয়া লতাকুঞ্জের উপর ফেলিয়া দিতেছিল, আর সচিত্র ছিন্নপত্রের লেখাগুলির ভাষা ভাবিয়া আপন খুশিতে হাসিতেছিল। যতীন তাহার ঐ হাসি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

যতীনের মধ্যের ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি এতক্ষণ বাড়িখানা দেখিতেছিল, কিন্তু তরুণীর হস্ত ও বক্ষের ললিত গতি-ভঙ্গীতে মধুর হাস্যে তাহার অন্তরের প্রেম-তৃষিত মানুষটি জাগিয়া উঠিল। বাতায়নবর্ত্তিনী যখন অদৃশ্য হইল, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্বন্ধে সে সজাগ হইয়া সচকিত হইয়া উঠিল।

রজত ঘরে বহুক্ষণ বহু বিষয়ে মন দিবার চেষ্টা করিয়া অকারণেই বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মাধবীকে ধীরে অচল গাম্ভীর্য্যে আসিতে দেখিয়া সরিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিল যতীন পিছনে আসিতেছে। যতীন এত আনমনা হইয়া আসিতেছিল যে, রজতকে দেখিতেই পায় নাই। মাধবী যখন রজতের ঘরের দুয়ার দিয়া চলিয়া গেল, তখন, রজতের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।

হ্যালো রজট্!

—আরে, এসো, এসো। তার পর?

—তার পর আর কি? আস্‌ব বলে আস্‌ছি না দেখে নিশ্চয় গালা-গাল দিচ্ছিলে, না হলে টায়ারটা ঠিক তোমার বাড়ির সাম্‌নে এসেই কাট্‌বে কেন?

রজত যতীন্‌কে নিজের ঘরের দিকে লইয়া গেল। যতীনের দিকে এক গদিওয়ালা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া নিজে ক্রোটনের সারির সম্মুখে এক চেয়ারে বসিল। যতীন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া নিজে এক সিগারেট ধরাইয়া রজতের দিকে চেয়ার টানিয়া রজতকে আর-একটা দিয়া টুপিটা খুলিয়া মেঝেতে রাখিয়া বলিল, তারপর রজট্, তোমায় বেশ improved দেখাচ্ছে হে! গাল দু'টো গোলাপফুল হয়ে উঠেছে, বাড়িখানা বেশ suit করেছে বলো?

—হাঁ, ভারি সুন্দর জায়গাটা! তার পর তুমি?

—ও, আমি ডাকবাংলায় আছি। কাল রাত একটার সময় এসেছি, আজ সকালে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বেরুলাম, ঘোষের বাড়িটা এই দিকেই শুনলুম, মোটরটা কি ঠিক জায়গায় থাম্‌লো!

—গুপ্তধনের সন্ধানে বড্ড বেশি ছুটোছুটি করছ, রাতারাতি লাখপতি হবে?

—ভাই, তুমিই আমার চেয়ে সাঁচ্চা জহুরী, রত্নের সন্ধান আগে থেকেই পেয়েছিলে! একেবারে দুই হীরে, সাত রাজার ধন কোন্‌টি?

—ও, আস্‌তে না আস্‌তেই খোঁজ পেয়েছো! তুমি বোরিং না করেই খনির সন্ধান পাও বলো?

—না ভাই! এখানে একটু বোরিং কর্‌তে হচ্ছে, তা বুড়োর টাকা-কড়ির কিছু সন্ধান পেলে?

—কি করে' জানি বল, retired আই. সি. এস. কিছু বিশেষ নাও থাক্‌তে পারে, আর ছবি আঁক্‌তে এসেছি—

—বন্ধুর কাজটা একটু কর না। দেখ, তুমি একবার বলেছিলে, আমি যদি লাখপতি হই, আর তুমি যদি তোমার মানসীকে খুঁজে পাও, তবে আমি তোমার হিংসা কর্‌ব—কথাটায় কিছু সত্য আছে মনে হচ্ছে।

একটু অবাক্ হইয়া রজত বলিল, তাই না কি, ওটা ত আমি তর্কের মুখে নিছক্ কবিত্ব করেছিলুম।

যতীনের মনে আজ কি স্বপ্নের রং ধরিয়া গিয়াছে। সে বলিতে লাগিল, না হে, এই যে ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা ঠিক টাকার জন্য নয়, ভাব্‌তে বস্‌লে এমন কি সুখ! কি জান, কোন প্রাণের আগুন দেহে জল্‌ছে, ষ্টিম পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, তার টানে কোথায় যে চলেছি হাঁ, কি কথাটা বলেছিলে?

—The girl of my heart's desire.

—হাঁ, সেই right girlকে না পেলে, বুঝ্‌লে—

—তুমি কি বুঝ্‌তে আরম্ভ কর্‌ছ না কি?

এই দুই তরুণীর ক্ষণিক দর্শনে বাস্তবিক যতীনের মনে কি নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। এ যেন ইঞ্জিনবয়লারের ভিতর কয়লা পূরিয়া আগুন জ্বালাইয়া ষ্টিম তৈরি করিতে শুরু না করিয়া কে সোনার তার জুড়িয়া

সেতার বাজাইতে বসিল। একটা অস্ফুট 'হুঁ' করিয়া যতীন সিগারেট টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা ক্রোটন-গাছগুলির তলায় ফেলিয়া রজত বলিল, তুমি এই ছোটনাগপুরে সোনার খনি পেতে পার, কয়লার খনি খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে হীরের খনি পেতে পার। কিন্তু right girl, বুঝ্‌লে, ওটা কপাল, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। বিয়ে করাটা জানই ত জুয়া খেলার মত—

—না ভাই, এখনও জানিনি, বলিয়া যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কি উঠ্‌লে যে?

—ভাই, সময় ত বেশি নেই, স্মিথের সঙ্গে engagement আছে আধ ঘণ্টা বাদে। আবার মোটরটা ঠিক কর্‌তে হবে।

—তা হলেও যোগেশ-বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে' যাও।

—চলো।

ড্রয়িংরুমে ফার্সীপাঠ চলিতেছিল।

যতীন সশব্দে প্রবেশ করিতেই যোগেশ-বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রজত বলিল, ইনি আমার বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার।

যোগেশ-বাবু বলিলেন, বসুন আপনারা, আপনার মোটরটাই কি?

—হাঁ, আমার মোটরকার—আপনাদের এসে disturb কর্‌লুম না? বলিয়া যতীন বক্রদৃষ্টিতে কাজী-সাহেবের দিকে চাহিল। কাজীও এই বাঙ্গালি সাহেবটির দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাহিলেন না।

—না, না একটু কবিতা পাঠ হচ্ছিলো, শুন্‌বেন? বলিয়া যোগেশ-বাবু বাঁধানো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিলেন।

কাজী-সাহেব যোগেশ-বাবুর কথায় একটু বিরক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, এই লোকটিকে তিনি কবিতা শোনাইতে মোটেই রাজী নন।

যতীন বলিল, না, না, কবিতা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না, ও রজতই ঠিক বুঝ্‌বে, আমরা কাজের লোক—

সহসা তাহার মুখের কথা থামিয়া গেল, সম্মুখের দরজা দিয়া মাধবী প্রবেশ করিল, নিমেষের জন্য মাধবীর চোখের কালো তারার উপর তাহার চোখ গিয়া পড়িল। মূর্ত্তিমতী কবিতা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাধবী কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পিতার চেয়ারের নিকট আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, বাবা রজত-বাবুর বন্ধু কি চা খাবেন ?

কথাগুলি কিন্তু রজতের কানে পৌঁছিল। অতি সাধারণ কয়েকটি কথা, কিন্তু প্রতি কথা গানের সুরের মত তাহার কানে বাজিয়া উঠিল।

যোগেশ-বাবু যতীনের মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু যতীনের মুখে কোন কথাই যোগাইল না। সে বোধ হয় হতবাক্ই থাকিত। গুমোট আকাশে হঠাৎ ফুরফুরে বাতাসের মত রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, কাহারও দিকে যেন না চাহিয়া সে বলিল, একখানা মোটরকার আমাদের বাড়ির সাম্‌নে খালি পড়ে' রয়েছে, সেখানায় চড়ে' বেড়িয়ে এলে হয় না কাজী-সাহেব ?

যতীন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নবাগতার মুখের দিকে চাহিল, এ মুখ যেন তাহার পরিচিত। রমলাও তাহার চপলদৃষ্টি দিয়া যতীনকে বুঝাইয়া দিল, তাহাকে সে চিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিচয় এখন সবায়ের সম্মুখে জানাইতে সে মোটেই রাজী নয়। রমলার মনে পড়িল, এই ছেলেটিই ত তাহার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, কতদিন তাহার দাদা ইহাকে তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছে, সে পরিবেষণ করিয়াছে। তাহার দাদার বিলাত-যাত্রার পর যতীন রমলার কোন সন্ধান লয় নাই। কাজেই তাহাদের আর দেখা হয় নাই।

মৃদু হাসিয়া রমলা আবার বলিল, আচ্ছা, রাস্তায় কুড়ানো unclaimed property আইন অনুসারে কার হয় কাকাবাবু? যে প্রথম পায় তার ত?

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল, ওটা unclaimed নয়, ওর স্বত্বাধিকারী এই সশরীরে আমার বন্ধু--

--তাই না কি, আমি ভেবেছিলুম দিব্যি লাভ হল, বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যাবে—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল, তা ওটা আপনারই disposalএ রইলো। আপনি কোথায় বেড়াতে যেতে চান?

---আপাততঃ এ দুপুর রোদে কোথাও যেতে চাই না, বলিয়া রমলা পিয়ানোর পাশে একটা ইংরাজী ম্যাগাজিন টানিয়া লইয়া বসিল, এই ওয়া পাঁচ ফুট দীর্ঘ গাঁট্টাগোট্টা গোলগাল মুখ বাঙ্গালিসাহেবটির প্রতি আর কোনরূপ মনোযোগ দিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

যোগেশ-বাবু ধীরে যতীনকে বলিলেন, আপনি কোথায় আছেন?

-- ডাক-বাংলোয়।

—দুপুরে এইখানেই খেয়ে যাবেন, মোটরটা ত অচল হয়ে পড়ে' রয়েছে।

মাধবী রজতের দিকে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া বলিল, আপনার বন্ধু এখানে খেয়ে যাবেন না?

রজত যতীনের দিকে ফিরিয়া বলিল, যতীন, বেলা ত অনেক য়েছে আবার মোটর সারাবে—দুপুরে আমাদের এখানেই খেয়ে যাও।

রমলা দূর হইতে কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল, আপনি এখানে খেয়ে গেলে মিস ঘোষ ভারি খুশি হবেন।

এইরূপ বলার ভঙ্গীটা মাধবীর মোটেই পছন্দ হইল না, তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কাজী-সাহেব ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, আপনার কি কোন কাজ আছে ?

এরূপ অবস্থায় এরূপ ভাবে অনুরুদ্ধ হইলে কেহ খাইয়া যাইতে অসম্মত হইতে পারে কি না জানি না, যতীন অসম্মতি জানাইতে পারিল না। সে মাধবীর রাঙা মুখের দিকে নিমেষের জন্য তাকাইয়া বলিল, না, কাজ আর কি, kindly যদি একটা চাকর দেন মোটরটা ঠিক করে' পথ থেকে সরিয়ে রাখি।

মাধবী ধীরে বাহির হইয়া গেল, যতীন সম্মুখের দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন কুলি লইয়া মনিয়া হাজির হইতেই যতীন উঠিয়া চলিয়া গেল। যোগেশ-বাবু স্নান করিতে বিদায় লইলেন; কাজী-সাহেবও উঠিলেন।

সকলে চলিয়া গেল, জানলার পাশে রমলাকে একা দেখিয়া রজতের হৃদয় দুলিয়া উঠিল, তাহার কেমন ভয় হইল, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারিল না। রমলার মরালগ্রীবার উপর ক্রীম্‌রংএর ব্লাউজের প্রান্তরেখা কি সুন্দর, ঠিক তাহার উপর কালোচুলের খোঁপা সন্ধ্যাকাশে বিদ্যুৎভরা মেঘস্তূপের মত জমিয়াছে. সেই কবরীর রহস্যময় দিব্যশ্রীর প্রতি তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল।

রমলার মনে গতরাত্রের স্বপ্নের রেশ কয়েকখানি চিঠির পাতা ছিঁড়িয়া প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আবার রজতের নিঃসঙ্গ আবির্ভাবে কি মায়া যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া রহিল। ধীরে দুইজনে দুই বিভিন্ন দুয়ার দিয়া দুই দিকে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন বিকাল বেলায় লাইব্রেরিতে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা-সভা

বসিয়াছিল। আর্টের ধারার সহিত ধর্ম্মের ধারা মানব-ইতিহাসে কিরূপ মিশিয়া গিয়াছে ; ভারতে বৌদ্ধযুগে, ইয়োরোপে মধ্যযুগে, এইরূপ এক এক যুগে এক এক দেশে ধর্ম্মের শিখায় আর্টের আরতি-প্রদীপ কিরূপ জ্বলজ্বল হইয়া উঠিতেছে ; তারপর অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তিতে ভারতের আর্ট গ্রীক রোমক আর্ট অপেক্ষা কোন্ উচ্চস্তরে গিয়া পৌছিয়াছে—এই সব নানা কথা রজত তাহার স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছিল। অজন্তা, সূর্য্য মূর্ত্তি, তাজমহল, এক একটি কথা উচ্চারণ করিতেই তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। মাধবী পিতার ডানপাশে এক কুশন চেয়ারে বসিয়া চুপ করিয়া রজতের কথা শুনিতেছিল, শিল্পীর আনন্দোদ্ভাসিত কমনীয় মুখের উপর তাহার চোখ বার বার গিয়া পড়িতেছিল। যোগেশ-বাবু মাঝে মাঝে একটু মন্তব্য দিয়া আলোচনাকে অগ্রসর করিয়া দিতেছিলেন। রমলা কিছুক্ষণ সে ঘরে ছিল। ছবি সম্বন্ধে আলোচনা, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার সে বোঝে না, ভালবাসে না। কিছুক্ষণ শুনিয়া শ্রান্ত হইয়া একতলায় ড্রয়িংরুমে সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

পিয়ানো বাজান কিন্তু বেশিক্ষণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে যতীন আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই রমলা গান শেষ না করিয়াই পিয়ানো বন্ধ করিল। টুইড স্যুট বদ্‌লাইয়া মুর্শিদাবাদ তসরের স্যুট গায়ে উঠিয়াছে। স্মিত-হাস্যে রমলা যতীনকে অভ্যর্থনা করিল বটে, কিন্তু এই হৃষ্টপুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারটিকে পিয়ানো শোনাইবার ইচ্ছা তাহার মোটেই হইল না। বলিল, আপনার বন্ধু ওঘরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।

-না, না, আপনি কেন উঠ্‌ছেন—আপনার দাদা ভাল আছেন? অনেকদিন দেখা হয়নি।

ভালই, বলিয়া রমলা চুপ করিল। পুরাতন পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া আলাপ করা তাহার মোটেই ইচ্ছা নয়।

মৃদু হাসিয়া রমলা বলিল, এর মধ্যে কাজ হয়ে গেল? আপনার ত অনেক কাজ, এত শীগ্‌গির ছুটি?

—হাঁ, মোটরটা, নিয়ে এলুম, কোথায় বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন?

—মোটর থাকলে এখানে খুব বেড়াতে সুবিধা, আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

মনিয়া ঘরের কোণে ফুলদানিতে নূতন ফুল সাজাইয়া রাখিতেছিল, রমলা তাহাকে বলিল, এই, ওপরে গিয়ে খবর দিয়ে আয় ত।

মনিয়া বলিল, কাকে?

রমলা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল, দিদিমণিকে।

লাইব্রেরিতে আলোচনা-সভার সম্মুখে গিয়া মনিয়া তাহার নিজের বুদ্ধির অনেকখানি খরচ করিয়া বলিল, দিদিমণি, আজকের সকালের সাহেব এসেছেন, ছোট দিদিমণি আপনাকে বেড়াতে যাবার জন্য ডেকে পাঠালেন।

মাধবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, বল গে এখন সময় নেই।

মনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। বহুক্ষণ পরে সে ড্রয়িংরুমে গিয়া খবর দিল, সবাই এখন গল্পে ব্যস্ত, কেউ আসতে পারবে না।

বহুক্ষণ বসিয়াও রজত যখন নিচে আসিল না, তারপর উত্তর শুনিয়া রমলার কেমন রাগ হইল, সে ঝোঁকের মাথায় বলিল, চলুন, আমরাই বেড়িয়ে আসি।

অতি অনিচ্ছুক হইলেও কাজী-সাহেবকে টানিয়া লইয়া রমলা যতীনের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। কাজী-সাহেব পিছনে বসিলেন, রমলা যতীনের পাশে সামনে বসিল। এ যন্ত্র টানিলে কি হয়, ও যন্ত্র টিপিলে কি হয়, steering wheel কিরূপে ঘোরাইয়া মোটর কোনদিকে ঘোরাইতে হয় ইত্যাদি নানা প্রশ্নে হাস্যে পরিহাসে

সে যতীনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। মোটরের বেগ যতই বাড়িতে লাগিল কাজী-সাহেবের মুখ ততই গম্ভীর হইতে লাগিল আর রমলার দেহ মন ততই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মোটরের গতি কুড়ি হইতে ত্রিশ মাইল হইতে ষাট মাইল উঠিতে লাগিল, কাজী-সাহেব ঘন ঘন দাড়িতে হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, রমলার দেহ গতির আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

টার্নারের রংএর হোলিখেলা, হুইসলারের বর্ণের কুজ্ঝটিকা, ডুলাকের রংয়ের রূপ-কথালোকের মধ্যে যখন এক তরুণ ও এক বৃদ্ধ বর্ণরসিক ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের পাশে তরুণীটির মন বার বার উদাস হইয়া উঠিতেছিল, এক মোটরের ভক ভক শব্দ বার বার বিদ্রূপের মত বাজিতেছিল।

ঝিল পার হইয়া বহুদূর ঘুরিয়া যখন রমলা বাড়ি ফিরিল তখন রাত হইয়া গিয়াছে; গেটের নিকট রমলা ও কাজীকে নামাইয়া যতীন ডাকবাংলায় ফিরিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রে কত বিজন দীর্ঘ পথ প্রান্তর পার হইয়া তরুর ছায়ায় ছায়ায় হাওয়ার সহিত পাল্লা দিয়া সে মোটরকার হাঁকাইয়া গিয়াছে কিন্তু মোটর চালানোয় এমন মাধুরীর স্বাদ সে কখনও পায় নাই। এই জ্যোৎস্না-বিজড়িত সুখ-স্বপ্নকে সে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহিল না।

ডাকবাংলায় গিয়া যতীন ইজিচেয়ারটা বারান্দায় বাহির করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া কাটাইল। প্ল্যান আঁকিতে এষ্টিমেট কষিতে যন্ত্র ফিট্ করিতে মোটরে ঘুরিতে তাহার অনেক রাত জাগিয়া কাটিয়াছে কিন্তু অকারণে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রাত কাটানো তাহার জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম। হাস্নাহানার সৌরভভরা বাতাস বড় মিঠা লাগিল। বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি সে উদাসীন, আজ হৃদয়ের কোন্ নিভৃত পথ

মুক্ত হওয়াতে সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী তাহার সমস্ত হৃদয় জয় করিয়া জুড়িয়া বসিল। তাহার বিরুদ্ধে বাধা দিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার রহিল না। দুইখানি মুখ বার বার জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে কে তাহার প্রেমিক হৃদয় জাগাইয়াছে তাহা তর্ক করিয়া বিচার করিবার ইচ্ছা নাই। অপরিসীম সুখ, অজানা বেদনা—বিশ্বের যে-সৃষ্টি-শক্তি প্রজাপতির পাখা রঙীন করিয়া ফুলের বুকে মধু ঢালিয়া, পাখীর কণ্ঠে গান ভরিয়া, নারীর নয়নে মায়ার ফাঁদ পাতিয়া, নব নব জন্মের ধারা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই রূপ-মায়ার জালে আজ সে ধরা পড়িয়াছে। ইহা হইতে ত্রাণ কোথায়? ললিত গতি, চকিত চাহনি, দীপ্ত সৌন্দর্য্য, কথার সঙ্গীত, শাড়ীর খস্‌খস্, আঙ্গুর-আঙ্গুলের স্পর্শ, কেশের সৌরভ—এ মায়াজাল হইতে সে মুক্তি চায় না। ইঞ্জিনের ঝকঝক্ লোহার ঝন্‌ঝন্ কল-দেবীর সঙ্গীতই এত দিন তাহার কাছে মধুর লাগিয়াছে তরুণীর সামান্য কথায় এত মাধুর্য্য কোথায় লুকানো ছিল!

যতীন যখন মাধবী ও রমলার কথাগুলি ভাবিতেছিল রজতও তাহারই মত জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া বারান্দায় বসিয়া ছিল। তাহার কবি-বন্ধুর কথা মনে পড়িল, সে একবার বলিয়াছিল, 'যে বলে আমি তোমাকে আজীবন ভালবাস্‌ব, সে ভাবের ঘোরে মিথ্যা কথা বলে। চিরকাল ভাল বাসব, এমন প্রতিজ্ঞা কেউ করতে পারে না। মানসীর যে রূপ দেখে প্রেমের পদ্ম পাপ্‌ড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়, সে রূপ ম্লান হলে, অমৃতের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে পদ্ম শুকিয়ে ঝরে' পড়ে। ফুলকে চির অম্লান রাখবার দুঃসহ চেষ্টা করে বলে চারিদিকে দেখ ভালোবাসার ভণ্ডামি। আমি অবশ্য সত্যি প্রেমিকের কথা বল্‌ছি, সে বল্‌তে পারে না আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, কেননা সে প্রেমের হিসাব রেখে তুলনা দিয়ে কথা বল্‌তে জানে না। প্রেমের

পদ্মই আমাদের ভাগ্যে জোটে, চির অম্লান পারিজাতের সন্ধান কে পেয়েছে ?'

রঞ্জত ভাবিতেছিল, সত্যই প্রেম এমন ফাঁকি, এ চির-চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর প্রেম লইয়া সে কি করিবে ?

কাজী-সাহেব তখন তাঁহার ঘরে পড়িতেছিলেন—

সাকী বেয়ার্ বাদহ কে আমদ জমান্ ই-গুল্ ।
তা বশ্‌-কুনীম তৌবাহ দিগর্ দর্ মিয়ান্-ই-গুল্ ॥

সাকী, মদ নিয়ে এস ফুল-ফোটার সময় এল, আজ এই বসন্তে আমি সব বৈরাগ্যসাধন ত্যাগ করলুম ।'

১২

ইহার পর তিনদিন ঘটনার স্রোত এত রুদ্র তালে বহিয়া গেল যে, তিনদিনের শেষে কি রূপে এত ওলট-পালট হইয়া গেল তাহা কেহ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। চারিটি জীবনের সূতা লইয়া বুনিতে বুনিতে শিল্পী যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সূতার সহিত সূতা গেরো দিয়া অথবা ছিঁড়িয়া কোনরূপে শেষ করিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। যতীন জীবনের লীলায়িত ছন্দে চলিতে পারে না, সব সমস্যার সমাধান অতি শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে চায়, তাই ঘটনাগুলির বেগ বাড়িয়া গেল।

প্রভাতে চা না খাইয়াই যতীন মোটর হাঁকাইয়া যোগেশ-বাবুর বাড়িতে হাজির হইল। গেটের কাছে তাহার প্রিয় স্থানে মাধবী ঘুরিতেছিল। ক্রীমরংয়ের শাড়ীর উপর সদ্যস্নাত মুক্তকেশ প্রভাতের আলোয় ঝলমল করিতেছে, পামগাছের তলায় দীপ্ত আননে বনদেবীর মত দাঁড়াইয়া; সে মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ধীরে যতীন তাহার সম্মুখে মাথা নত করিল, কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না!

মাধবী বাগানের দিকে চলিয়া গেল, যতীন তাহার বন্ধুর ঘরের দিকে চলিল।

রজত কাজী-সাহেবের ছবিখানিতে রং দিতেছিল। যতীন ঘরে ঢুকিতেও কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া রং দিতে লাগিল। যতীন তাহার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিল, কি হে ভারি ব্যস্ত ?

কাঁচের এক চতুষ্কোণ বৃহৎ খণ্ডের উপর লাল রং ঘসিতে ঘসিতে রজত বলিল, হাঁ ভাই, ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ রজতের রং দেওয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া "তোমাকে আর disturb করব না" বলিয়া যতীন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় ঘুরিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমের সম্মুখে গিয়া পড়িল। ঘরে কাজী-সাহেব যোগেশ-বাবুকে জেবন্নেসার পদ্য পড়িয়া শোনাইতেছিলেন—

গর্‌চে মন্‌ লায়লি হস্তম্‌
দিল চ মজ্‌নু দর হওয়াস্‌।
সর্‌ ব-সহ রা মী-জনম্‌
লেকিন হায়া-ই জেঞ্জির পাস্‌।

অর্থাৎ, আজ আমি প্রেমিক লায়লির মত, মন বাতাসের মত উদ্দাম স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; (কিন্তু আমার শুধু মনেই স্বাধীনতা আছে, স্ত্রীজনসুলভ বাধাও বিস্তর) আমি মরুভূমিতে মাথা খুঁড়ে মরছি, সরমসম্ভ্রমের শৃঙ্খল আমার পায়।

ড্রয়িংরুম পার হইয়া যতীন পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসিল। অদূরে ইউক্যালিপ্‌টাসের গাছগুলির ফাঁক দিয়া মাধবীর শাড়ীটা একটুখানি দেখা যাইতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণদিকের বারান্দায় একেবারে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া যতীন বড় অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেল। মনিয়া

রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে এক সেলাম করিল। ঘরের ভিতর রমলা রান্নার শব্দের সহিত তাহার কণ্ঠ মিশাইয়া চারিদিক গীতমুখর করিয়া তুলিয়াছিল। সেই কলগানে যতীনের বুক দুলিয়া উঠিল, সে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রমলার জাপানী ফ্যাসানে বাঁধা খোঁপার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ডাকিল, দিদিমণি!

কি, বলিয়া প্যান্‌টা উনানের উপর হইতে তুলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া রমলা দেখিল, যতীন দ্বারে দাঁড়াইয়া!

কালো চোখে হাসির বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া রমলা বলিল, এই যে আসুন।

যতীনের রৌদ্রদগ্ধ শক্ত মুখ তরুণীর গণ্ডের মত রাঙা হইয়া উঠিল। রমলা একটি দেশী শাড়ী পরিয়াছিল, জুঁইফুলের মত সাদা কাপড়ের উপর লালপাড় রক্তের ধারার মত, দীর্ঘ আঁচল কোমরে জড়ানো, গেরুয়া রংএর ব্লাউজে উনানের আভা আসিয়া জ্বলিতেছে, স্বপ্নভরা মুখ, রহস্যভরা কালো চোখ—সেই তরুণী মূর্তির সম্মুখে যতীন সত্যই হতবাক হইয়া গেল।

সোনার চুড়ির ঝঙ্কার দিয়া রমলা বলিল, বন্ধুর দেখা পেলেন না বুঝি? কিছু খাবেন? একখানা কাট্‌লেট্ গরম গরম?

যতীন ধীরে বলিল, না, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রহস্যের সুরে রমলা বলিল, কথা? কি কথা?

যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছু বুঝিতে পারিল না, প্যান্‌টা টেবিলে রাখিয়া বলিল, আচ্ছা একটু দাঁড়ান, এই প্লেট্‌টা ধুয়ে নি, আলুগুলো কুটে নি, মাংসটা চড়িয়ে দি—

যতীন বিনীতস্বরে বলিল, একা হলে ভাল হয়।

ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া রমলা বলিল, বেশ, এই মনিয়া আমার

ঘরে টেবিলের উপর একখানা চিঠি আছে, এক্ষুণি ফেলে দিয়ে আয়। আর খান্‌সামা, তোমার ত আর কোন কাজ নেই, বাজার যাও ত, একসের ভাল চাল নিয়ে আস্‌বে পোলাওর জন্য, আজ রাতে হবে, যত শীগ্‌গির পার এসো—যাও—

মনিয়া ও খান্‌সামা চলিয়া গেলে, উনানে চাপানো ভাতের হাঁড়ি হইতে একহাতা ভাত তুলিয়া এক প্লেটে ফেলিয়া ভাতগুলি হাত দিয়া টিপিতে টিপিতে রমলা হাসিভরা স্বরে বলিল, তারপর, কি বল্‌ছিলেন ?

বল্‌ছিলুম,—বলিয়া যতীন থামিয়া গেল, তাহার চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

দুষ্টামিভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, কি ?

যতীনের মুখে কথা বাহির হইতে চাহিল না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া টেবিল হইতে একটা চামচ লইয়া প্লেটে টুং টুং শব্দ করিতে লাগিল।

রমলা যতীনের দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন না, কষ্ট হচ্ছে, টুপিটা খুলে ফেলুন, যা গরম রান্নাঘরে—কি, এক পেয়ালা চা তৈরি করে দেব ?

টুপিটা খুলিয়া টেবিলের উপর একটা চিনিভরা পিরিচের উপর রাখিয়া যতীন কোনরূপে বলিল, না, থ্যাঙ্কস্। দেখুন আপনাকে সে কথা ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন—

হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া রমলা বলিল, বল্‌তে না পারেন, লিখে আন্‌লেই পার্‌তেন—মনে আবার কর্‌ব কি ?

চামচ ছাড়িয়া ছুরি নাড়িতে নাড়িতে রমলার পায়ের সাটীনের চটি-জুতোর উপর চোখ রাখিয়া যতীন বলিল, দেখুন, আপনাকে প্রথম দিনেই দেখে মনে হয়েছে—

সে আবার থামিয়া গেল, ছুরি ছাড়িয়া প্যাণ্টের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। রমলা রহস্য-

কৌতুকভরা মুখে চাহিয়া টেবিলে ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গরম হচ্ছে, চলুন বাইরে।

রুমালটা হাত দিয়া পাকাইতে পাকাইতে যতীন মরিয়া হইয়া বলিল, দেখুন, কাল রজতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সে বল্লে, তুমি কি খনির সন্ধানে ফির্‌ছ, আমি যদি আমার জীবনের সত্যিকার সঙ্গিনীকে খুজে পাই—right girl.

হুঁ, বলিয়া রমলা অতি ক্ষীণ মধুর হাসিল। সে হাসি রমলাই হাসিতে পারে।

মরিয়া হইয়া যতীন বলিয়া যাইতে লাগিল, সেদিন বিকেলে আপনাকে পেয়ে মনে হয়েছে আমার জীবনের সঙ্গিনীকে খুঁজে পেয়েছি, তোমাকে আমি সত্যি খুবই—

রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। ভাতের জল ফুটিয়া হাঁড়ির গা বাহিয়া উনানের আগুনে পড়িল। সেই জলের ছিটার স্পর্শে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ কাঁপাইয়া যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমলা গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, দেখুন, আপনি—

থতমত খাইয়া যতীন বলিল, হাঁ—

রমলা গম্ভীর স্বরে বলিল, আপনি আমায় একদিন মাত্র দেখেছেন, কয়েক ঘণ্টা জানেন মাত্র।

অতি বিনীতকণ্ঠে যতীন বলিল, কিন্তু এক দিনেই আমার বোধ হচ্ছে —at first sight—

তীক্ষ্ণস্বরে রমলা বলিল, দু'দিন বাদে সে বোধ নাও হ'তে পারে।

অনুনয়ের সুরে যতীন বলিল, আমি সত্যি বল্‌ছি, আমার মনে হচ্ছে—

তিক্তকণ্ঠে রমলা বলিল, আমার মনে নাও হতে পারে।

প্রার্থনার সুরে যতীন বলিল, দেখুন, যদি কোন দোষ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

ব্যথিতকণ্ঠে রমলা বলিল, দোষ আর কি? তবে একদিনের আলাপেই—

যতীন ধীরে বলিল, তাই যথেষ্ট বোধ হয়েছিল!

সহজস্বরে রমলা বলিল, তা যথেষ্ট নয়, এক জীবনের জানা-শোনাও যথেষ্ট হয় না। আমি ভেবেছিলুম আপনি বুদ্ধিমান, কাজের লোক—

সে মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, কিন্তু দেখছি একটা ইডিয়ট্।

যতীন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, তাই যা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, ফেলে রাখতে পারি না।

রমলা হাসিমাখা সুরে বলিল, অতটা তাড়াতাড়ি ভাল নয়। দেখুন—আমার সঙ্গে এমন ফ্লার্ট করাটা আপনার উচিত হচ্ছে না।

ব্যথিত হইয়া যতীন রুমালে আর-একবার মুখ মুছিয়া ভীতকরুণ-নেত্রে চাহিয়া বলিল, আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।

রমলা এতক্ষণে যেন নিজের সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইল। সে আবার কৌতুকভরা চোখে চাহিয়া বলিল, বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই।

হ্যাট্‌টা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া বিনীতস্বরে যতীন বলিল, ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না।

অতি মিষ্টগলায় রমলা বলিল, না, না। আর দেখুন রাতে আপনার নেমন্তন্ন রইল, আপনার জন্যই খানসামাকে পাঠাতে হল চাল আনবার জন্যে—বিকেলে কিন্তু ঠিক আসবেন, শালবনটার কাছে যাওয়া যাবে।

টুপি তুলিয়া যতীন ধীরে ধীরে দাঁড়াইল।

রমলা একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, আপনাকে না জেনে ব্যথা দিলুম, ক্ষমা করবেন। আস্‌বেন ঠিক।

ধীরে নমস্কার করিয়া যতীন বাহির হইয়া গেল। তাহার চায়না-সিল্কের সুটটা যখন গাছের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল, রমলা টুলটা টানিয়া উনানের আগুনের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাংস চড়াইল না, আলুও কুটিল না। রান্নাঘর স্তব্ধ, শুধু জলের টগবগ শব্দ আর রান্নাঘরের মাথায় শালগাছগুলির মৃদু মর্ম্মরধ্বনি। রমলা আগুনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া মাঝে মাঝে পাশের ছাইগুলি চটি দিয়া গুঁড়াইতে লাগিল।

দুপুরে সহসা রমলার মনে হইল হয়ত এরূপভাবে নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নাই, রজতকে জানান দরকার। রজতের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দরজা বন্ধ, দুইবার মৃদু করাঘাত করিয়াও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাধবীকে খানিকক্ষণ জ্বালাতন করিয়া সে পিয়ানো বাজাইতে গেল।

সন্ধ্যার সময় রজত যখন দরজা খুলিয়া বাহির হইল তখনও পিয়ানোর টুং টাং শোনা যাইতেছে। ড্রয়িংরুমের কাছে আসিয়া দেখিল, পিয়ানোর সম্মুখে এক চেয়ারে যতীন বসিয়া। তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না, পিয়ানো বাজান থামিয়া গেল।

ধীরে রজত আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দরজা বন্ধ করিল। রজত কিন্তু ভুল ভাবিতেছিল। যতীন সেইমাত্রই আসিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিতেই রমলা পিয়ানো বন্ধ করিয়াছিল।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার দরজায় করাঘাত হইল। রমলা ও যতীনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

যতীন বলিতেছে, হ্যালো রজটু, এখনও দরজা বন্ধ করে কি করছ!

রমলা বলিল, সারাদিনই দরজা বন্ধ, চিচিং ফাঁক্ !

রজত ধীরে দরজা খুলিল।

রমলা বলিল, ছবি আঁক্‌ছিলেন এখন ?

হাঁ, বলিয়া একখানি সাদা কাগজে ঢাকা ছবি বিছানার আড়ালে রাখিয়া দিল। রমলা উৎসুক হইয়া বলিল, দেখ্‌তে পারি না ?

রজত ধীরে বলিল, শেষ হ'লে দেখ্‌বেন।

রমলা হাসিমাখা স্বরে বলিল, আপনার বন্ধুকে আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি, জানেন ?

তাহার চঞ্চল কালো চোখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে রজত বলিল, ও।

যতীন রজতের হাত ধরিয়া এক ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, সারাদিন ত ঘরে বন্ধ ছিলে, চলো না একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

রমলা কৌতুকভরা মুখে বলিল, জ্যোৎস্না এখনও ওঠেনি, না হলে সেই পদ্মদীঘিতে যাওয়া যেত।

রজত যেন একটু উদাস স্বরে বলিল, আপনারা বেড়িয়ে আসুন, আমার ভাল লাগ্‌ছে না।

রমলা একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, দেখুন—

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমায় বল্‌ছেন !

রমলা রজতের দিকে ফিরিয়া বলিল, না, দেখুন—

রজত যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া রমলার কালোচোখের দিকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নয়নে তাকাইয়া বলিল, আমাকে !

রমলা নম্রকণ্ঠে বলিল, হাঁ।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল, কি বল্‌ছিলেন ?

রহস্যমাখানো মুখে রমলা বলিল, হাঁ, ও কি মনে হল, ভুলে গেলুম।

যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া সে চুপ করিল। তিনজনেই চুপচাপ। একটু পরে রমলা বলিয়া উঠিল, রান্নাঘরে চল্লুম, দেখে আসি পোলাওটা কতদূর।

রমলা চলিয়া গেল। দুই বন্ধু বারান্দায় আসিয়া বসিল।

যতীন ধীরে বলিল, আরও কিছুদিন এখানে আছ তো?

রজত বলিল, ঠিক নেই, দু'একদিনের মধ্যেও চলে যেতে পারি।

যতীন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন হে?

রজত চুপ করিয়া রহিল। যতীন বলিল, আমার তো সেই দিনই চলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তোমার পাল্লায় পড়ে—কাল কিন্তু যেতেই হচ্ছে।

দুইজনে নীরবে চুরুট টানিতে লাগিল।

সহসা মাধবীকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া দুইজনেই চুরুট ফেলিয়া নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, যতীন তাহার চেয়ারটা একটু অগ্রসর করিয়া দিল; কিন্তু মাধবী তাহাদের নিকট না আসিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। দুইজনে একটু বিস্মিত হইয়া আবার চেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইল। একটু পরে মনিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আপনাকে সাহেব ডাক্‌ছেন উপরে।

রজত ফিরিয়া বলিল, আমাকে?

মনিয়া যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল, না, আপনাকে।

রজত বিস্মিত হইল না, ধীরে বলিল, আচ্ছা, যতীন যাও।

যতীন চলিয়া গেল। সম্মুখে শালবনের মাথার উপর দিয়া চন্দ্র উঠিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রজত বসিয়া রহিল।

রাত্রে খাবারের টেবিলে সবাই প্রায় চুপচাপ কাটাইল। রজত এত কম খাইল যে রমলাও আশ্চর্য্য হইল। যতীন শুধু মাঝে মাঝে রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, শিল্পীর আহারের সহিত ইঞ্জিনিয়ারের আহারের

তুলনা করিয়া টেবিল সরগরম রাখিয়াছিল। রমলার প্রসন্ন মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাহার চোখ পড়িতেছিল বটে কিন্তু মাধবীর স্থির দামিনীর মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার মুগ্ধ নয়ন বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। রজত শুধু একবার পোলাওএর প্লেট হইতে রমলার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দেখিল, তাহার মুখে চোখে আজ যেন আনন্দের বান ডাকিয়া আসিয়াছে। রজত ঠিক দেখিয়াছিল, কিন্তু ভুল বুঝিল। রমলার আজিকার আনন্দ শুধু যতীনকে খাওয়ানর আনন্দ নয়, নিজের হাতে রাঁধিয়া পরিবেষণ করিয়া যে কোন পুরুষকে খাওয়াইতে প্রতি নারীর বুকের যে সেবিকা মা পরম সুখ পান—এ সেই আনন্দ।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র যতীন প্রত্যেকটি রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া, খাবার ঘরেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া অতি ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

রজত ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল; ঘরে থাকিতে ভাল লাগিল না। বারান্দা ঘুরিতে ঘুরিতে ড্রয়িংরুমের সাম্নে আসিয়া পড়িল, বারান্দার ধারে সাজানো ফুলগাছের টবগুলির পাশে এক কোণে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

দেখিল, যতীনের মোটরকারটা রাজপথের গাছের সারির মধ্য দিয়া আলেয়ার আলোর মত দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া যাইতেছে। সহসা পূর্ব্বদিকে গাছের সারির দিকে চোখ গেল। দেখিল, একটি ছায়া-মূর্ত্তি অতি দ্রুতবেগে পামগাছগুলির আড়ালে আড়ালে উঠিয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিটি একটু নিকটে আসিলে, বুঝিল, নারীমূর্ত্তি; ম্লানজ্যোৎস্নার গাছের ছায়ার অন্ধকারে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না! শুধু শাড়ীর ঝলমলানি, সাপের ফণার মত উদ্যত বেণী, আর হাতে একখানি সাদা কাগজ।

ব্যথিত ক্ষুব্ধ স্বরে আপন মনে, O the flirt, coquette! বলিয়া

হাতের সিগারেটটা টবে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। ঈর্ষাদ্বন্দ্বময় চোখে কেহ ঠিক দেখে না, রজতও ভুল দেখিল।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। রমলা বহুক্ষণ নিজের ঘরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিল। চেয়ারে বসিয়া বিছানায় শুইয়া আয়নায় মুখ দেখিয়া জানালায় মুখ বাড়াইয়া এটা ওটা নাড়িয়া দু'একটা গজলের সুর গাহিয়া কি আনন্দে উল্লসিত হইয়া সে আপন ঘর হইতে বাহির হইল। পাশের ঘরে গিয়া মাধবীর সহিত গল্প করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া নিচে নামিয়া আসিল। ড্রয়িংরুম মহারহস্যময় অন্ধকারে ভরা, শুধু পিয়ানোর কাছটা জ্যোৎস্নার আলোয় একটু উজ্জল হইয়াছে। সে ধীরে গিয়া পিয়ানো খুলিয়া বাজাইতে বসিল। এ যেন নিশীথ রাতের তারকা ধীরে ধীরে নামিয়া পৃথিবীর অন্ধকারের কানে চুপে চুপে কি কথা বলিতেছে। বড় মধুর, বড় করুণ সে সুর, অনন্তকালের বিরহবেদনায় ভরা।

রজত চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, উঠিয়া যাইতে চাহিলেও পারিল না, তাহার চারিদিকে সুরের স্বপ্নজাল সৃষ্ট হইল।

যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল কাজী-সাহেব তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। সঙ্গীত কখন থামিয়া গিয়াছে, পিয়ানো-বাদিনী কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা তাহার খেয়ালই হয় নাই। কাজী-সাহেবের শ্মশ্রুমণ্ডিত স্নিগ্ধ মুখের দিকে সে চাহিল। এ লালসার সুধা-হলাহলময় নদী পার হইয়া ভোগবতীর শেষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অতৃপ্ত অবসন্ন এই প্রৌঢ় সুরশিল্পীর পাশে বসিয়া তরুণ চিত্রশিল্পীর নিকট এই ম্লান জ্যোৎস্না রজনী বড় করুণ লাগিল।

ব্যর্থ যৌবন, ব্যর্থ সব আশা, জীবনের মর্ম্মস্থলে যেন মায়াবিনীর বাসা, সে ভোলায়, মাতায়, হাসায়, তারপরে কাঁদায়, ধরা কিছুতেই দেয় না। প্রাণ যদি একটুকু কাহারও প্রেম হৃদয়-পেয়ালায় ভরিয়া তপ্ত তৃষিত ওষ্ঠে ধরিতে চায় অমনি পাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া শতখান হয়।

একটি পাখী জ্যোৎস্নায় মাতোয়ারা হইয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। কীট্‌সের মত রজতের প্রাণ কোন চিরব্যর্থতার বেদনায় ভরিয়া উঠিল—

O for a draught of vintage, that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,

ধীরে রজত ডাকিল, কাজী-সাহেব।

স্নিগ্ধস্বরে কাজী বলিলেন, কি ?

—আপনার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না, আপনি সেই গানটা একবার আমায় শোনান।

—কোনটা ?

—মীরার যে গানটা সেদিন পড়্‌ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। কাজী তাঁর ভাঙ্গা গলায় তপস্বিনীর ভক্তিপূত সঙ্গীত ধরিলেন।—

মহাঁনে চাকর রাখো জী,
চাকর রহস্যুঁ, বাগ লগাস্যুঁ, নিত উঠি দরসন পাস্যুঁ।
বৃংদাবনকী কুংজ গলিনমেঁ, তেরী লীলা গাস্যুঁ॥
সাঁবরিয়া মহাঁনে চাকর রাখো জী,
হরে হরে সব বাগ লগাউঁ, বিচ বিচ রাখুঁ বারী।
সাঁবরিয়াকে দরসন পাঁউ পহির কুসুম্ভী সারী॥
মহাঁনে চাকর রাখো জী।

গান শেষ হইলে রজত ধীরে বলিল, কাজী-সাহেব, আর আপনাকে জাগিয়ে রাখ্‌ব না, ঘুমোতে যান, কালই আমি বোধ হয় চলে যাচ্ছি।

—কালই! কেন ?

—হাঁ, তাই ঠিক কর্‌লুম।

—না না, আমরা ছাড়্‌লে তো।

—না, কাজী-সাহেব।

তাঁহার গলার ব্যথাভরা স্বরে চমকিয়া কাজী ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, অত অধীর হলে চল্‌বে কেন, আর আপনার বন্ধুটিকে আন্‌লেন কেন, ওকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না—গোলযোগ বাধাতে উনি মজবুৎ—কিন্তু আমার কথা যদি শোনেন, যাবেন না।

রজত একবার কাজী-সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

মধ্যরাত্রিতে কাজী-সাহেবের ঘুম বার বার ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, বুকের সব রক্ত যেন মাথায় গিয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে বারান্দার বাহির হইলেন। রজতের ঘরে তখনও আলো জলিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অবারিত দ্বার দিয়া ধীরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রজত নিবিষ্ট মনে রমলার ছবি আঁকিতেছে, সে যেন চোখ বুজিয়া তুলি বুলাইয়া চলিয়াছে। ক্ষীণদৃষ্টি কাজী-সাহেবের নিকট এ মৃদু বাতির আলোয় ছবি আঁকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। কাজী-সাহেব স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

রজত ফিরিয়া তাকাইল, কাজী-সাহেবের ভাবে-ভরা ভাসা ভাসা চোখের উপর তাহার দীপ্ত চক্ষু চশমার কাঁচ ভেদ করিয়া গিয়া পড়িল। তাঁহার জটার মত কেশ, গৈরিক বেশের উপর চোখ বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া রজত আবার ছবিতে মন দিল।

কাজী-সাহেব একটি গান মৃদু গুঞ্জরণ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাকী রাতটুকু আর তাঁহার ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে যখন রজত যোগেশ-বাবুকে জানাইল, সে আজই চলিয়া যাইতে চায়, রমলা কিম্বা মাধবী কোন কথা বলিল না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকাইতে সাহস করিল না,

আশ্চর্য্যান্বিতও হইল না, যেন এ ঘটনা ঘটিবে তাহা তাহারা জানিত। যোগেশ-বাবুও বিশেষ কিছু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, যদি সুবিধা বোধ না হয় তিনি জোর করিয়া রাখিতে চান না। গতরাত্রির মদের ঝোঁকটা তখনও তাঁহার যায় নাই। রজত বলিল, কলিকাতায় যাইয়া আর একজন ভাল আর্টিষ্টকে পাঠাইয়া দিবে।

রজত তাহার জিনিষগুলি গোছাইতেছিল, চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া ছোট-খাট জিনিষগুলি সাজাইতেছিল। নিঃশব্দে রমলা ঘরে প্রবেশ করিল, অর্দ্ধেক ভেজান দরজার কাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার চিররহস্যভরা সুরে বলিল, আপনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন ?

ক্ষণিকের জন্য রমলার লোধ্ররেণুর মত রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া রজত রংএর বাক্সটা শেভিংএর সরঞ্জামের পাশে রাখিল।

চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল, কেন ভাল লাগ্‌ল না ?

রজত রমলার অতলস্পর্শ কালো চোখের দিকে একটুখানি চাহিয়া বলিল, অনেক সময় খুব ভাল লাগ্‌লেও চলে যেতে হয়।

হাসির সুরে রমলা বলিল, পালিয়ে যাচ্ছেন বুঝি ?

রজত নীরবে তাহার রুমালগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

দরজাটা দোলাইতে দোলাইতে রমলা বলিল, বা আমাদের ছবিগুলো আঁকা হল না ?

ওই আপনাদের ছবি, বলিয়া বিছানার কোণ হইতে দু'খানি ছবি রমলার সম্মুখে টেবিলে রাখিল। একখানি মাধবীর, আর একখানি রমলার ছবি। প্রথমে আসিয়াই মাধবীকে যে রূপে দেখিয়াছিল,—সেই পামগাছের তলায় পাঠনিরতা মাধবী। আর রমলার ছবিখানি ডুলাকঅঙ্কিত ওমরখৈয়ামের সাকীর মত—জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা আলোয় হাস্নাহানাকুঞ্জের পাশে সে দাঁড়াইয়া।

ছবিখানি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া একটু দেখিতেই রমলার মুখ শরৎ-উষার আকাশের মত রাঙা হইয়া উঠিল। রজত তখন ধীরে ব্যাগের উপর ঝুঁকিয়া কাপড় জামাগুলি কোনমতে গুজিয়া রাখিতেছিল। সেই নত দীর্ঘ দেহ বিপর্যস্ত কেশভরা সুঠাম মুখের দিকে রমলা ক্ষণিক চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, রজতের হাত হইতে ব্যাগটা টান মারিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত জিনিষ ঘরে ছড়াইয়া ফেলিয়া আবার ভাল করিয়া গুছাইয়া দেয়। রমলার রাঙা মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া রজত বলিল, কেমন হয়েছে ?

দৃপ্তস্বরে রমলা বলিয়া উঠিল, এ কাকাবাবুকে দেবেন না।

বাঁশীগুলি ব্যাগে রাখিতে রাখিতে রজত বলিল, তবে দিন, বাক্সে পূরে নি, এখনও জায়গা আছে।

ভীতলজ্জিতভাবে হুকুমের ভঙ্গীতে রমলা বলিল, না, এ কক্ষনো কাঁউকে দেখাতে পাবেন না।

রমলার প্রদীপ্তমুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল, তবে দিন আমি নিয়ে যাই।

রজতের দিকে স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিয়া, না আমি নিয়ে চল্লুম, বলিয়া রমলা ছবিখানি আঁচলে ঢাকিয়া ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিল।

বাকী জিনিষগুলি যে-কোনপ্রকারে তাড়াতাড়ি পূরিয়া রজত বাক্সটা কোনমতে বন্ধ করিয়া বাঁচিল। চেয়ারটায় অতি শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইতেই সে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল।

ধীরকণ্ঠে মাধবী বলিল, আপনি আজ যাচ্ছেন ?

নম্রকণ্ঠে রজত বলিল, হাঁ।

মাধবী একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কেন চলে যাচ্ছেন, কয়েকদিন বাদে গেলে হত না? মনে মনে যাহা ভাবা যায় তাহার সবই যদি বলা যাইত তবে জীবনের সুখ বাড়িত কি কমিত বলিতে পারি না, তাহাই বোধ হয় ভাল হইত। সে যাহাই হউক, মাধবী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, স্থির মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ধীরে বলিল, পুস্‌পুস্‌ ঠিক করতে হবে কি?

—না; মোটরেই যাব।

—আচ্ছা, আমি মনিয়াকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে কি খাবার দেব?

—কিছু দেবার দরকার নেই।

—না, রমু কোথায় গেল, সে কি রোষ্ট্‌ আর পুডিং কর্‌বে বল্‌ছিল। আপনার থাকতে অনেক অসুবিধে হল, ক্ষমা কর্‌বেন।

স্নিগ্ধ বিনীতকণ্ঠে রজত বলিল, না, না, আমারই যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা করবেন।

স্থির হইয়া মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। এই পদ্মরাগের মত রাঙা মুখ, নিখুঁত সৌন্দর্য্যভরা দেহ, এ যেন কত রাত্রির অশ্রু জমাট হইয়া দীপ্ত শুভ্র হইয়াছে, এ যেন মূর্ত্তিমতী বেদনা, এই শুভ্র সুন্দর কপোলে কত ব্যথাময় দুঃখরাত্রি আঘাত করিয়াছে, কিন্তু কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই, এ যেন কত ব্যথা সহিয়াছে, কত ব্যথা সহিবে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় বেদনার দিকে চাহিয়া রজতের মাথা নত হইয়া আসিল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে যতীনের টুপি দেখা যাইতে মাধবী ধীরে সরিয়া গেল।

হ্যালো রজট, এ কি, এত ঝিমিয়ে পড়েছ, cheer up old boy! —life—struggle—energy—বলিয়া রজতের পিঠ চাপড়াইয়া হাতে ঝাঁকুনি দিয়া হাত পা ছুড়িয়া যতীন সমস্ত ঘর যেন কাঁপাইয়া তুলিল।

রজত ধীরে হাসিয়া বলিল, আমি তো আর তোমার মত একটা machine of money-making নই যে দিনরাত সমানবেগে ঘুর্‌ছি আর ঘুর্‌ছি।

—তা বটে, তোমরা আর্টিষ্ট্।

—হাঁ, আমরা ভাই, গ্রীষ্মে জলি, বর্ষায় কাঁদি, শরতে হাসি, বসন্তে উদাস হয়ে বেরিয়ে পড়ি!

—ভ্যাগাবণ্ড্ আর কি—তোমার চেয়ে আমার কলে যে কুলিটা খাটে সমাজে তার বেশি প্রয়োজন, জান? আরে packing? তাই বল, so sorry, কি হল?

—এই তো বল্লে, ভ্যাগাবণ্ড্, এক জায়গা বেশি দিন সইবে কেন?

—তা বটে, যেখানে যাবে একটা গোলযোগ বাধাবে, নিজে টিক্‌বে না, আর কাউকে টিক্‌তে দেবে না।

—তুমিও কি আজ যাচ্ছ?

—তা বল্‌তে পারছি না, that depends, বলিয়া যতীন থামিয়া গেল। আচ্ছা, তুমি গুছোও, স্মিথের কাছে ঘুরে আস্‌ছি, cheer up—বলিয়া রজতকে আর এক ঝাঁকুনি দিয়া সে চলিয়া গেল।

যতীন কিন্তু সত্যই স্মিথসাহেবের কাছে গেল না! সে গেটের নিকট আসিয়া এক পামগাছের কাছে দাঁড়াইল। একখানি চিঠি গাছের তলায় তীরাহত পাখীর মত আসিয়া পড়িল। দৃঢ়হস্তে খামখানি তুলিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। আইভরি-ফিনিস কাগজের এককোণে একটি কথা লেখা। তাহার চোখ নাচিতে লাগিল, মুখ দৃঢ় একটু রুক্ষ হইল। কাগজখানি হাতের মুঠায় পাকাইতে পাকাইতে প্যাণ্টের পকেটে পুরিয়া সে একবার লালবাড়িটার দিকে চাহিল, তারপর একটু টলিতে টলিতে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। মোটরে উঠিয়া আর একবার বাড়িটার লাল পথের দিকে চাহিল। ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের সারির পাশ দিয়া

মাধবীর শাড়ীর লাল পাড় লাল কাঁকরের উপর লুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই সময় রজত যদি ড্রইং-রুমের সম্মুখে বারান্দার কোণে থাকিত তবে সে হয়ত তাহার স্যুটকেশে রংয়ের বাক্সটা তখনও ভরিত না; কিন্তু তখন সে একটা সিল্কের রুমালের মধ্যে রমলার একটি ছোট ছবি রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিতেছিল। আর তাহার উপরের ঘরে রমলা তাহার বাক্স খুলিয়া শাড়ীগুলির তলায় নিজের ছবিখানি রাখিতেছিল।

যতীনের মোটরের পিছনে-ওড়ানো লালধূলি দেখিতে দেখিতে মাধবী ধীরে ধীরে গেটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার প্রিয় পামগাছের তলায় আসিল। মোটরের শব্দ যখন দূরে মিলাইয়া গেল, সে কাঁকরের উপরই যেন অতি শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। শূন্যমনে রৌদ্রভরা প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল। আকাশ আলোক অতি উদাস, চারিদিক নির্ঝুম, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি।

কাজী-সাহেব তখন যোগেশ-বাবুকে জেবুন্নেসার কবিতা শুনাইতেছেন—

গুফ্‌তম্‌ আজ ইশ্‌কে বুতাঁ
আয়্‌ দিল্‌ চে হাসিল কর্‌দাই।
গুফ্‌ত্‌ বারা হাসিলে জুজ
নালাহায় হম্‌ নিস্থ্‌॥

প্রিয়া প্রেমকে জিজ্ঞাসা করলুম, প্রেম তুই কি লাভ করিলি? প্রেম উত্তর দিল, অশ্রু ও রোদন ভিন্ন কিছুই না।

১৩

নীলসমুদ্রের তীরে সোনালী বালুকার সমুদ্র—ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ। অনন্তের চিরচঞ্চল চিরকল্লোলময় স্নিগ্ধনীল রূপের পাশে চিরস্থিত বিরাট শূন্যতাময় উদাস স্তব্ধ ধূসর রূপ—তাহার উপর চির জ্যোতির্ময়ের গমনাগমনের পথচক্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নর্তনমঞ্চ অনন্তব্যোম।

রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারের ভিতর ধূসর বালুভূমির উপর দিয়া একখানি জীর্ণ খর্জ্জুরপত্রাচ্ছাদিত গরুর গাড়ি চলিয়াছে। কয়েকখানি কালো মেঘে দশমীর চাঁদ ঢাকিয়া গিয়াছে, ছোট ছোট দৈত্যের মত ছিন্নকালো মেঘভরা আকাশে তারাগুলি পথহারা শিশুদের মত করুণ নয়নে তাকাইয়া আছে। পথহীন জনহীন ভূমি অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, চারিদিকে তিমির রাত্রির মায়া, তাহার মধ্য দিয়া মানবের এই অতিপ্রাচীন যানটি রাত্রির পরপারে কোন অরুণ-লোকের যাত্রী।

গোরুর গাড়িটি একটু বেগে চলিতেছে, তাহার কেরোসিনের লণ্ঠনের মৃদু আলো বালুকারাশির উপর ঝক্‌ঝক করিতেছে, শীর্ণ গোরু দুইটি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছে, আর বিড়ি টানিতে টানিতে উড়িয়া গাড়োয়ান তাহাকে পুচ্ছ মলিয়া ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিতেছে; তারাগুলির মত করুণ চোখে চাহিয়া গোরু দুইটি মেঘাচ্ছন্ন পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, গলার ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিতেছে,—কতদূর আর কতদূর?

গাড়ির ভিতর বহুক্ষণ নিদ্রা যাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া যে-যুবকটি মাথার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া বসিল, সে রজত। পিছনের ঝাঁপি তুলিয়া দিয়া ছাউনির গায়ে এক বালিশ রাখিয়া তাহাতে হেলান

দিয়া বসিয়া সে একটা চুরুট ধরাইল। চারিদিক মৃত্যুপুরীর মত নির্জ্জন, ছায়ায় ভরা, সমুদ্রের কল্লোল সুদূরদেশের স্বপ্নের মত, বুকচাপা দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত অতি মৃদু বাতাস বহিয়া বালুকারাশি কাঁপাইয়া সির সির করিয়া বহিতেছে, একটি তারা মাথার অতি নিকটে জ্বলিতেছে, তাহার নিশ্বাস যেন গায়ে লাগিতেছে। রজতের গা সির সির করিতে লাগিল, কিন্তু পায়ের কাছের চাদরটা টানিয়া লইতেও কুঁড়েমি ধরিল। এই তৃণহীন জীবহীন পথহীন বালুসমুদ্রের উপর দিয়া রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহার যাত্রা! কোনারকের যে-শিল্পসৌন্দর্য্য তাহার মনকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাত্রিপ্রভাতে তাহার তো দেখা মিলিবে। কিন্তু? ধীরে সে চাদরটা তুলিয়া লইয়া পায়ে জড়াইল, চিররহস্যময় আজন্ম ঈপ্সিত দুইটি কালোচোখ তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এই, অসীম স্তব্ধ শূন্যতা ছাড়াইয়া অন্ধকার ছাড়াইয়া সে চলিয়াছে, পথের কোন্ সঙ্গিনীর জন্য, কোন্ কণ্ঠের কথাগীতের জন্য, কোন মুখের দীপ্ত আলোর জন্য প্রাণ তৃষিত উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি ছোট নদীর তীরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছাইল। অন্ধকার রাত্রির চোখের জলের মত নিয়াখিয়া নদী মরুভূমির বুক হইতে উৎসারিত হইয়া অতি ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কয়েকটি পাখীর ডানার শব্দে আকাশ শিহরিয়া উঠিল, মেঘ সরিয়া গিয়া চাঁদের আলো দেখা দিল, বাতাস জোরে বহিতে লাগিল। নদীজলের ছলছল শব্দে রজত যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারের বুকে কোন্ আঁখির আলোর জন্য প্রাণের কান্নার মত এই নদীটি।

ধীরে ধীরে রজত গাড়ি হইতে নামিয়া লোহাবাঁধানো পাহাড়ে লাঠিটি লইয়া নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে কালো ছায়ার মায়া, চাঁদ হইতে ঝরিয়া পড়া আলো সে অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। নদীর পরপারে কয়েকটি মানুষের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে,

কয়েকটি উড়িয়া পাল্‌কিবেহারাদের গুঞ্জরণ, দুইটি আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে।

এই জল, আলো, মানুষের কণ্ঠ শুনিয়া রজতের মন যেন সচেতন হইয়া উঠিল। ধীরে নদীর তীরে বসিল। সহসা পরপারের মায়ালোক আগুনের রংএ রঙীন হইয়া উঠিল। উড়িয়া বেহারাগুলি আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতে বসিয়াছে। আগুনের রাঙা শিখার চারি-দিকে গোল হইয়া তাহারা বসিয়াছে। তাহাদের কালো মুখ হলুদের রঙে ছোপানো। নিকটে পাল্‌কির উপর হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া এক তরুণী মূর্ত্তি, ঠিক একখানি ছবির মত, মুখ ঠিক দেখা যাইতেছে না। শুধু তাহার শাড়ীর ঝলমলানি আর কথার স্বর আর তাহার সুতীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট ছায়া অগ্নিশিখাময় পটে ছবির মত আঁকা।

গোরুর গাড়িখানি যখন নদী-পার হইয়া অপর তীরে পৌঁছিল তখন পাল্‌কি সম্মুখে বহুদূর পথ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রজত দূরে মরীচিকার মত পাল্‌কির আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ি মৃদু আর্ত্তনাদে চলিতে লাগিল।

দূরে অন্ধকারে গাছের ছায়ায় একটি ছোট গ্রাম সুষুপ্ত, মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ যেন পথের ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, অন্ধকারের ভিতরে হরিণের পাল কোথায় ছুটিয়া গেল। যাত্রাপথের বিভীষিকা যেন কাটিয়া যাইতেছে, বিরাট শূন্যতা প্রাণের হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, লক্ষকোটি তারার গমনাগমনের ছন্দ, কতশত কীটপতঙ্গের রিনিঝিনি। এ পৃথিবী জুড়িয়া যাত্রার সহিত রজতও চলিয়াছে।

ধীরে বাঁশীটি লইয়া রজত একটি গানের সুর বাজাইতে লাগিল, পিছনে-ফেলা নদীর কালো জল যেন বালুতটের কানে কানে তাহারি গানের কথা কহিয়া যাইতে লাগিল,—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান
তার বদলে আমি চাইনি কোন দান।"

সম্মুখপথে পাল্‌কিতে বসিয়া রমলা পাল্‌কিবেহারাদের করুণ গুঞ্জরণ-ধ্বনির সুরে সুরে গাহিতেছিল—

"এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান,
ভুল্‌তে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ।"

পাল্‌কি ও গোরুর গাড়ি চলিয়াছে. আলো-অন্ধকারের স্রোতের ভিতর দিয়া। দুই যাত্রী পরস্পর হইতে বহুদূরে, তবু তাহারা পরস্পরের সঙ্গ অনুভব করিতেছে।

একে একে তারা নিভিয়া যাইতেছে, জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিতেছে, বাতাস থামিয়া গিয়াছে। আসমুদ্র চন্দ্রভাগা উষার আলোক-আঁধারে স্তব্ধ। জ্যোতির্ম্ময় সন্তান জন্মের প্রসববেদনার মত সমস্ত আকাশ কাঁপিতেছে।

পূর্ব্বাকাশে রক্তবিন্দুর মত এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে দিকে দিকে অগ্নিশিখা নাচিয়া উঠিতেছে।

রজত গাড়ি হইতে নামিয়া লাঠি হাতে করিয়া পূর্ব্বাকাশে অনলভরা মেঘস্তূপের দিকে চাহিয়া গাড়ির আগে আগে চলিল। কাঁধ বদ্‌লাইতে সম্মুখে পাল্‌কি একবার থামিল, তাহার তরুণী আরোহিণী নামিল, উষার রক্তমায়ায় রজত তাহার স্বপ্নমূর্ত্তি আবার দেখিতে পাইল।

হাজারিবাগের পথের সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল। সেই যে অন্ধকার রাত্রির দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া তীর-বেঁধা নীড়-হারা পাখী যাত্রা করিয়াছিল, সে যেন জ্যোতির্ম্ময় লোকের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সমুদ্রের জলে স্নাত নির্ম্মল দুই পাখা মেলিয়া আবার নব আলোকের যাত্রা শুরু করিয়াছে।

আকাশবীণার স্বর্ণতন্ত্রীতে আলোকের জয়গান বাজিয়া উঠিল;

পৌঁছিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি পার হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের দ্বারে সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিমিরদুয়ার উন্মুক্ত করিয়া তিনি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। গলিত সোনার মত আলোর ধারা পূর্ব্বাকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়া সমুদ্রতরঙ্গে রক্ত-তরঙ্গের মত গড়াইয়া আসিতেছে, রাত্রির কালো পাথরের উপর রাঙা আলোর তরঙ্গ আছাড়ি পিছাড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ধূলিসম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া যাইতেছে, বালুভূমি স্বর্ণরেণুর মত ঝিকিমিকি করিতেছে, চন্দ্রভাগার তীর্থজল রক্তচন্দন-স্রোতের মত দেখাইতেছে।

কোনারকের মন্দির পূজাপ্রদীপের শিখার মত জলিতেছে; তাহার ভগ্নচূড়ায়, তাহার মরুশয্যানিমগ্ন পাথরগুলিতে, তাহার বনশিখরে আতপ্ত-রক্তের প্রলেপ মাখানো, রাঙা আকাশের পটে পূজারত সাধক মূর্ত্তির মত আঁকা। সূর্য্য দেবতার প্রতি মানব অন্তরের চিরন্তন বন্দনা, শিল্পীর এই মানস-কমল ধরণীর বুক হইতে উচ্ছ্বসিত জয়গানের মত এই জনশূন্য সমুদ্রকূলে বালুভূমে শতাব্দীর পর শতাব্দী জাগিয়া আছে, দিনের পর দিন নব নব যাত্রিদলের কানে কানে পাথরের বন্দনাগান বাজিয়া উঠিতেছে,—জয়, আলোর জয়, সূর্য্যদেবতার জয়!

রাঙা আলোর মায়া ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। দুধের মত সাদা আলো, চারিদিকে প্রখর প্রদীপ্ত আলো।

তরুণী পাল্‌কির ভিতর উঠিয়া বসিয়াছে, ছয় বেহারার কাঁধে পাল্‌কি যেন উড়িয়া চলিয়াছে। দূরে মিলাইয়া গেল।

রজত ধীরে গাড়িতে উঠিল। গাড়ি চলিতে লাগিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় মৈত্রীবনের স্নিগ্ধছায়ায় এক বটগাছের নির্জ্জন কোণে রজত ও রমলা পাশাপাশি আসিয়া বসিল। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহারা কোনারকের মন্দির ঘুরিয়াছে, প্রতি শিলা, প্রতি মূর্ত্তি যেন প্রদক্ষিণ করিয়াছে। রজত রমলাকে সব বুঝাইয়া দিয়াছে—এই

উড়িষ্যার শিল্পধারার সঙ্গে ভারতের অন্য শিল্পধারার যোগাযোগ, ইহার শিল্পপ্রণালীর কৌশলগুলি, সূর্য্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন্ পণ্ডিত কি বলিয়াছেন, রাজহস্তীর সুবিপুল গাম্ভীর্য্যময় মূর্ত্তি, অরুণ-অশ্বে গতির ভাবাত্মক মূর্ত্তি, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেবের এই আশ্চর্য্য শিল্পকীর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছে।

সমস্ত দিন বাহিরের কথা হইয়াছে, দুই জনের মনে যে কথাগুলি কানায় কানায় ভরা ছিল, সে মনের কথা কেহ কিছুই বলে নাই।

দুইজনে পাশাপাশি বসিল, চারিদিকে আলোছায়ার মায়া, সম্মুখে একাদশীর চন্দ্র উঠিতেছে।

রমলা ধীরে বলিল, আচ্ছা, তুমি অমন ক'রে চলে গেলে কেন?

ধীরে রজত বলিল, সে আর-একদিন বল্‌ব, আজ থাক্—আচ্ছা তুমি যতীনের বিয়েতে গিয়েছিলে?

রমলা বলিল, না যাইনি। তুমিও যাওনি?

রজত বলিল, আমি তো কল্‌কাতায় ছিলুম না; চিঠিটা কল্‌কাতা ঘুরে আগ্রায় যায়, সেদিন তাজমহল দেখে ফির্‌ছি, ঘরে এসে দেখি একখানা লাল চিঠি, সমস্ত রাত সেখানা খুল্‌তে সাহস হয়নি।

ও, বলিয়া রমলা হাসিয়া উঠিল, গাছের পাতাগুলিও সে হাসিতে নাচিয়া উঠিল!

রজত বলিল, হাঁ, পরের দিন যখন খুলে পড়্‌লুম মাধবীর সঙ্গে বিয়ে—

তারপর, কি কর্‌লে? বলিয়া রমলা দুষ্টামিভরা চোখে চাহিল।

তাহার হাতের সোনার চুড়িগুলি নাড়িয়া টুং টুং মিষ্টি শব্দ করিতে করিতে রজত বলিল, তক্ষুনি প্যাক্ করে, ষ্টেশনের দিকে ছুট্‌লুম।

—বিয়েতে যেতে?

—না।

—তবে ?

রমলার মুখের দিকে বিদ্যুৎ-কটাক্ষ করিয়া রজত বলিল, তোমার সন্ধানে। ভাব্‌লুম সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী যখন বাঁধা পড়েন নি, একবার তো দেখা পেয়েছিলুম ; এই পাথরের রাজ্যে, কবর ঘুরে শিল্পসুন্দরীর সন্ধান করে' আর কি হবে ?

—শিল্প দেখার নাম করে বেশ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান হয়েছে ! কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ?

—দিল্লী, আগ্রা, অমৃতসর।

—বেশ, দিব্যি একা একা বেড়িয়ে আসা হল !—জান, তোমার জন্যে, এবার আমার পরীক্ষা দেওয়া হল না ?

রজত বলিল, আর তোমার জন্যে আমার একখানাও ছবি আঁকা হয়নি, আর কিছুদিন হলে starve করিয়ে ছাড়্‌তে।

কাঁধে কাঁধ ঠেকাইয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

রমলা ধীরে বলিল, আচ্ছা, জীবনটা কি মজার, নয় ? পৃথিবীটা মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত লাগে, যখন ভাব্‌তে বসি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

তাহার চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রজত বলিল, বুঝ্‌তে না চেষ্টা করাই সবচেয়ে ভাল, ততক্ষণ পিয়ানো বাজালে—

রমলা ধীরকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল, আচ্ছা, ধরো, সাত মাস আগে, তুমি কোথায় ছিলে, আমিই বা কোথায় ছিলুম, কেউ কাউকে জান্‌তুম না তো, মাঝে মাঝে ভাবি কে যেন টেনে নিয়ে যায়,—সে কি ঘটাবে, কি দেখাবে, কোন্ পথে নিয়ে যাবে,—কত লোক তাকে কত কি বলে, কেউ বলে Fate, কেউ circumstances, কেউ God, কেউ Life force, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

ধীরে রমলার কাঁধে হাত রাখিয়া রজত বলিল, কি দরকার বুঝে ? চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাতটা—এই সাগর আর মরুভূমির মাঝে মন্দির—

এর দিকে চাইলেই যেন মনে হয় মানুষ শুধু সাগর ডিঙোয়নি, মরুভূমি পার হয়নি, বারুদ কামান তৈরি করেনি, সে মনের আনন্দে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে।

অতি মিষ্টি গলায় রমলা ডাকিল, এই !

রজত ধীরে উত্তর দিল, কি ?

একটু যেন ভীত হইয়া রমলা বলিল, ওদিকে কিসের শব্দ হচ্ছে ?

রজত একটু হাসিয়া বলিল, সাপটাপ হবে।

রমলা একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, আচ্ছা, যে এমন সুন্দর রাত, এমন চাঁদের আলো সৃষ্টি করেছে, তার সাপ সৃষ্টি করবার কি দরকার ছিল ? যদি সাপকে সুন্দর করেই তৈরি করলে, তার মুখে বিষ ভরে' দিলে কেন— ?

রজত বলিল, এক হাতে প্রাণ আর এক হাতে মৃত্যু, এক হাতে ফুলের মালা আর এক হাতে বজ্র—থাক্ ওসব কথা। দেখ, ওটা সাপ নয়, একটা হরিণ, কি সুন্দর চোখ দু'টো ! নয় ?

রমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, lovely !

রজত রমলার আঙ্গুর-আঙ্গুলগুলি ধরিল। রমলার মনে হইল রজতের দেহ যেন একটি বাঁশী, রক্তধারার ছন্দে কি সুর বাজিতেছে তাহা তাহার দেহের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল। আর রজতের কাছে রমলা মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত, পথহারা সমস্ত রাগরাগিণী যেন তাহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হাতে হাত জড়াইয়া দুইজনে বসিয়া রহিল।

তাহাদের ঘেরিয়া পিছনে বনের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, মন্দিরের প্রতি শিলায় মৃদঙ্গের মত জীবনকল্লোলময় কোন্ নীরব সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। সম্মুখে একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সোনালী বালুচরে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

১৪

বিবাহের পর রজত ও রমলা পুরী হইতে কিছু দূরে নির্জ্জন সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মের বাকি মাসটা কাটাইল। নবদম্পতি প্রথমপ্রেমলীলায় জগতের সব মানুষ ও সব বস্তু যেন ভুলিয়া গেল। প্রতিজন প্রতিজনের নিকট অপরূপ মহাবিস্ময়কর পরমানন্দময় সৃষ্টি, নবজগৎ রূপে প্রকাশিত হইল। আর কোন মানুষের সঙ্গের দরকার রহিল না, এমন কি বহিঃপ্রকৃতির শোভাও থিয়েটারের দৃশ্যপটের মত তাহাদের নবজাগ্রত প্রেমের দীপ্তির নিকট ম্লান হইয়া গেল।

তরুণ ও তরুণীর প্রথম মিলনের দিনগুলি! সে কি বিস্ময়ঘন আনন্দময়, সে কি অন্ধ-আবেগময় মহারহস্যভরা, সে কি অনাস্বাদিত অমৃতের স্বাদে দেহে মনে চিরউন্মাদনা। নটরাজ যে-মত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে নীহারিকাপুঞ্জ হইতে তারার মালা, অগ্নিপিণ্ড হইতে শ্যামলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন, সেই সৃষ্টির আনন্দ প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তে নৃত্য করে। ধরণীর কিশোরী বয়সে যখন জলস্থলের বিভাগ হয় নাই, তখন অগ্নি জল হাওয়া যে-অজানা বেদনায় গোপন পুলকে মাতামাতি করিয়া বেড়াইত, সেইরূপ অসহনীয় ব্যথাময় সুখে দম্পতির দেহমন কাঁপিতে থাকে। সে কি স্বপ্নভরা দিন, সে কি গল্পভরা রাত! শিশুর হাসির চেয়েও সুন্দর, প্রসববেদনার চেয়েও ব্যথাময়, বন্ধুমিলনের চেয়েও সুখময়, ভাইবোনের ভালবাসার চেয়েও মধুর, মাতৃস্নেহের চেয়েও পবিত্র।

রজত ও রমলার প্রথম মিলনের দিনগুলি! দুইজনে দুইজনের মধ্যে যেন হারাইয়া গিয়াছে, প্রেমের নীহারিকা-পথে আপনাদের খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রতিজন যেন কোন্ অপূর্ব্ব দেশে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে, পথের বাঁকে বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে।

দেহের প্রতি অঙ্গ মনের প্রতি গোপন কক্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কৌতুক, কত ঔৎসুক্য, প্রতিক্ষণে নব নব অমৃত-ভাণ্ডারের রহস্য উদ্ঘাটন। কথা কওয়ায়, চুপ করায়, হাসায়, চোখের জলে, চাওয়ায়, না চাওয়ায়, ছোঁয়ায়, না ছোঁয়ায়, বসায়, চলায়, হাতের সঙ্গে হাতের বাঁধনে, কেশের সঙ্গে কেশের স্পর্শে, অধরের সঙ্গে অধরের মিলনে জগতের কোন্ অন্তর্নিহিত আনন্দময় চৈতন্যের সহিত দুইজনের চেতনা একাকার হইয়া যাইত।

এখন বাহিরের বিশ্ব যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় কিছুই আসে যায় না; যে-সোনালী বালুচর সন্ধ্যায় মিলন শয্যা পাতে, যে-সিন্ধু মিলনগীত গায়, যে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছটা মিলনক্ষণ রঙ্গীন করে, যে-জ্যোৎস্না মিলন-মুহূর্ত্ত স্নিগ্ধ করে, সব যদি শূন্যে মিলাইয়া যায়, কিছুই আসে যায় না— দুইজন দুইজনের মধ্যে অনন্ত জগৎ খুঁজিয়া পাইয়াছে। রমলার অমল তনু সমস্ত বিশ্বের চেয়েও আনন্দসৃষ্টি, অকলঙ্ক নীলাকাশের দিনগুলি তাহারই চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি, তারাভরা রাত্রি তাহারই লজ্জাজড়িত আঁখির কৃষ্ণ পল্লবের রহস্যময় ছায়া। তাহাদের দুইজনের মধ্যেই তো পুষ্প ফুটিতেছে, কুহু ডাকিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, সাগর গাহিতেছে, জ্যোৎস্না ঝরিতেছে —একটু মিলন যেন অনন্ত ক্ষণ, একটু বিরহ যেন অনন্ত যুগ—তাহাদের ঘেরিয়া মাধুর্য্য-প্রস্রবণ দিকে দিকে বহিয়া যাইতেছে।

মধু মধু, বাতাসে মধু বহিতেছে, আলোকে মধু ক্ষরিতেছে, আকাশে মধু ঝরিতেছে, সাগরে মধু টলমল করিতেছে, প্রিয়ার দৃষ্টি মধু ও তাহার বাক্য মধু, এই দেহ মধু, এই আত্মা মধু।

কোন স্তব্ধরাত্রে সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া রজত দেখিত রমলার এলায়িত নিদ্রিত দেহ—গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত আকাশের তলে এই নিদ্রাটুকু কি সুন্দর! কোন প্রভাতে রমলার আগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে রজতের সুপ্ত দেহের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই বিশ্রব্ধ বিশ্রামের ছবি প্রভাতের আলোয় কি মধুর! কোনদিন দুইজনেই

একসঙ্গে জাগিয়া উঠিত, সে কি সুন্দর মধুর জাগরণ—দুইজনের চুম্বনে যেন পদ্মের মত প্রভাত ফুটিয়া উঠিত, দুইজনের মিলিত চোখের আলো দিয়া মধুর হাসি দিয়া দিনের আলোর সৃষ্টি হইত।

রৌদ্র-উদাস কর্ম্মহীন অলস দুপুরে ঘরের সব জান্‌লা বন্ধ করিয়া শুধু সমুদ্রের দিকের দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া সেই দরজার সাম্‌নে দুইজনে পাশাপাশি চেয়ারে বসিত। সমস্ত দুপুর হেলাফেলা করিয়া কাটিত। সম্মুখে উদাস জনহীন বালুচরে আলোর প্রখর দীপ্তি আর সাগরের একসুরে করুণ সঙ্গীত—কখনও দুইজনেরই অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাসী হইয়া উঠিত, কখনও রজত চুপচাপ বসিয়া রমলার চুলগুলি লইয়া খেলা করিত আর রমলা স্তব্ধ পুলকের বিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিত, কখনও রমলার অপর্য্যাপ্ত কৌতুকে তীব্র হাস্যদগ্ধ কথায় অলস মধ্যাহ্ন চকিত হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যার সময় সাগরতীরে দুইজনে বেড়াইত, ঢেউয়ের সহিত খেলা করিতে করিতে রমলা জুতা ভিজাইয়া ফেলিত আর রজত সেই ভিজা জুতা বহিত।

জ্যোৎস্নারাত্রে উদ্বেলিত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিত, রজতের কোলে রমলা মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত, তারাগুলির দিকে চাহিয়া সহসা অলক্ষ্যে মৃদু নিশ্বাস পড়িত—জীবন যদি চিরকাল এইরূপ সুখস্বপ্নের মত কাটিতে পারিত! রজতের স্নিগ্ধ চোখের উপর তাহার কালো চোখ গিয়া পড়িত—এইরূপ শান্ত স্নিগ্ধ মধুময় যদি সমস্ত দিনরাত্রি হইত! পরস্পর বেশিক্ষণ চোখে চোখ রাখিয়া থাকিতে পারিত না, রজত সাগরের দিকে চাহিত, রমলা আকাশের দিকে; সাগরের করুণ সুরের সঙ্গে দুইজনে চুপচাপ ভাবিত।

রজত ভাবিত—কেন একে এত ভালোবাসি? এই কি সত্য ভালোবাসা?

রমলা ভাবিত—এই কি প্রেম? একেই লোকে বলে ভালোবাসা? না, সে আরও কিছু অপূর্ব্ব বিস্ময়কর মধুময়?

দুইজনেরই সন্দেহ জাগিত, মনে হইত, হয়ত এ ফাঁকি, এ প্রেম নয়, সে অমৃতের দ্বারে এখনও তাহারা আসিয়া পৌঁছায় নাই।

আবার ক্ষণিকের মধ্যে সন্দেহ দূর হইত, এই তো প্রেম। আঙ্গুলে আঙ্গুল জড়াইয়া মুখে মুখে চাহিত। আর পৃথিবীতে এই দুই তরুণ তরুণীর প্রেমলীলা দেখিয়া সিন্ধু উদ্বেলহাস্যে কি বলিত?

রমলা রঞ্জতের কোলে মাথা দিয়া সাগরতীরে শুইয়া ছিল, কুড়ানো ঝিনুকগুলি নাড়িতে নাড়িতে মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে দেখিতে অতি মিষ্টস্বরে রমলা ডাকিল—এই।

চুলগুলি লইয়া খেলিতে খেলিতে রঞ্জত বলিল, কি?

দুইজনে আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে রমলা আবার ডাকিল, এই—কি বল্‌ছো?

—আচ্ছা কবে যেতে হবে?

—পরশু।

—এ জায়গাটা ছাড়্‌তে মোটেই ইচ্ছে কর্‌ছে না—যেন মায়া পড়ে গেছে।

—কিন্তু ছাড়্‌তে তো হবে।

—সেখানে এম্নি সুখে থাক্‌তে পার্‌ব, এম্নি তোমায় পাব? আমার কেমন ভয় কর্‌ছে।

—ভয় কি রমু, কল্‌কাতায় এর চেয়েও সুখে থাকবে।

—এই দিনগুলোর মতই সেখানেও দিন কাট্‌বে?

—যে দিন যায় সে তো আর ফিরে আসে না, একটা দিনের মত কি আর-একটা দিন হতে পারে?

—তবে?

তবে, জগৎ যে চলেছে, জীবন যে চলেছে, পিছনে আঁক্‌ড়ে থাকতে চাইলে টেনে নিয়ে যাবে।

—আচ্ছা পৃথিবীটা যদি এই মুহূর্ত্তে এসে থেমে যেতো, আমাদের বয়স না বাড়্‌ত, জীবনের প্রতিদিন আজকের মত কাট্‌ত!

—তা তো হয় না রমু, এগিয়ে যেতেই হবে, কৈশোর হতে যৌবনে, যৌবন হতে—

—না, বুড়ো বয়সের কথা ভাব্‌তে আমার এত খারাপ লাগে, আমি যেন চুলপাকার আগে মরি, যখন হাস্‌তে গাইতে পার্‌ব না, দেখতে ভাল থাক্‌ব না, দুষ্টুমি কর্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌বে—

—কিন্তু আমার কাছে তুমি চিরকাল—

—না, আমি বুড়ী হতে পার্‌ব না।

তাহার গালে মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল, তুমি কোন কালে বুড়ী হবে না, ভয় নেই, যতই বুড়ী হও তোমার বুড়ো তোমায় ছাড়্‌বে না।

—যাও! আচ্ছা সেখানে গিয়ে—

—হাঁ, আমি বল্‌ছি—

—আচ্ছা।

রজতের চোখের দিকে রমলা চাহিয়া রহিল।

গভীর রাত্রে রমলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা হইতে ধীরে ধীরে উঠিল, রজতের কোঁক্‌ড়ান চুল নিদ্রিত মুখের দিকে স্নিগ্ধ করুণনয়নে চাহিল। দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নার মায়ায় ধূসর বালুচর স্তব্ধ, সাগরের একটানা সুর বড় করুণ। আবার ঘরে ফিরিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইল, রজতের মাথাটা বিছানা হইতে বালিশে তুলিয়া দিল। এই সমুদ্রগীত-মুখর নির্জ্জন বালুচরে প্রেমলীলাময় দিনগুলি ছাড়িয়া যাইতে তাহার গোপন বেদনা বোধ হইতেছিল।

চোখে জল ভরিয়া আসিল, বারান্দায় বাহির হইয়া গেল, বহুবৎসর পূর্ব্বে এক বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে সে কাঁদিয়াছিল; তারপর এই তার যৌবনজীবনের প্রথম ক্রন্দন। সুখমিলনরাত্রি অশ্রুসিক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া উঠিল।

১৫

আষাঢ়ের প্রথম মেঘের সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতি কলিকাতায় আসিয়া পড়িল। রজত রমলাকে তাহার মামার বাড়িতে আনিয়া তুলিল। বর্দ্ধমানে তাহার কাকা মক্কেল চরাইয়া ও প্রতিবৎসর সংসার বৃদ্ধি করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। দেশের গ্রামে তাহার জ্যেঠামশাই ভাঙ্গা ভিটে আঁক্‌ড়াইয়া সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া গ্রামে প্রতিদিন দলাদলি বাধাইয়া জীবনের শেষদিনগুলি পরম শান্তিতে কাটাইতেছিলেন —ইহাদের চিরন্তন বাঁধাপথের সংসারযাত্রার মধ্যে রমলাকে এক মূর্ত্তিমতী ফাল্গুনহাওয়ার মত লইয়া যাইতে রজতের সাহস হইল না। সুতরাং সে রমলাকে মামার বাড়িতেই উঠাইল।

অবশ্য মামার বাড়ি বলিতে যাহা বুঝায়, এ বাড়ি তাহা নহে—প্রৌঢ় ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় শীর্ণ অবিবাহিত এক প্রফেসার মামা আর তাঁর ছোট ভাড়াটে বাড়ি। রজতের মামা তার মার প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুইজনে ছেলেবেলা হইতেই খুব ভাব, আর এই সংসারে বৈরাগী ভাইটির ভার রজতের মাকে আজীবন বহিতে হইয়াছিল। তুলসীবাবু কলিকাতায় বরাবর রজতের মা বাবার কাছেই ছিলেন। তার পর তাঁরা যখন মারা গেলেন, মাতৃপিতৃহীন রজতকে তিনি বুকে তুলিয়া লইয়া স্বর্গগত বোনের এই মধুর স্মৃতিটিকে আজীবন পরমস্নেহে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন। নববধূ লইয়া রজত তাঁহার কাছেই উঠিল।

তুলসী-বাবু কেন বিবাহ করেন নাই, তাহা লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিত। এখন তাঁহার কাঁচাপাকা চুল, ছোট দাড়ি, তেলচুক্‌চুকে টাক আর তালপাতার মত পাৎলা দেহ দেখিয়া, এ লোকটা বিবাহ করিল না কেন সে বিষয় কেহ ভাবে না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই যখন তিনি কলেজের ডিমনষ্ট্রেটার হইতে প্রফেসার হইলেন অথচ সংসার পাতিলেন না, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইত। তুলসী-বাবু সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত ছিল, এখন সেগুলি প্রাচীন কথাসাহিত্যের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু একটি গল্প মাঝে মাঝে লোকের মনে জাগিয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের নাম করিলেই তুলসী-বাবুর মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, আনন্দমোহন ইত্যাদি মহাপুরুষদের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন, দেশে ধর্ম্ম ও সমাজের পুনরুত্থানের জন্য অদম্য উৎসাহে লাগিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার মধ্যে আশ্চর্য্যকর পরিবর্ত্তন ঘটিল। ব্রাহ্মসমাজের সব সংশ্রব ছিঁড়িয়া তিনি ঘোর নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। লোকে বলে তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ না কি এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ। সে যাহাই হউক, তুলসীবাবু এতদিন হেকেল, কোমতের গ্রন্থাবলী, বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, রিসার্চওয়ার্ক, নূতন নূতন ছেলের দল, রজতের খেয়াল, জীবাণুতত্ত্ব আর অম্ল অজীর্ণতা লইয়া পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া ছিল তাঁহার প্রাণ, আর মদের নেশার মত জীবাণুতত্ত্ব তাঁহার নেশা ছিল।

কলিকাতার ভদ্রবাঙ্গালিপাড়ায় একটি ছোট গলিতে ছোট বাড়ি। গলিটি উত্তর হইতে দক্ষিণে গিয়া এক বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। বাড়িটি পূর্ব্বমুখী। উপরে তিনখানি, নিচে তিনখানি ঘর। একতলার সাম্‌নে বসিবার ঘরখানি বেশ বড়, সমস্ত পূর্ব্বদিক জুড়িয়া, ঘরের পাশ দিয়া সিঁড়ি

দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে, সিঁড়ির পাশে উত্তরমুখো দুইখানি ছোট ঘর, একটিতে রান্না হয় আর একটিতে চাকর থাকে। ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দা, তারপর সানবাঁধানো ছোট উঠান। উত্তরদিকটা পাশের বাড়ির দেওয়াল দিয়া একেবারে চাপা, পশ্চিমদিকটা আর একখানি পাশের বাড়ির অন্দরমহলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ঢুকিবার দরজা সম্মুখের বড় ঘরের উত্তরদিকে এক কোণে। দোতলায় তিনখানি ঘর, পূর্ব্বদিকের বড় ঘরখানিতে মামাবাবু থাকেন, ঘরের তিন দিক বৈজ্ঞানিক বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলি দিয়া ভরা, আর একদিকে তিনখানি লম্বা টেবিলে ভূতত্ত্ব-বিদ্যার নানা রংএর ছোট বড় পাথর, স্পিরিট বা ফর্ম্মলে রক্ষিত নানা প্রকার মৃত জন্তুর দেহ ভরা ছোট বড় শিশি, আর স্লাইড্ করা কাঠের বাক্স সাজানো রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শোবার ছোট তক্তাখানি যেন অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরমুখো ঘর দু'খানির মধ্যে, একখানিতে রজত থাকে আর একখানিতে তাহার আঁকার সরঞ্জাম আর মামার ফ্লাস্ক টেষ্ট টিউবে ভরিয়া শিল্পীর শিল্পাগার আর রাসায়নিকের বীক্ষণাগার এইরূপ একটি উভচর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

প্রভাতে এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কাটিয়া কলিকাতার আকাশ কচি শিশুর হাসির মত নির্ম্মল রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে। বালিখসা হলদে বাড়ির দেওয়াল জলে ভিজিয়া রৌদ্রে ঝিকিমিকি করিতেছে। বাড়িখানিকে বাহির হইতে দেখিলে মোটেই মনে হয় না ইহার ভিতর এক বৈজ্ঞানিক তপস্বী তাঁহার জীবনের সাধনা করিতেছেন, এইখানে এক শিল্পী তাঁহার প্রিয়াকে লইয়া জীবনের নীড় বাঁধিতেছে।

ভাড়াটে গাড়িটি যখন বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রমলা যদি সুতীক্ষ্ণ চোখে বাড়ির সম্মুখভাগটা দেখিত তবে সে দুঃখিত হইত, কিন্তু সব জিনিষই তাহার অনির্ব্বচনীয় মধুর বলিয়া বোধ হইতেছিল, কে সুন্দর

আজ তাহার চক্ষে মোহনমন্ত্র বুলাইয়া দিয়াছে,—ষ্টেসনের কুলি, পথের জনতা, দোকানের সারি, গাড়ির শব্দ, এই প্রভাতের মেঘ ও রৌদ্র, রজতের মুখ, সবই কি অপূর্ব্ব সুন্দর। সমস্ত পথ রজত তাহাকে তাহার মামার গল্প, এই বাড়ির গল্প বলিতে বলিতে আসিয়াছে, ক'খানির ঘর আছে, বাজার করার, রান্না করার চাকরটির কি কি গুণ, কিরূপে এতদিন কাটিয়াছে, ইত্যাদি সব বলিতে বলিতে আসিয়াছে। বাড়িটি রমলার কাছে রজতের কৈশোর জীবনের কত স্বপ্নময় দিনের স্মৃতিবিজড়িত হইয়া তাহার মামার কথার সহিত জড়াইয়া মহারহস্যরূপে দেখা দিল। গাড়ি দরজার সম্মুখে থামিতেই চাকর গোপাল তাড়াতাড়ি মুখের বিড়িটা ফেলিয়া সম্মুখের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল এবং রমলা গাড়ি হইতে নামিতেই পথের ফুটপাথেই তাহার পদধূলি লইয়া নূতন গৃহকর্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে শুরু করিয়া দিল।

রজত তাহার মামাকে কোন খবর দিয়া আসে নাই। চিঠি লিখিয়া আসিলে তিনি প্রতিঘরের ধূলা ঝাড়িয়া ঘর সাজাইয়া খাবার আনিয়া যে-কাণ্ড করিয়া তুলিতেন তাহা ভাবিয়া সে কোন খবর দেয় নাই। মামাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য করিয়া দিবার লোভও কম ছিল না।

তুলসীবাবু দোতলায় তাহার ঘরে মাইক্রসকোপে একটা স্লাইড দিয়া অতি নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন, বহুক্ষণ দেখিলেন, কিন্তু তিনি যে জীবাণুর সন্ধান করিতেছিলেন তাহা পাইলেন না, একটু হতাশভাবে কাঁচ হইতে চোখ তুলিয়া ঘরের চারিদিকে আর পাশের টেষ্ট টিউবের দিকে চাহিলেন, তারপর টেবিলের উপর এক বড় খাতায় লিখিলেন, ৭২৯ বার, not found; তারপর আর-একটা স্লাইড দিয়া মাইক্রসকোপে মনোযোগ দিলেন। তিনি এই পরীক্ষাটি তিন বছর ধরিয়া করিতেছেন, এখনও সিদ্ধিলাভ করেন নাই।

রজত ধীরে আসিয়া স্লাইড সরাইয়া লইল, তুলসীবাবুর চোখ মাইক্রস্‌কোপে ছিল—তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন, তারপর মাথা তুলিয়া রজত ও রমলাকে দেখিয়া, ইউরেকা, ইউরেকা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। রজত ও রমলা একসঙ্গে তাঁর পায়ের ধূলা লইবার জন্য নত হইতেই তিনি তাঁর শীর্ণ হাতে রজতের সিল্কের পাঞ্জাবির গলাটা আর রমলার ক্রীমরংএর শাড়ীর আঁচল টানিয়া দুইজনকে তুলিলেন। তারপর রজতের দুইগালে দুই মৃদু চড় পড়িল, আর রমলার গণ্ড ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—বা! এ যে খাসা বৌ হয়েছে রে—আমি ভেবেই মরছিলুম, যে রজতকে বাঁদর বানিয়েছে, না জানি সে কেমন খিঙ্গি! তারপর রমলার গালে দুই আঙ্গুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন—মা-লক্ষ্মী, বেশ হয়েছে, আমি ভারি খুশি হয়েছি।

তারপর রজতের এক হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, আচ্ছা, হতভাগা গাধা একটা খবর দিয়ে আস্‌তে নেই, আমি কোথাই বসাই, কি বা খেতে দি বল্‌ তো?

তাঁহার পাৎলা দেহ তালপাতার মত কাঁপাইয়া তুলসীবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তোর ঘরে যাস্‌ না, এখন এখানে বোস্‌, গোপাল ছোঁড়াটা হয়েছে যেমন বাঁদর—বাবু নেই তো ঘর ঝেড়ে কাজ নেই,—না, ও গাধা, ওঘরে গেলেই অসুখ করবে, আমার ঘরটা তবু কিছু পরিষ্কার আছে। না, মা, তুমি এইখানে বোস, বলিয়া রমলার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইয়া দিলেন। রজত পিছনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

রমলাকে বসাইয়া তুলসীবাবু বারান্দায় বাহির হইয়া বাড়ি কাঁপাইয়া ডাকিতে লাগিলেন, বাঁদর, অ বাঁদর। এ ডাক চাকর গোপালকে। গোপাল বস্তুতঃ তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। কয়েকবার ডাকিবার

পর সাড়া দিতে মামাবাবু বলিলেন, যা বাঁদর, শীগ্‌গির গিয়ে সাম্‌নের দোকান থেকে—যা গরম খাবার পাবি, গরম যেন হয়, একেবারে টাট্‌কা, এখন তো জিলিপি ভাজে; আবার খাবার এনেই বাজার যাবি—ভাল মাছ, বুঝ্‌লি দেখে নিবি, যেন একটু গন্ধ না হয়, পচা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—আর বাঁদর বলেছিলুম না দাদাবাবুর ঘর ঝেড়ে রাখ্‌তে, শীগ্‌গির যা হতভাগা। চাকরের দিকে এক দশটাকার নোট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি নববধূকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমলা তাহার লাল নীল সব পাথরের টুক্‌রোগুলি ঘাঁটিতেছে আর শিশিতে ভরা জীবজন্তুগুলির প্রতি বিস্মিত নয়নে চাহিয়া আছে। রজতকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া মামাবাবু বলিয়া উঠিলেন, কোথায় গেল উল্লুকটা, বল্লুম ঘরে যাস্‌ না, ধুলোয় কিচিমিচি, একটা অসুখ না বাধিয়ে ছাড়্‌বে না। ধুলো, সে কি সামান্য জিনিষ মা, সব জীবাণুভরা, কত রোগের বীজাণু—ওই যদি দেহ একবার দখল কর্‌তে পার্‌লে, তারপর ডাক্তারই ডাকো আর যতই কাঁদ, ঈশ্বর ঈশ্বর বলে চেঁচাও, ও রাজাও মানে না, উজীরও মানে না, বুদ্ধও মানে না, নেপোলিয়নও মানে না, একবার কল একটু ভেঙ্গে দিল তো, ব্যস—একেবারে বন্ধ!—কোথায় গেল সে? বলিয়া তিনি ঘরে অতি ব্যস্তভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। রমলাকে কিরূপে যথোচিত অভ্যর্থনা করিবেন তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

রমলা মৃদুহাস্যে বলিল, আপনি যদি এত ব্যস্ত হন—

রমলার পিঠে থাপ্পড় দিয়া মামাবাবু বলিলেন, আপনি? বল, তুই।

এই সরল শিশুর মত মানুষটিকে রমলা দেখিয়াই ভালবাসিয়াছিল। সে মৃদু হাসিয়া মামাবাবুর টুইল সার্টের পিঠের উপর ছেঁড়া অংশটার দিকে একবার চাহিয়া বলিল, আচ্ছা এই পাথরগুলো দিয়ে কি হয়?

শিশুর মত হাসিয়া মামাবাবু বলিলেন, বুড়ো ছেলে মা, এ হচ্ছে আমার খেলাঘর দেখছিস না, খেলা করি,—কিন্তু বাঁদরটা কোথায় গেল ?

আবার রমলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, ও বাঁদরটার গলায় মুক্তার হার হলে, মা-লক্ষ্মী।

তাঁহার বিছানার পাশে মাথার কাছে একটি ফটোর দিকে রমলা ভক্তিদীপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে দেখিয়া মামাবাবু থামিয়া গেলেন, ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন, হাঁ, ওই হচ্ছে রজতের মা, ও বোনটা আজ যদি থাকত, তবে কি আজ—তাঁহার কথা আবার থামিয়া গেল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কত সুখ দিনের স্মৃতি-বিজড়িত করুণস্নিগ্ধ নয়নে ফটোটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমলা ধীরে ব্রোমাইড-এন্‌লার্জ্‌মেণ্ট ফটোটির দিকে অগ্রসর হইল। ফটোটিতে প্রথমেই চোখে পড়ে স্নেহোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি, চোখ দুইটির উপর প্রশস্ত ললাট প্রসন্নতা শান্তিতে ভরা, মুখখানি হইতে কি কল্যাণময় আনন্দদীপ্তি বাহির হইতেছে—সুখদুঃখময় সংসারের শান্তিমঙ্গলময়ী ভগবতী মহাশক্তির এ সৌন্দর্য্যময় প্রতিরূপ। সিঁথির সিঁদূর তেজোময় কল্যাণটিকার মত জ্বলজ্বল করিতেছে, হাতের সোনা দিয়া বাঁধানো শাঁখা তাঁহার নিষ্ঠা ও সেবার চিহ্ন।

রমলার মাথা আপনিই নত হইয়া আসিল, ধীরে সে করজোড়ে কাঠের ফ্রেমে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। যখন সে মাথা তুলিল, দেখিল, রজত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ছবির চোখ ও ঠোঁট যেন নড়িয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ চিরস্নেহময় মুখ হইতে স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল।

আবার দুইজনে যুক্তকরে ছবির কাছে মাথা ঠেকাইয়া বার বার স্বর্গ-

গত জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মামাবাবুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তিনি এই চিরপ্রিয় মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বজননীর আশীর্ব্বাদের মত প্রভাতের আলো ঘরখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

১৬

কলেজে লেক্‌চার দিবার সময় তুলসীবাবুর অমনোযোগিতা দেখিয়া ছাত্রেরা সেদিন সত্যই অবাক্ হইয়া গেল। সেদিন শেষের দুই ঘণ্টা ছুটি দিয়া তিনি সকাল সকাল বাড়ি ফিরিলেন। বাড়ি ঢুকিয়াই দেখিলেন, হাসি, জলঝরা ও ঝাঁটার শব্দে সমস্ত বাড়ি মুখরিত, সিমেণ্টের মেজে যেন এস্রাজের মত বাজিতেছে, গোপাল চৌবাচ্চা হইতে জল তুলিয়া দিতেছে, রজত ঢালিতেছে আর রমলা ঝাঁটা ঘষিতেছে। সিঁড়ি ধোয়া শেষ করিয়া তাহারা উঠান লইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় সম্মুখের বারান্দায় তুলসীবাবুকে আসিতে দেখিয়া রজত ও গোপাল প্রমাদ গণিল। বীজাণু ঘাঁটিয়া তুলসীবাবুর বীজাণু-বিভীষিকা ছিল, সব ধূলাতেই তিনি যক্ষ্মা বা কলেরা বা কোন ভয়ানক রোগের বীজাণু দেখিতে পাইতেন; বীজাণুর সঙ্গে বহুদিন বাস করিয়া তাহার শত্রুদের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। বেশি রোদে থাকা, বেশি হাওয়া খাওয়া, বেশি জল ঘাঁটা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না, তাঁহার ঘরের দরজা-জানলাগুলি যেমন প্রায়ই বন্ধ থাকিত তেম্নি নিজের দেহকেও সর্ব্বদা গলাবন্ধ র‍্যাপার মোজা ইত্যাদি দিয়া মুড়িয়া তিনি আপনাকে হাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া চলিতেন।

হাতের মোটা একখানি বই নাড়িয়া রজতের দিকে চাহিয়া মামাবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, হতভাগারা, কি হচ্ছে?

রমলা নর্দ্দমার মুখের আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়া সরাইতে সরাইতে তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিল, মামাবাবু, সিঁড়িটা এখনও শুকোয়নি, জুতো পায়ে দিয়ে যাবেন না।

রমলার দিকে চাহিয়া মামাবাবুর আর কিছু বলা হইল না। তাহার খোলাচুল মাথার ওপর ঝুঁটির মত বাঁধা, আঁচলটা কোমরে জড়ানো, সাদা শাড়ী ধূলায় জলের ছিটায় গেরুয়া রংএর ব্লাউজের সঙ্গে এক রংএর হইয়া গিয়াছে, লাল পাড়টা জলের উপর লুটাইতেছে, হাসিভরা চোখে প্রবলবেগে ঝাঁটা নাড়িতে নাড়িতে সে চারিদিকে এরূপভাবে জল ছিটাইতেছিল যে তাহার দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আজ সমস্ত দিন কি অপরিমিত ধূলা ও সুপ্রচুর জল মহানন্দের সহিত ঘাঁটা হইয়াছে, তাহার দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিলেই তাহা বোঝা যায়। তাহার কাজের কোন প্রতিবাদ করিবার বা বাধা দিবার মত শক্তি তাঁর রহিল না।

সবই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে মা, তুমি এবার উঠে এস, ওই জঞ্জাল ওই বাঁদরটাকে সরাতে দাও, বলিয়া সত্যিসত্যিই জুতা খুলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে উপরের ঘর হইতে মামাবাবুর ফ্লানেল-জড়ানো গলার শব্দ পাওয়া গেল, ওরে গোপাল, খানিকটা গরম জল করে নিয়ে আস্‌বি। এ জল তাঁহার খাবার জন্য নয়, তাঁহার পা গরম করিবার জন্য।

পরদিন সকালে তুলসীবাবু কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন, দেখিলেন একখানি গোরুর-গাড়ি বাড়ির সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল, খাট, বিছানা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, রকিং চেয়ার ইত্যাদি বোঝাই করা। এগুলি রামলাল দাদা তার বিবাহের যৌতুকরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মামাবাবুর আর কলেজ যাওয়া হইল না। তিনি বুঝিলেন, এইগুলি লইয়া তাঁহার ভাগ্নে ও ভাগ্নেবৌ কালকের মতই ধূলা ঘাঁটিবে, আর রজত

তাহার ছোট ঘরেই এইগুলি কোনমতে ঢুকাইয়া লইবে। তাঁহার দোতলার বড় ঘরটি রজতকে দিয়া তিনি নিচে নামিয়া আসিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গলির মোড় হইতে বারোজন কুলি ডাকিয়া আবার বাড়ি ফিরিলেন। বিনা অসুখে এই তাঁহার প্রথম কলেজ কামাই হইল।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বাড়িটির অনেকগুলি সুবিধা ছিল। তাহার সম্মুখেই খাবারের দোকান, মুদির দোকান, ডাক্তারের বাড়ি, চায়ের দোকান, পানের দোকান প্রায় পাশাপাশি ছিল। গলিটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকের বড় রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে; উত্তরদিকে বড় রাস্তায় পড়িলেই ট্রাম, বাজার, পোষ্টাফিস, পুলিসের থানা, উকীলের বাড়ি, আর দক্ষিণদিকে বড়রাস্তার মোড়ে গাড়ির আড্ডা, কাপড়ের দোকান, সেক্‌রার দোকান, মুটের আড্ডা।

বারোজন কালো যণ্ডা গুণ্ডার মত কুলি সমভিব্যাহারে মামাবাবু ঢুকিতেই রজত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ কি মামা! কি লুট হবে?

যা, তোর শ্বশুরবাড়ির দরওয়ানটাকে ভাল করে' খাওয়াগে, আর গাড়োয়ানটাকে খাওয়াতে ভুলিস্ না, বলিয়া একখানি পাঁচটাকার নোট তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া তিনি কুলি লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রমলা ঘরের জিনিষপত্র সাজাইতেছিল, অর্থাৎ ঘাঁটিয়া দেখিতেছিল, সহসা এরূপ কুলিসমেত মামাবাবুকে ঢুকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার হাতের টেইট্‌টিবউটা মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

এর শাস্তি, বলিয়া মামাবাবু হাসিয়া তাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন।

—বা, আমি তো জিনিষ গোছাচ্ছিলুম, এ কি, এরা!

এর—শাস্তি হচ্ছে, লক্ষ্মীমেয়ের মত ওই বারান্দার কোণে চুপ করে' বসে' থাক্‌বে, কিছু গোছাতে পার্‌বে না।

—বা।

—বা, টা, নয়, ওসব ধূলো ঘাঁটা চল্‌বে না।

—আচ্ছা, আপনি তো রোজ বাড়ি থাক্‌বেন না।

ধীরে সে চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিল। রজত আসিয়া মামাবাবুর ঘর ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কারণ দেখাইয়া তর্ক করিয়া ধমক খাইয়া চুপ করিল বটে, রমলা কিন্তু চুপ করিল না। বহুক্ষণ ঝগড়া করিয়া ঠিক হইল, মামাবাবু একতলায় যাইবেন না, রজতের ছোট ঘরে শুইবেন, তাঁহার জিনিষপত্র নিচের বড় ঘরে যাইবে।

নাকে রুমাল গুঁজিয়া একবার এঘর ওঘর করিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া ছুটাছুটি করিয়া কুলিদের ধমক দিয়া ধাক্কা মারিয়া কয়েকটি জিনিষ নাড়িয়া তুলসী-বাবু যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, রজত ও রমলা তাঁহার দুই হাত ধরিয়া চেয়ারে আনিয়া বসাইল, বলিল, মামা, তুমি এবার একটু চুপচাপ বস, আমরা একটু লাফাই চেঁচাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, শুধু দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিবি কোথায় কি রাখ্‌তে হবে, নিজের হাতে ধূলো ঘাঁট্‌বি না।

রমলা বলিল, কোথায় ধূলো? আর আপনার ওই ফ্লাস্ক, শিশি, ওরা যে ওসব ভেঙ্গে ফেল্‌বে।

সত্যই কোন ঘরে কিছুই ধূলা ছিল না, পূর্ব্বদিন রমলার ঝাঁটার স্পর্শে সমস্ত বাড়ি নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছিল।

আচ্ছা, শুধু আমার ফ্লাস্ক্‌, শিশিগুলো তোরা সরা, বলিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার উঠিয়া কুলিদের সঙ্গে চেঁচাইতে শুরু করিলেন।

রমলা বলিল, মামাবাবু, আপনার এই বইগুলো না হয় আমাদের ঘরেই রইল।

তুলসীবাবু তাঁহার বৃহৎ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, না, না, তা কি হয়, ও আমার চাই, ওসব বইয়ের আলমারি আমার শোবার ঘরে যাবে।

প্রেমিক যেমন তাহার প্রিয়ার মুখ বা ছবি না দেখিয়া সমস্ত দিনের কাজের শেষে শান্তিতে শুইতে পারে না, তেমনি এই বইয়ের আলমারি-গুলি চোখের সম্মুখে না দেখিলে, তুলসী-বাবুর রাত্রে নিদ্রা হইবে না। প্রত্যেক বই যেন তাঁহার পরিচিত বন্ধু, চোখ বুজিয়া তিনি আলমারির কোথায় কোন্ বই আছে বলিয়া দিতে পারেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর দেহ স্পর্শ করে তিনি তেমনি রোজ একবার বইগুলির উপর হাত বুলাইতেন। এ স্পর্শের আনন্দ গ্রন্থকীটেরাই জানে।

পাঁচটি বইয়ের আলমারি ও শোবার খাটে টেবিলে রজতের ছোট ঘর ভরিয়া গেল, বাকী আলমারিগুলি নিচে পাঠাইতে হইল। ঘরের পাশের বারান্দা চাটাই চট দিয়া ঘিরিয়া একটা ঘর তৈরী করা হইল, সেখানে টেবিলে ভূতত্ত্ববিদ্যার পাথরগুলি রহিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে কিছু ক্ষতি হইবে না। পাশের ছোট ঘরে তুলসী-বাবুর বাকী জিনিষগুলি কোনমতে গুছান হইল।

রজতের নতুন বড় ঘরটিতে কিরূপ-ভাবে জিনিসপত্র গোছান হইবে তাহা লইয়া এবার তর্ক বাধিল। রজত বলিল, আজ যেমন করে, হোক রাখা যাক, পরে সাজিয়ে নেওয়া যাবে। রমলা কিন্তু থাকিবার ঘরকে গুদাম-ঘর বা আসবাবের দোকান করিয়া রাখিতে সম্মত হইল না। আর একদিন যে তাহারা পুনরা ঘাঁটিবে তাহাতে তুলসী-বাবু আপত্তি জানাইলেন। রমলা ঘর সাজাইবার ভার লইল। রাস্তার দিকে পূর্ব্ব-মুখে ঘরটির চারিটি জানলা, সিঁড়ির সামনে একটি দরজা আর বারান্দার

দুইটি জান্‌লার মধ্যে একটি দরজা। নতুন খাটটা উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিল। খাটের পাশে রাস্তার দিকের জান্‌লার কাছে ড্রেসিং টেবিল আর তাহার উল্টাদিকে কাঁচওয়ালা কাপড়ের আল্‌মারি রহিল। সে আল্‌মারির পরেই বারান্দার দিকের দরজা, সেই দরজা ও জান্‌লার ফাঁকে রজতের ছবির বই ও নভেলে ভরা ছোট আল্‌মারি রহিল। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া আল্‌না, পূর্ব্ব কোণে লিখিবার টেবিল চেয়ার ও তাহার পাশে সোফা রাখা হইল। মাঝে খানিকটা জায়গা ফাঁক রাখা হইল, মাদুর পাতিয়া বেশ বসা যাইবে। বাকী জায়গাটুকু একটা গোল সাদা মার্ব্বেল টেবিল ঘিরিয়া রকিং চেয়ার, ইজিচেয়ার ও কোচে ভরিয়া গেল। চেয়ারে বসিয়া দুলিতে রমলা খুব ভালবাসে বলিয়া তাহার দাদা রকিং চেয়ারখানি বিশেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইজিচেয়ারটি রজতের অতি পুরাতন বন্ধুর মত, এখন ছারপোকাসমাকুল হইয়া কতদূর আরামের তাহা বলা শক্ত।

আস্‌বাবপত্র গুছাইয়া রমলা ঘরের দেওয়াল হইতে নানা ভঙ্গীর মেমদের চিত্রসম্বলিত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন ও ক্যালেণ্ডারগুলি টান মারিয়া ফেলিতে লাগিল।

রমলা বলিল, আচ্ছা, আর্টিষ্টের ঘরে এসব ছবি রাখতে লজ্জা হয় না।

উচ্চ হাসিয়া রজত বলিল, আহা, jealous হও কেন, এখন আর কোন ছবির দর্‌কার হবে না।

যাও, বলিয়া মুখ রাঙা করিয়া রমলা ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

জিনিষপত্র সাজাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘর গোছান শেষ হইলে মামা-বাবু রমলার সাজাইবার শক্তির উচ্চপ্রশংসা করিয়া কুলিদের জন্য খাবার আনিতে দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। বিবাহের

ভোজটা কুলিরাই খাইয়া লইল। সম্মুখের খাবারের দোকানদার তাহার এরূপ খাবার বিক্রীতে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

মেঘছায়াঘন ক্লান্তবর্ষণ স্তব্ধ দিন সন্ধ্যার তীর পার হইয়া রাত্রির অন্ধকার পাত্রে অঝোরে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বারিধারা-মুখর তারাহীন রাত্রি, পথে পথে ঝোড়ো হাওয়া দুরন্ত শিশুর মত হাঁকিয়া বেড়াইতেছে, ছাদের উপর নর্দ্দমা দিয়া ঝিলিমিলি বাহিয়া গলি উচ্ছ্বসিয়া জল খলখল হাস্যে বহিয়া যাইতেছে, বন্ধ দরজা জানালা মাঝে মাঝে সজল বাতাসে যেন কোন প্রমত্ত পথিকের করাঘাতে কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঘরের কোণে একটি বাতির ম্লান শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রমলা দোলানো-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার পাশেই ইজিচেয়ারে একটি পাৎলা লেপ পাতিয়া রজত হেলান দিয়া শুইয়া পা নাড়িতেছিল। দুইটি চেয়ার ঘেঁসাঘেঁসি বসান, দুইজনের পা এক নীল শালে জড়ান। রমলার একখানি হাত রজতের মাথার উপর চেয়ারে, আর-একখানি হাত ইজিচেয়ারের হাতে। দু'জনেই স্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে রজত রমলার আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতেছিল আর তাহার চেয়ারটিতে মৃদু দোলা দিতেছিল। বাহিরের ঝোড়ো হাওয়ায় সমস্ত ঘরটিকে যেন মৃদু দোলা দিতেছে।

সমস্ত দিন ধরিয়া সাজানো এই আলোছায়াময় ঘরখানি যেন কি অপূর্ব্ব রহস্য, কি মাধুর্য্যময় স্বপ্নে ভরা। দুইজনে হাতে হাত জড়াইয়া ধীরে দুলিয়া কোন্ অজানা স্বপ্নের জাল বুনিতেছিল।

রজত মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, এই—

রমলা অতি মিষ্টি করিয়া বলিল, কি!

আবার দুইজনে চুপচাপ। রজত রমলার মুক্তকবরীর অলকগুলি চেয়ারের মাথা হইতে সরাইয়া ধীরে সাজাইতে লাগিল।

ঝড়ের রাতে বৃক্ষের নীড়ে দুই কপোত-কপোতীর মত তাহারা

মাথায় মাথা ঠেকাইয়া চোখ অর্দ্ধেক বুজিয়া বসিয়া রহিল। মামা-বাবু যে একবার নিঃশব্দে তাহাদের দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না।

রমলা অতি মৃদুকণ্ঠে কানে কানে বলিল, ওগো!

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল, কি গো!

আবার দুইজনে স্তব্ধ। এ যে বিনাপ্রয়োজনে অকারণে নামে ডাকার নেশার সুখে ডাকা।

বাহিরে বজ্রপাতের শব্দ হইল, বন্ধ জান্‌লার ফাঁক দিয়া বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল।

রমলা ধীরে বলিল, মামাবাবুর ওঘরে গিয়ে হয়ত কষ্ট হবে।

—তা হবে, কিন্তু উনি তো কিছুতেই শুন্‌লেন না।

—অমন মামা, তাই তুমি এমন হতে পেরেছ।

—আচ্ছা গো, আমার নিজের কোন গুণ নেই, সব ধার-করা জলের ছাট আস্‌ছে কি খড়খড়ি দিয়ে?

—একটু আসুক। দেখ, ঘরখানায় কয়েকখানা ছবি দিতে হবে কি বল?

—আমি তো জীবন্ত ছবি দিয়েই ঘর সাজিয়ে রেখেছি! তোমার যদি দর্‌কার হয় দিও।

—যাও!

—আচ্ছা, তোমার যে-ছবিখানা এঁকেছিলুম আছে তো?

—আছে, তা বলে সেখানা টাঙাতে দিচ্ছি না, না। দেখ, তোমার আঁকা কয়েকখানা ছবি আর কতকগুলো খুব famous ছবি কপি করে'—

—যেমন?

—যেমন, র্যাফেলের ম্যাডানো, লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসা'

ওয়াট্‌সের হোপ, আর টার্নারের দু'একখানা, আর দেখ, অজন্তার সেই 'মা ও মেয়ে'—

—বলে' যাও, বলে' যাও—

—আর তোমার একখানা Portrait by Artist Himself.

—বেশ, বেশ !

রজত রমলার গণ্ডে একটু আঘাত করিয়া বলিল, এই, একটু ওঠোনা, আমি একটু দুলি ।

—থাক্‌না, আবদার, নিজে এমনি একটা চেয়ার আন্‌লেই পার ।

—আচ্ছা, আমার যখন ভেল্‌ভেটে মোড়া চেয়ার আস্‌বে তুমি বসতে পাবে না ।

—দেখা যাবে ।

অতিস্নিগ্ধস্বরে রজত ডাকিল, রমু । এ নাম যেন সে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন আজীবন ডাকিয়া যাইতে পারে, তবু এ নামের অপূর্ব্ব অসীম মাধুর্য্য নিঃশেষিত হইবে না । রমলা কোন উত্তর দিল না, চেয়ারটা একটু কাৎ করিয়া ধীরে তাহার মাথাটা রজতের বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল । এ মুখ যেন সে বৎসরের পর বৎসর, জন্মের পর জন্ম অনন্ত যুগ ধরিয়া দেখিতে পারে, তবু নয়ন তৃপ্ত হইবে না, হৃদয় জুড়াইবে না ।

বাহিরের আষাঢ়ের আকাশ আরও মেঘঘন বিদ্যুৎবিদীর্ণ হইয়া বন্ধনহীন বারিধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । ঝড়ের হাওয়ায় পথের গাছগুলির মর্ম্মরে কে যেন উদাস সুরে গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, 'ভরা বাদর মাহ ভাদর ।' প্রথম যৌবনের কত বর্ষামুখর-রাতে বিদ্যাপতির এই গানটি রজত গাহিয়াছে । তাহারই সুর বারি-ঝরঝরে কানে বাজিতে লাগিল । পরিপূর্ণ অনন্তমিলনের মধ্যে কোথায় অসীম বিরহ রহিয়াছে । মন্দির তো পূর্ণ হইল, তবু অন্তরে যেন কে কাঁদিয়া ফিরিতেছে । বুকে

যাহাকে পাই, মনে হয়, তাহাকে তো সম্পূর্ণ পাই নাই, এ মিলন ক্ষণিক, এ ফাঁকি, এ বিরহের ব্যঙ্গরূপ। শিশুর জন্য মায়ের চিরচঞ্চল প্রাণের ভয়ের মত তাহার বুক দুলিয়া উঠিল, আবেগের সহিত সে রমলাকে আপন বক্ষে টানিয়া লইল।

আষাঢ়-নিশীথ-গগন হইতে অবিশ্রাম জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, মত্ত শিশুর মত বাতাস দিকে দিকে আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাতিটি পুড়িয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসিল।

১৭

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে।

কলিকাতায় সাহেব-পাড়ায় যতীনের সুসজ্জিত বাড়ির সুরম্য শুইবার ঘরে এক সোফায় মাধবী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ঘরটি অতি সুন্দর ভাবে সাহেবী ফ্যাসানে সাজান। কার্পেট-পাতা মেঝেতে মাধবী কিছুক্ষণ ঘুরিল, ইলেট্রিক আলোয় নীল সিল্কের আবরণ টানা ছিল, সেটা টানিয়া খুলিয়া দিল, বড় আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘড়ি দেখিল,- রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে।

যতীন অতি উগ্র রকমের সাহেব, চেয়ার-টেবিলে না বসিলে কোট-প্যাণ্ট্ না পরিলে বাঙ্গালি কখনও কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা লাভ করিবে না, শাক-চচ্চড়ি-ভাত ছাড়িয়া মাংস না খাইলে তাহার দেহ সুঠাম মাংসবহুল হইবে না, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা বরণ না করিলে জাতির পুনরুত্থান হইবে না, এই ছিল তাহার মত। বর্ত্তমান জগতে যে যন্ত্ররাজ বণিক-সভ্যতারাণীকে লইয়া রাজত্ব করিতেছেন, সে ছিল তাহারই এক মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি।

ধীরে দরজা খুলিয়া মাধবী পাশের ঘরে ঢুকিল। এক বড় সেক্রেটারীয়েট টেবিলের সম্মুখে গদিওয়ালা ঘোরান চেয়ারে বসিয়া স্লিপিং-সুট্ পরিয়া যতীন এক বড় খাতা লইয়া হিসাব দেখিতেছিল। ধীরে মাধবী টেবিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চেয়ারটা একটু ঘোরাইল। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া যতীন বলিল, আচ্ছা? তুমি এখনও শোওনি? যাও, যাও, শীগগির শুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে।

মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল। আ! দেখ-দেখি হিসেবটা গুলিয়ে দিলে! বলিয়া যতীন পাতার উপর হইতে আবার অঙ্কগুলি গুণিতে লাগিল। সে-পাতার হিসাব শেষ করিয়া যতীন মাধবীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, দেখ, আজ আমায় এ খাতাখানা চেক করে' রাখতেই হবে, পরশুর মধ্যে কোম্পানীর dividend declare করতে হবে। অনেক রাত— লক্ষ্মী মেয়ে, আর রাত জেগো না, শুতে যাও।

তাহার মুখের দিকে আর খাতার দিকে একবার স্থির নয়নে তাকাইয়া বক্রমধুর হাসিয়া কোন কথা না বলিয়া মাধবী ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন নিমেষের জন্য তাহার এই যাওয়ার সৌন্দর্য্য-গতির দিকে চাহিল, তাহার মধ্যে প্রেমতৃষিত বিরহী মানুষটি ক্ষণিকের জন্যে জাগিয়া বলিল, বন্ধ কর খাতা, ও হিসাব চিরজীবন থাকবে, কিন্তু এ বর্ষার রাত—

অমনি কর্ম্মগর্ব্বিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষটি দাবাইয়া উঠিল, সাবধান, don't be sentimental, কাজ আগে লভ্ পরে! বিরহী মানুষের কান্না অঙ্কের কালো দাগের মধ্যে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। পাইপ টানিতে টানিতে যতীন লিমিটেড কোম্পানীর dividendএর হিসাব কষিতে লাগিল।

মাধবী ধীরে শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পূর্ব্বদিকের জানলার সবুজ নীল ফুলভরা ক্রেটনের পর্দ্দাটা টানিয়া জানলা খুলিয়া পাশের কিংখাবে

মোড়া সোফায় হেলান দিয়া বসিল। বাহিরে তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ নিকষমণির মত কালো, চাপা আর্ত্তনাদের মত বাতাস কয়েকটি নারিকেল গাছ মর্ম্মরিত করিতেছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাইতেছে না, শুধু দীর্ঘশ্বাসের মত করুণ একটানা শব্দ। মাধবীর চক্ষে অশ্রু আসিল না, বক্ষে হতাশ্বাস উঠিল না, প্রদীপ্তনেত্রে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রায় ছয়মাস হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। এই ছয় মাসেই তাহার জীবনের সব স্বপ্ন ছুটিয়া গিয়াছে। কেন সে যতীনকে বিবাহ করিয়াছিল, আর্দ্র স্তব্ধ অন্ধকারে সে-কথা ভাবিতে চেষ্টা করিল। আপনার মনকে সে বিবাহের পূর্ব্বেও বুঝিতে পারে নাই, এখনও বুঝিতে পারিল না। কোন অজানা শক্তির হাতে সে যেন ক্রীড়নক, এ তিমির-রাত্রি পার করিয়া কাণ্ডারী কোথায় লইয়া যাইবে!

মাধবীর কাছে যতীন যখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, সে অসম্মতি জানাইয়াছিল। কিন্তু যতীন হার মানিল না, হার মানা তাহার স্বভাব নয়, সে মাধবীর পিতার শরণাপন্ন হইল। রমলা চলিয়া যাইবার পর যোগেশ-বাবুর মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। কোন কোন বিনিদ্র রাত্রে তিনি ভূতের মত বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতেন। এক সকালে দেখা গেল, যে-ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। কত অর্দ্ধরাত্রে মাধবী জাগিয়া শুনিত, পাশের ঘরে তাহার পিতা গোঁ গোঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছেন।

যোগেশ-বাবু বেশ বুঝিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাই এ বিবাহের প্রস্তাবে মাধবীর অসম্মতি থাকিলেও তিনি তাহাকে সম্মতি দিবার জন্য নানাপ্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন। মাধবীকে পিতার মতে মত দিতে হইল। কিন্তু একমাত্র

পিতার অনুরোধ বিবাহের কারণ বলা যায় না,—ইহার মধ্যে রজতের প্রতি একটু অভিমান ছিল, পিতার সঙ্গে বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপনের শ্রান্তি ছিল, নারীজনোচিত নবজীবনাস্বাদের ঔৎসুক্য ছিল, আর নবজাগ্রত তরুণীচিত্তের ক্ষুধাও ছিল। মাধবী বিবাহের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করে নাই, চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিত না। যেদিন সে বিবাহে মত দিল তারপর দিন হইতে দেখিল, যতীনকে সে সত্যই ভালোবাসিয়াছে। তাহার দেহ সুন্দর, তাহার সঙ্গ মধুর, তাহার বাণী সুখকর, তাহাকে ঘিরিয়া কি স্বপ্নরহস্যজাল বিজড়িত।

বিবাহের পর যতীন মাধবীকে কয়লার খনিতে লইয়া গেল। সেখানে প্রথম মাস সত্যই যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া গেল। সে যে কেমন করিয়া তাহার পূর্ব্বজীবন, তাহার পিতার অবস্থা ভুলিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে দিন কাটাইল তাহা ভাবিয়া সে নিজে বিস্মিত লজ্জিত হইয়া উঠিত। সকালে যতীনকে চা করিয়া দিতে, দুইজনে বসিয়া এক টেবিলে খাইতে সে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। তাহার গাম্ভীর্য্য মাঝে মাঝে ভাঙিয়া যাইত, রমলার মত সে চঞ্চলা কৌতুকময়ী হইয়া উঠিত। যতীন কাজে চলিয়া গেলে প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া বিরহিণী স্বপ্নের জাল বুনিত। দুপুরে আবার দুইজনে একসঙ্গে থাকার সুখ, কত মৃদু গল্প, শীত মধ্যাহ্নের রৌদ্রের দিকে সে চাহিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিত। সন্ধ্যা-বেলায় তাহারা প্রায় মোটর করিয়া বেড়াইতে বাহির হইত, উঁচুনিচু আঁকা-বাঁকা লালপথ ধরিয়া কত পথ চলিয়া যাইত, যতীনের পাশে বসিয়া তাহার মোটর চালনার কায়দা দেখিয়া তাহার বুক অসীম সুখে ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু এ স্বপ্নের ঘোর বেশিদিন রহিল না, মদের নেশার মত কাটিয়া গেল। নারীর সম্বন্ধে যতীনের ধারণা ছিল যে, নারী পুরুষের কাছে নেশার পাত্রের মত, সে যেন জীবনের কাজের মধ্যে জুড়িয়া না বসে।

সন্তান জন্মদান ও পালনের জন্য প্রকৃতি নারীকে সৃষ্টি করিয়াছে, এ গণ্ডী হইতে জোর করিয়া বাহির করিয়া প্রকৃতির এ অভিপ্রায় পুরুষ যেন ব্যর্থ না করে। বস্তুতঃ, শিকার করা বা মোটর হাঁকানোর মত, বিবাহ করাটাও যতীনের কাছে জীবনের একটা সখ মেটান মাত্র। শিকার-শেষের পর বন্দুকটা যেমন বাক্সে পুরিয়া রাখে, কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা থাকে না, তেমনি বিবাহের প্রথম মাসের পর যতীন মাধবীকে তাহার কলিকাতার বাড়িতে পাঠাইয়া দিল এবং নানা ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠির সঙ্গে প্রতিসপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি লিখিয়া খোঁজ লইত সে বাঁচিয়া আছে কি না।

কালো আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নিরেখা টানিয়া একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। মাধবীর মনটাও অমনি চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, হয়ত সব বিবাহে এইরকমই ঘটে, এইরূপ ক্ষণিক আনন্দ স্বপ্নমায়ার পর দীর্ঘ অবসাদ, শ্রান্ত জীবনভার। সত্যই তো উষার আকাশে আলোর হোলিখেলা কতক্ষণ থাকে, সে রঙের স্বপ্ন নিমেষে টুটিয়া যায়, সমস্ত দিন ধরিয়া বর্ণহীন তপ্ত জ্বালাময় আলোর দীপ্তি, তারপর স্নিগ্ধ অন্ধকারভরা রাত্রি আসে। সে মৃত্যুরাত্রির অতল কালো স্নেহের জন্য এখনও তাহার প্রাণ তৃষিত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু এ সজল অন্ধকার তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না, ইচ্ছা হইতেছিল জনহীন পথে মত্ত-বাতাসের সঙ্গে তামসী রাত্রে বাহির হইয়া পড়ে।

আর সত্যসত্যই তাহাদের বিবাহ যদি ভুল হইয়া থাকে! এ ভুল সংশোধন করিবার কি কোন উপায় নাই? তাহা হইলে কি সমস্ত জীবন দুইজন দুইজনকে ফাঁকি দিবে, প্রেমের ভণ্ড অভিনয় চলিবে আর,—আর তাহার ভাবিতে ভাল লাগিতেছিল না। ব্লাউসের ভিতর হইতে কাজী-সাহেবের চিঠিখানি বাহির করিল। কাজী-সাহেব তাহার নববিবাহিত জীবনের নানা সুখচিত্র নানা রংএ বর্ণনা করিয়া বহু

ফার্সী কবিতামণ্ডিত করিয়া এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার এই কল্পিত আনন্দগুলির কথা পড়িয়া তাহার ঠোঁটে এক ব্যঙ্গ হাসি খেলিয়া গেল। তারপর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। চিঠির সবশেষে কাজী-সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার পিতার মদের মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে, তিনি কিছুতেই তাঁহাকে দমন করিতে পারিতেছেন না। চিঠিটি বুকের ভিতর ফেলিয়া মাধবী আবার অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কি একখানি ইংরেজী নভেলে মাধবী পড়িয়াছিল, We marry only to develop ourselves. Why should we otherwise marry at all? আত্মার বিকাশের জন্যই বিবাহ, তাহা ছাড়া বিবাহের অন্য সার্থকতা কোথায়? আত্মার সে বিকাশের পথ এ বিবাহজীবনের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া সে খুঁজিয়া পাইবে? যে-প্রেমের আলোয় জীবন পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়া কল্যাণের বর্ণে, সেবার সৌরভে চারিদিক আনন্দিত করে, সে প্রেম,—ভাবিতে ভাবিতে সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পর্দা দিয়া জান্‌লা বন্ধ করিয়া আলোর পর্দাটা টানিয়া বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

যতীন যখন ঘুমাইতে আসিল, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। যতীন বিছানার কাছে আসিতে মাধবী গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, দেখ—

হুঁ, বলিয়া যতীন একপাশে শুইয়া পড়িল।

মাধবী গম্ভীরভবে বলিয়া যাইতে লাগিল, বাবার বড় অসুখ, ভাব্‌ছিলুম একবার যাব।

বেশ, যাওনা, বলিয়া যতীন চোখ বুজিল।

—দেখনা, এই চিঠিটা।

—আচ্ছা, যেদিন খুশি, কালই যেতে পার, বড় ঘুম পেয়েছে, বলিয়া যতীন ভাল করিয়া শুইল, কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রায় অসাড় হইল।

যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবীর যেন কেমন ভয় হইল, এ যেন কে

অপরিচিত। ধীরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া জান্‌লার কাছে আসিয়া বসিল। নয়নের কালো-তারার মত কালো আকাশ করুণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, শুধু ছেঁড়া মেঘের মাঝখানে একটি তারা জ্বলজ্বল করিতেছে। সেই তারার দিকে চাহিয়া সহসা মাধবীর মাকে মনে পড়িল। ছেলেবেলায় এক বর্ষারাত্রের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, অন্ধকারে সিঁড়িতে ভয় পাইয়া সে কিরূপে ছুটিতে ছুটিতে ঘরে ঢুকিয়া মার কোলে আশ্রয় লইয়া শান্তি পাইয়াছিল। সেই রকম কোন স্নিগ্ধ শীতল স্নেহময় ক্রোড়ের আশ্রয়ের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

বাহিরের অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল আর শূন্যঘরে ইলেকট্রিকের আলো আর মাধবীর দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল।

১৮

পরদিন রজত তাহার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। বন্ধু বলিতে তাহার এই একটিতেই ঠেকে। কিন্তু এই একটি বন্ধু লাভ করিয়াই সে জীবনে কৃতার্থ হইয়াছিল!

আমার এই বন্ধু আছে, এ ভাবিবার সুখ যে, কি অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা বন্ধুহীনেরা জানে না। পত্নীর প্রেমের জন্য পতিকে শঙ্কিত থাকিতে হয়, পুত্রের সেবার জন্য মাতার মনে সঙ্কোচ জাগে, ভাইয়ের ভালোবাসার জন্য ভাইয়ের মন দোলে, কিন্তু সত্যকার বন্ধুর দিকে চাহিলে কোন সংশয় থাকে না, তাহার চোখ দুইটি দেখিলে শ্রান্ত মন আশায় ভরে, তাহার মুখ দেখিলে ভগ্ন বুক আনন্দে দোলে, তাহার হাতের স্পর্শ পাইলে অমিত শক্তি লাভ হয়। ললিত ছিল রজতের এইরূপ বন্ধু, তাহাকে না ডাকিলে তাহার কোন আনন্দ পরিপূর্ণ হইত না।

সন্ধ্যাবেলায় রমলা একখানি বাসন্তী রংএর শাড়ী পরিয়া চেয়ারে
বসিয়া দুলিতেছিল আর গুনগুন গান করিতেছিল। রজত মেজেতে
মাদুরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুপচাপ বসিয়াছিল। সমস্ত দিন টিপটিপ
বৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন আকাশ একটু ফর্সা হইয়া কয়েকটি তারা দেখা
যাইতেছে। বৃষ্টি পড়ুক আর জোৎস্নাই উঠুক, তাহাতে নবদম্পতির
বিশেষ কিছু আসিয়া যাইতেছিল না।

বাড়ির দরজায় একটি ট্যাক্সি দাঁড়াইবার শব্দ হইতেই রজত উঠিয়া
দাঁড়াইল। একটু পরেই মুখভরা হাসি, দুই চোখ ভরা কৌতুক আর
দুই হাতে দুই বড় ফুলের বাস্কেট লইয়া তাহার বন্ধু প্রবেশ করিল।

রজত মৃদু হাসিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন ললিত, আর ইনি—

—বুঝ্‌তেই পারছি, বৌদিদিভ্যঃ নমঃ, বলিয়া ললিত রমলার পায়ের
নিকট ফুলের দুই ঝুড়ি নামাইয়া মাথা একটু নত করিল।

রজত বলিল, বৌদিদিভ্যঃ কি হে?

ললিত হাসিয়া বলিল, ওটা গৌরবে বহুবচন।

রমলা স্নিগ্ধ মুগ্ধ নেত্রে ললিতের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বন্ধু
যে এমন সুদর্শন তাহা সে ভাবে নাই। রজতের চেয়ে মাথায় একটু
ছোট হইলেও সে রজতের চেয়েও ফর্সা, দোহারা চেহারা, মুখখানি
বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রেমের স্নিগ্ধতায় ভরিয়া যৌবনের সুকুমার শ্রীতে মণ্ডিত,
ঠোঁট দুইটিতে হাসি যেন লাগিয়াই আছে, গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, পায়ে
পাম্পসু। সে ঢুকিতেই ঘর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ফুলের গন্ধ
না এসেন্সের গন্ধ তাহা রমলা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।
বস্তুতঃ ললিত সিল্কের পাঞ্জাবি ও পাম্পসু ছাড়া কিছু পরিত না, আতর
না মাখিয়া কোথাও যাইত না।

রমলা মার্শাল নীল গোলাপগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া
উঠিল, Lovely! কি সুন্দর গন্ধ।

ললিত রজতের দিকে হাসিমাখা চোখে কি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, Lovely ! নয় ?

রজত ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিল, রমলা মুখ রাঙা করিয়া লজ্জাবিস্ময়-জড়িত চাহনিতে ললিতের দিকে চাহিল। ললিত নিঃসঙ্কোচে রমলার দোলানো চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এক বড় কাগজের ঠোঙা ও এক গাদা বই লইয়া গোপাল প্রবেশ করিতেই রজত বলিয়া উঠিল, ও সব আবার কি আনা হয়েছে ?

ঠোঙা ও বইগুলি গোপালের হাত হইতে লইয়া ললিত বলিল, দেখ্ছেন বৌদি, ওর জন্যে এতদিন যে কত জিনিষ কিনেছি, আর আপনার জন্য কি বা আন্লুম, ওর jealousy হয়েছে।

রজত বলিল, বাপু, এই তো তোমার গুরু, আমি ভাব্ছিলুম না জানি কি একটা খুব দামী জিনিষ হাজির করবে—

ললিত বলিল, বেশ বলে' নাও, বলে' নাও, মার্কেটে গেলুম, ভাবলুম, খালি ফুল কি নিয়ে যাব, এখন ঠাণ্ডার দিন তাই কিছু চানাচুর—

রজত হাসিয়া বলিল, একটা বড় দেখে পুতুল নিয়ে এলে না কেন ? দেখি বইগুলো।

রমলা মধুর হাসিয়া বলিল, বেশ করেছেন, আমি মার্কেটে গেলেই আগে ডালমুট কিনি।

ললিতের হাত হইতে ঠোঙাটা লইয়া গোপালকে প্লেট আনিতে বলিয়া বইগুলির দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, ও-সব নভেল না কি ?

ললিত মৃদু হাসিয়া বলিল, কাজে লাগ্বে বৌদি, নভেল তো খালি রং-করা মিথ্যের ঝুড়ি, জীবনের সত্যিকথা পড়ুন। Marie Stopes, Ellen Keyর কতকগুলি বই, তাছাড়া Womanhood, Wise Wedlock, How to Love ইত্যাদি কতকগুলি বই।

বইগুলি নাড়িতে নাড়িতে রজত বলিল, এনেছ তো বইগুলি, আমি যা ভয় কর্‌ছিলুম! আচ্ছা, আমার স্ত্রীকে সাফ্রেজেট করে' তোমার কি লাভ বল তো?

ললিত হাসিয়া বলিয়া উঠিল, লাভ আমার, না তোমার? এই দেখ, দু'টো ফুলের মালা আন্‌তে ভুলে গেলুম।

রজত ঠোঁট মুচকাইয়া হাসিয়া বলিল, যাও, আর বেশি কবিত্ব কর্‌তে হবে না।

রমলা ধীরে বলিল, আচ্ছা আপনি না কি কবি, ভাল কবিতা লেখেন?

ললিত উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়া বলিল, হাঁ, হাঁ, ছোট বেলায় এক কবিতার বই ছাপিয়েছিলুম, তাও মার চুরির টাকায় বাবার বাক্স থেকে। সে বইয়ের কথা সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু কবি নামটি কেউ ভোলে নি। আচ্ছা, আমায় দেখে কি কবি বলে' বোধ হয়?

কৌতুকময় দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চাহিয়া রমলা হাসিয়া উঠিল।

রজত বলিল, ওগো তোমার পুডিংটা অনেকক্ষণ চড়িয়ে এসেছ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া ললিত বলিল, বেশ বেশ! পুডিং পোলাও!

আশ্চর্য্যের সুরে রজত বলিল, পোলাও কি হে?

হতাশের সুরে ললিত বলিয়া উঠিল, বা পোলাও নেই বুঝি?

রমলা মিষ্ট স্বরে বলিল, না, না, আছে আছে।

যেন আশ্বাস পাইয়া আনন্দিত হইয়া ললিত বলিল, কিন্তু শুধু পুডিং পোলাও হচ্ছে না, তার আগে কিছু গান চাই।

রজত বলিল, বল না তোমার গান গাইতে ইচ্ছা কর্‌ছে।

ললিত বলিল, সত্যি বৌদি', আজ মনে এমন আনন্দ হচ্ছে যে, আমারও গান গাইতে ইচ্ছে কর্‌ছে। এস্রাজটা কোথায়?

জিনিষপত্র নাড়ানাড়িতে এস্রাজটা নিচের ঘরে চলিয়া গিয়াছিল, রজত সেটি আনিতে গেল।

ললিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, রজতটা তো একটুখানি সরেছে, এই সুযোগে আমরা 'আপনি'টাও খসিয়ে ফেলি, কি বল?

রমলা সলজ্জ হাসিয়া বলিল, বেশ তো।

বাস্তবিক এই সুদর্শন হাস্যরসিক অকপট বন্ধুটিকে তাহার ভাল লাগিতেছিল।

ললিত ধীরে বলিল, দেখ, রজতের সব গুণ, শুধু একটা দোষ, ও যা করে একেবারে হিসেব না রেখে করে, যাকে ভালোবাসবে এমন বেহিসাবী ভালোবাস্‌বে, তাইতো ওর পাল্লায় পড়ে'—

রজত সেই সময়ে এস্রাজ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই সে তাহার হাত হইতে সেটি প্রায় ছিনাইয়া লইয়া রমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে রমলা বলিল, না, দেখুন, পুডিং সত্যিসত্যিই পুড়ে যাবে।

ললিত বলিল, যাক পুড়ে, তুমি একটু বাজিয়ে নাও।

রমলা একটুখানি এস্রাজ বাজাইয়া রজতের কোলে এস্রাজটা ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুট দিল।

খাওয়া উপরের ঘরেই হইল। রমলার ইচ্ছা ছিল টেবিলে খাওয়া হয় কিন্তু ললিত বলিল, না বৌদি, মেজেতে বসে' বেশ গল্প কর্‌তে কর্‌তে খাওয়া যাবে।

কিন্তু ঘরে দুইখানি বসিবার আসন। সেই দুইখানি আসন পাতিয়া দুই বন্ধুর খাবার সাজাইয়া রাখিতেই ললিত ক্রোধের ভান করিয়া বলিল, না বৌদি, এ হবে না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।

তারপর নিজের সিল্কের চাদরখানি পাট করিয়া মেজেতে পাতিয়া বলিল, নিয়ে এস তোমার খাবার বৌদি।

রমলা বলিল, আহা ওকি সিল্কের চাদরটা—

ললিত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, না বৌদি, এই চাদরের আসনে সে' আজ তোমায় খেতেই হবে, তুমি ভাব্‌ছ, চাদরটা ময়লা হবে, আমি াচ্‌তে দেব, মোটেই নয়, এই দাগধরা চাদর আমার বাক্সে তোলা থাক্‌বে, ়মি খাবার নিয়ে এস।

রজত একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, ওর সঙ্গে পারবে না বাপু, নিয়ে স তোমার খাবার।

সেই সিল্কের চাদরের উপর বসিয়া রমলাকে তাহাদের সঙ্গে খাইতে ইল। খাওয়ার সঙ্গে গল্প চলিতে লাগিল।

ললিত বলিতে লাগিল, দেখ বৌদি, চার্জ্জ্ আজ থেকেই বোঝাতে রু করি, যা দেখ্‌ছি একটি বোঝা ছিল, দু'টি হল।

রমলা বলিল, বুঝ্‌তে পারছি না কিছু।

ললিত হাসিয়া বলিল, বুঝ্‌তে পারছ না? সম্মুখে এই যে জীবটি দখছ, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমি এর বন্ধু হয়েছি, সুতরাং আমি ছি ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি, ব্যাঙ্ক, লিগ্যাল অ্যাড্‌ভাইসার, ওর হসাবের খাতা, চাবির থোলো—

রমলা হাসিয়া বলিল, আপাততঃ কোন পদ হতেই খালাস পাচ্ছ ়, resignation not accepted।

হতাশের মত অভিনয় করিয়া ললিত বলিল, বেশ,—কিন্তু পুডিংটা ারি সুন্দর হয়েছে, মেসের খেয়ে খেয়ে বুঝ্‌লে বৌদি, আ সে রান্না যদি কবার খাওয়াতে পারি বৌদি! তোমাকে কিন্তু মাঝে মাঝে এসে ালাতন করব বৌদি—

এত বৌদি বল্লে আমি কিন্তু হাঁপিয়ে উঠ্‌ব, বলিয়া রমলা মুখ রাঙা রিয়া হাসিয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইলে পান চিবাইতে চিবাইতে ললিত দুষ্টামিভরা হাসি

হাসিয়া বলিল, তা হলে আর disturb করতে চাই না, au revoir, গুড লাক্, সুইট ড্রিম—

রজত মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, না হে এত শীগ্‌গির কোথায় যাবে ?

ললিত বলিল, বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। তা এ ভরা-পেটে তো রাগ-রাগিণী চল্‌বে না, তাসের জোড়াটা বের কর।

রমলা বলিল, তিনজন যে।

তাতে কি, আমি মামাবা-বুকে ধরে' আন্‌ছি, বলিয়া ললিত মামাবাবুর ঘরের দিকে চলিল।

সত্যই ললিত গিয়া মামাবাবুকে ধরিয়া আনিল। তুলসী-বাবুর চরিত্রে এই মহাদুর্ব্বলতা ছিল, তাসখেলার লোভ তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেন না।

ললিতকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে গাধা, এতদিন ছিলি কোথায়, টিকি দেখ্‌বার জো নেই, রজত এসেছে তো অম্নি আসা।

মামাবাবুর কাছে তাসখেলার প্রস্তাব করিতেই তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, Hence thee Satan hence, এত রাতে আমায় লোভ দেখাতে এলি !

কিন্তু দুইবার বলিবার পরই তিনি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা মুড়িয়া ওভারকোট-গলাবন্ধ-র‍্যাপারমণ্ডিত হইয়া রজতের ঘরে তাস খেলিতে ঢুকিলেন।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা চলিল। খেলা শেষ হইলে যাইবার সময় ললিত বলিল, বৌদি, তোমাদের নতুন সংসারে কি সব জিনিষ লাগ্‌বে একটা লিষ্ট্ করে' রেখ কাল, ফুলদানি আর একটা স্পিরিট ষ্টোভের কথা ভুল না, যা ধোঁওয়া খাচ্ছিলে রান্নাঘরে। আর একটা পার্সিয়ান কার্পেট আনা যাবে, মেজেতে পেতে মুসলমানী কায়দায় খাওয়া যাবে।

আমি কাল বিকেলে ট্যাক্সি নিয়ে আসব, ঠিক থেক—তা হলে আজ—

রমলার স্নিগ্ধমধুর মুখের দিকে নিমিষের জন্য চাহিয়া ললিত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

আকাশের চাঁদ ও কালো মেঘে লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, নির্জ্জন স্তব্ধ জলসিক্ত নগরের পথ, গ্যাসের আলোগুলি প্রদীপের শিখার মত, অতি ক্ষীণ চাঁদের আলোয় চারিদিক ছায়াময়। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ললিত যখন মেসে ফিরিতেছিল তখন আপন মনের অবস্থা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বন্ধুর আনন্দে সুখ-মিলনে সে সত্যই আনন্দিত। তবু তাহার বক্ষের কোন্ বিরহী তরুণ হৃদয় মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মেসের ঘরে গিয়া আষাঢ়ের মেঘছায়াঘন রাত্রে তাহার ঘুম আসিল না, সব জানলা খুলিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া শেলী খুলিয়া পড়িতে বসিল।

১৮

ভাদ্রের স্নিগ্ধ দ্বিপ্রহর সুন্দর আলোয় উজ্জ্বল। শরতের আকাশের এক উদাস আহ্বান আছে, যেন কোন সুদূরের হাতছানি। নির্ম্মল নীলিমার দিকে চাহিয়া রমলা পিয়ানো বাজাইতেছিল। বর্ষাসঙ্গীত-মুখর দিনগুলিতে পিয়ানোর কথা কাহারও মনে হয় নাই, কিন্তু আকাশে বাতাসে যখন শরৎ ঋতুর স্পর্শ জাগিল, কালো মেঘের বেণী গুটাইয়া অবিশ্রাম বৃষ্টির গান বন্ধ করিয়া বর্ষা চলিয়া গেল, তখন ঘরটা যেন ফাঁকা ছোট বোধ হইতে লাগিল। তাই রমলা প্রায়ই পিয়ানো বাজাইতে বসে।

হাজারিবাগের বাড়ির প্রেমস্মৃতিভরা পিয়ানোটি যোগেশ-বাবু বিবাহের আশীর্ব্বাদরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পিয়ানো শুনিতে শুনিতে রজত সোফায় ঘুমাইয়া পড়িয়া কোন্ সুর-অলকায় চলিয়া গিয়াছিল। যখন জাগিয়া উঠিল, তাহার দুইচক্ষে কিসের স্বপ্ন জড়ান। এই নিষ্কলঙ্ক আকাশের আলো কাহার সমুদ্রনীল নয়নের চাউনি, স্তব্ধ বাড়িখানি ঘেরিয়া এই শরতের দুপুরের আলো অতি সূক্ষ্ম তন্তুময় ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি। জাগিয়া উঠিয়া রজত ঘরখানিতে ঘুরিতে লাগিল—এ যেন কোন রূপকথার রাজকন্যার পুরী, ঘরের কোণে কোণে তাহার স্বপ্ন বিজড়িত। ড্রেসিং-টেবিলের আর্সিতে তাহার চোখের দীপ্ত চাউনি ভাসিয়া উঠিল, এই দোলানো চেয়ারের গায়ে তাহার কেশের গন্ধ, এই বিছানা ভরিয়া তাহার দেহের সৌরভ, পিয়ানোর কাঠে তাহার হাতের স্পর্শ তাহার প্রাণের ছন্দ, ঝক্-ঝকে সিমেণ্টের মেজেতে তাহার চরণের আভাস, এই পাপোশের কোণে তাহার নাগরাজুতাটা পড়িয়া রহিয়াছে, বারান্দার রেলিঙের কাঠে তাহার লাল শাড়ী শুকাইতেছে, কোথায় সে! ধীরে স্বপ্নবিমুগ্ধের মত রজত পাশের ছোট ঘরে গেল,—ষ্টোভের উপর ফুটান দুগ্ধ চাপা দেওয়া, ঝাড়নটা ধূলা ঝাড়া শেষ করিয়া আন্‌লার এক কোণে বিশ্রাম করিতেছে, তাহার ঠোঁটের স্পর্শমাখান কাঁচের গেলাস ঠাণ্ডা জলে ভরা মাটির কুঁজোর উপর চাপা দেওয়া। পাশের ঘরে গেল, বইগুলি সাজান, জামাকাপড় গুছান, চারিদিকে তাহারই মঙ্গল-কর্ম্মরত সেবাকুশল হস্তের চিহ্ন, নিবিড় প্রীতির রূপ, গোপন প্রেমের স্পর্শ—কোথায় সে? ঘরের পর ঘর রজত রমলাকে খুঁজিতে লাগিল, তাহার হাসির রেখা, দেহের স্পর্শ, পদচিহ্ন প্রাণে আসিয়া বাতাসের মত ছুঁইয়া যাইতেছে, সে রঙীন স্বপ্নমায়ার মত সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রজত রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ওই যে জ্যোৎস্নাধৌত কাশফুলের মত সাদা আঁচল দেখা

যাইতেছে! এ কি দিব্য শ্রী! শিল্পী যেটুকু অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিল, প্রেম তাহা ভরিয়া দিয়াছে, শরতের কূলে-কূলে-ভরা নদীর মত, ধানভরা ক্ষেতের মত রমলার যৌবনশ্রী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ঝলমল কেশদল ছুঁইয়া রজত ধীরে বলিল,

Room after room . .
. I hunt the house through.
We inhabit together.

—কি, খুঁজেই পাওয়া যায় না যে?

যাও, দেখ্‌ছ মামার শার্টগুলি রান্না করছি, বলিয়া সাবানে সিদ্ধকরা শার্ট-রুমাল-ভরা কড়াটি উনান হইতে নামাইয়া ফাল্গুন-বাতাসের মত চঞ্চলপদে রমলা রজতের হাত ছাড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া পালাইল।

Escape me! never—Beloved! রজত তাহার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

চেয়ারে বসিয়া রমলা অতি মৃদু দুলিতে দুলিতে একখানি বই পড়িতে শুরু করিল। ঝুলিয়াপড়া চুলগুলি দোলাইতে দোলাইতে চেয়ারের কাঠে মাথা রাখিয়া মেজেতে বসিয়া রজত কপট হতাশের স্বরে বলিল, আমি যদি টুর্গেনিভের কোন একখানা নভেল হতুম।

স্বামীর মুখের দিকে স্নিগ্ধ নয়নে চাহিয়া রমলা বলিল, তা হলে কি হত!

রমলার হাতের চুড়িগুলি নাড়িতে নাড়িতে রজত উদাসভাবে বলিল, এখন তাহলে একজন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিত।

যাও, আচ্ছা কি পদ্য পড়বে বলছিলে, বলিয়া টুর্গেনিভের নভেলখানি মুড়িয়া রমলা চেয়ার হইতে নামিয়া স্বামীর পাশে মেজেতে বসিল।

না, না, তুমি টুর্গেনিভ পড়, বলিয়া রজত উঠিয়া বইয়ের র‍্যাক হইতে ব্রাউনিং টানিয়া বাহির করিল।

ওগো, এসোনা, বলিয়া রমলা রজতের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহার পাশে বসাইয়া, হাত হইতে ব্রাউনিংখানি কাড়িয়া লইল।

বইখানি খুলিতেই Love in a Life পদ্যটি চোখে পড়িল। এইটাই বুঝি অত গদগদ হয়ে আমায় বলা হচ্ছিল, বলিয়া রমলা পদ্যটি পড়িতে শুরু করিল।

বা, ব্রাউনিং বেশ পদ্য লিখ্‌তে পারে তো, বলিয়া সে পদ্যটি উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল।

রজত মুগ্ধনেত্রে একবার খোলা জানলা দিয়া বাহিরের আকাশের আলোছায়ার খেলা আর একবার ঐ প্রিয়ার অনুপম মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। ইহাকেই কি সে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পাইয়াছে আর হারাইয়াছে—এই প্রিয়াকেই কি সে কতরূপে কতবার যুগে যুগে অনিবার অনন্তলোকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছে ?

১৯

মাঘমাসের সন্ধ্যা। দৈত্যদলের দূষিত নিশ্বাসের মত কলের ধোঁওয়ায় সমস্ত আকাশ কালো, দুঃস্বপ্নের মত ধোঁওয়ার কুজ্মটিকা লালসা-ঈর্ষা-ফেনিল নগরের উপর আতঙ্কের মত চাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু রজতের ছোট ঘরখানি যেন এই নগরের বাহিরে, এই ধন ও ভোগতৃষ্ণার চির-উদ্বেলিত সাগরমধ্যে কোন্ প্রেমস্বপ্নের দ্বীপের মত। তাই ললিত মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ নগরজীবনে শ্রান্ত হইয়া এই প্রীতিস্নিগ্ধ নীড়ে আশ্রয় লইত। ধীরে ধীরে সে আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইল, দেখিল রজত দোলানো চেয়ারে বসিয়া আছে, তাহার গা ঘেঁসিয়া কোলেতে মাথা ঠেকাইয়া রমলা নিচে মেজেতে বসিয়া হাড়ের কাঠি দিয়া লালপশমের এক খুব ছোট মোজা বুনিতেছে, ললিত যে ময়ূর-আঁকা সবুজ কার্পেট

তাহাদের উপহার- দিয়াছে তাহারই উপর রমলা সুন্দর পা দু'খানি ছড়াইয়া বসিয়া আছে, কার্পেটের এক পাশে মামাবাবুর জন্য বোনা পশমের গলাবন্ধ আর একটা কাঁথা পড়িয়া রহিয়াছে। রজতের কোলে রমলার চুলগুলির কাছে এক ঠোঙা চীনেবাদাম, রজত মাঝে মাঝে চীনেবাদাম ভাঙিয়া রমলার মুখে দিতেছে আর একখানি বই পড়িয়া শোনাইতেছে। দূর হইতেও ললিত বইখানি চিনিল, ওই সচিত্র ব্লুবার্ডখানি সে দুই বছর আগে রজতকে উপহার দিয়াছিল। তাহাদের মিষ্ট কথাবার্ত্তা কানে আসিল।

—ওগো, না, তুমি খালি বাদাম খাচ্ছ, একটু পড়্ছ না।

—বেশ, ভেঙে ভেঙে দিচ্ছি কিনা! বেশ, পড়্ছি, আর কিন্তু বাদাম পাচ্ছ না।

—বা পড়্তে পড়্তে বুঝি ভাঙা যায় না?

—হাঁ, ভাঙা যায়, কিন্তু খাওয়া যায় না তো।

—আচ্ছা, বেশ, তারপর কি হল, পড়।

রজত ব্লুবার্ডের The Kingdom of the Future দৃশ্যটা পড়িয়া শোনাইতেছিল। রমলার মাথায় হাত রাখিয়া সে বলিল, শোন, সেই যে খোকাটা বল্লে না, আমি শীগগির জন্মাব, সে বল্‌ছে, they tell us that the mothers stand waiting at the door—they are good, aren't they!

রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষালতার মত রমলার গণ্ডে আঙুল দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া রজত বলিল, কি, aren't they!

রমলা তাহার ভাবী সন্তানের জন্য যে মোজা বুনিতেছিল, কাঁথা সেলাই করিতেছিল তাহারই দিকে স্নেহস্নিগ্ধনয়নে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রজত পড়িতে লাগিল, Tyltyl বললে Oh, yes! they are

better than anything in the world ! And the grannies too ; but they die too soon.

পড়িয়া মুখ তুলিতেই ঘরের কোণে আপন মাতার ফটোখানি চোখে পড়িতে রজত আর পড়িতে পারিল না। রমলার মাথাটা একটু টানিয়া লইয়া দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, শুধু হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখা মৃদু কাঁপিতে লাগিল।

রজত আবার পড়া শুরু করিল। রমলা আর বুঝিতে পারিল না, সে অতি আদরের সহিত একহাতে পশমগুলি ধরিয়া আর এক হাতে রজতের হাত ছুঁইয়া কোন মায়াস্বপ্নের ঘোরে শুনিতে লাগিল। মায়ের প্রাণের রং দিয়া মায়ের বুকের অগাধ স্নেহ দিয়া রচিত, আশা স্বপ্ন নিয়া গঠিত এই অজাতশিশুদের স্বর্গলোকের কথা শুনিতে শুনিতে মন শঙ্কায় আশায় দুলিয়া উদাস মধুর হইয়া উঠিতেছিল। সে নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল, এক খোকা বলিতেছে—এই দেখ নীলশিশিভরা ওষুধ, এই আমি পৃথিবীতে নিয়ে যাব, এই খেলে মানুষের জীবন বেড়ে যাবে। আর এক খোকা বলিতেছে, দেখ,আমার এই যন্ত্রটা, এ ঠিক পাখীর মত ওড়ে। টিল্‌টিলকে তাহারা নিজেদের শক্তি সম্পদ দেখাইতে ব্যস্ত।

শুনিতে শুনিতে রমলার মন কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। তাহার বুকে যে শিশুমানিকটি আসিবে, সে কি আলোকপ্রদীপ জ্বালাইয়া আসিতেছে? কি নবশক্তি কি নবসম্পদ সে দেশকে মানবকে দান করিবে তাহার খোকা! সে কে? the second child না fourth child না the little pink one যে পৃথিবীতে আসিয়া সব অসত্য-অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া অত্যাচারের যুগ শেষ করিয়া দিবে, না সে the little red haired one, he is to conquer death, সে পৃথিবীর মৃত্যুলোকের পারে অমৃতলোকের খবর আনিবে! তাহার খোকা কেমন হইবে?

রমলার প্রথম সন্তান যে খোকাই হইবে, এ বিষয়ে রমলার মনে কোন সন্দেহ জাগিতেছিল না।

ললিত দরজার আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধের মত এই সুখদৃশ্য দীপ্তচক্ষে দেখিতেছিল, কথাগুলি যেন পান করিতেছিল। এই দৃশ্যটি পড়া শেষ হইতেই সে আর ঘরে ঢুকিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বন্ধুর সুখে তাহার অন্তরে সুখ ভরিয়া উঠিল বটে, তবু তাহার মন একটু উদাস! পথে বাহির হইয়া একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়া গড়ের মাঠের দিকে হাঁকাইয়া দিতে বলিল।

নগরের উপর ধোঁওয়ার বসর উত্তরীয় টানা, তাহাতে দুই পাশের দোকানের পথের আলো মণিমাণিক্যের মত ঝলমল করিতেছে। জন-স্রোত রথস্রোত উন্মত্ত জীবনস্রোত এই দূর অন্ধকারে কোন্ অলক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে পৃথিবীকে দেখিয়া শিশুদের আনন্দজয়ধ্বনি মোটরের ঝকঝকে তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল।

The Earth! The Earth! How beautiful it is! How bright it is! How big it is!

এই পরম সুন্দর উজ্জ্বল বৃহৎ পৃথিবীর দিকে তাহার প্রাণের বিজন ঘরের দুয়ার খুলিয়া কোন্ বিরহিণী নারী বাহির হইয়া আসিয়া কি স্বপ্নের আশায় অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছে!

রমলা তখন আশা আনন্দ আশঙ্কায় দুলিয়া তাহার অজাত স্বপ্ন-শিশুটিকে কত রূপে কত রঙে ভাঙিতে গড়িতেছিল। রজত যে এ দৃশ্য শেষ করিয়া নূতন দৃশ্য পড়িতেছে তাহা তাহার খেয়াল রহিল না। অজাতশিশু-হৃদয়ের প্রশ্নটি জাগিতে লাগিল, আচ্ছা মায়েরা না কি আমাদের জন্যে পথ চেয়ে থাকে, তারা খুব ভাল, সত্যি?

* * * * * *

ফাল্গুন মাসের জ্যোৎস্না,—দোলপূর্ণিমার রাত্রি। পিয়ানোর পাশে দুইজন চুপচাপ বসিয়া।

রজত ধীরে বলিল, ওগো একটু বাজাও না।

পিয়ানো খুলিয়া এক মিনিট বাজাইয়া রমলা থামিয়া গেল।

রজত পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, কি হল!

—ভাল লাগ্‌ছে না। ওগো, আলোটা নিভিয়ে দাও না।

রজত আলো নিভাইয়া দিল।

উচ্ছ্বসিত হইয়া খোঁপার চুল খুলিয়া ফেলিয়া রমলা বলিল, বা কি সুন্দর জ্যোৎস্না, ওদিকের জানলাটা খুলে দাও, ও দরজটাও। ওগো এ জানলাটা একটু বন্ধ করে' দাও না।

রজত দরজা জানলা খুলিয়া দিল।

রমলা তাহার শাড়ীর আঁচল মেজেতে লুটাইয়া বলিল, একটু অন্ধকারের পাশে আলো, কি সুন্দর দেখাচ্ছে—এইখানে এসে বস।

রজত রমলার পাশে আসিয়া বসিল।

পিয়ানোটা খুলিয়া রমলা বলিল, ওগো আলোটা একটু জালো না, স্বরলিপিটা দেখি।

রজত উঠিয়া বারান্দা হইতে একটি লণ্ঠন উস্কাইয়া আনিতেই রমলা যেন ব্যথিত হইয়া বলিল, না, না, আলো চাই না, নিয়ে যাও, কি সুন্দর জ্যোৎস্নায় ঘর ভরা ছিল।

আব্‌দারে খুকী হয়ে উঠ্‌লে যে আজ, বলিয়া হাসিয়া রজত আলো কমাইয়া বারান্দায় রাখিয়া আসিল।

রমলা জ্যোৎস্নার মত সমস্ত ঘরে হাসির ঢেউ তুলিয়া বলিল, বেশ, তোমার কি, আলো সব নিভিয়ে দাও। রমলা গানের এক লাইন গাহিয়া উঠিল—নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

রজত বলিল, সব গানটা গাও না।

—না। আ lovely! ওই লাল ফুলটা দাওনা।

টেবিলের উপর ললিতের-আনা ফুলের ঝুড়ি হইতে রজত একটা বড় লাল ফুল তুলিয়া রমলার হাতে দিল।

আঃ কিছু গন্ধ নেই, ওই সাদাটা দাও, বলিয়া রমলা লাল ফুলটা একবার শুঁকিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। সাদা ফুলটি দিতেও রমলা একবার নাকের কাছে ফুলটি তুলিয়া—গন্ধ নেই, বল্লুম লাল গোলাপটা দাও, বলিয়া সাদা ফুলটি রজতের কোঁক্ড়ান চুলের মধ্যে ছুড়িয়া দিল।

রজত দুইটি গোলাপ বাছিয়া রমলার হাতে দিয়া পাশের চেয়ারে এলাইয়া বসিল। ভাবখানা, আর সে কোন কাজ করিতে পারিবে না—

রমলা নিজের চেয়ার রজতের চেয়ারের কাছে টানিয়া ধীরে বলিল, আচ্ছা একটা গান গাও না।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ী পরিহিতা জ্যোৎস্না গৌরী রমলার দিকে রজত মুগ্ধ নয়নে চাহিল, এ কোন মায়াবিনী রঙীন প্রজাপতি প্রাণের গুটি কাটিয়া বাহির হইয়াছে।

ধীরে বলিল, কি?

তার পর রজত গান ধরিল—আজ্ রজনী হাম—

রমলা গানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, থাও, মামাবাবু রয়েছেন পাশের ঘরে। কি গল্প বল্‌বে বল্‌ছিলে।

গান থামাইয়া রজত গল্প শুরু করিতেই রমলা ফুলগুলি দোলাইয়া বলিল, আচ্ছা, অন্য সময়ে বোলো বাপু, তোমার বালিশটা কোথায়?

রজত উঠিয়া দাঁড়াইতেই সে রজতের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিল, থাক, থাক, খুঁজ্‌তে হবে না। In such a night as this—

রজত তাহার হাত হইতে লাল ফুলটা লইয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বল না সবটা।

—পারব না যাও। বল্লুম আলোটা আন, পিয়ানো বাজাই!

—সত্যি বাজাবে ?

—না, না, এমন জ্যোৎস্না, এখন আলো আন্‌তে ইচ্ছে করে ?

—ওগো একটু বাজাও।

রজতের দিকে অতি মিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রমলা হাসিভরা মুখে উঠিল, ঘরের কোণ হইতে সেতার বাহির করিয়া আনিয়া রজতের পায়ের কাছে মেজেতে বসিল।

জ্যোৎস্না-বীণার অলখ তারে যে অনাহত সঙ্গীত বাজিতেছিল তাহারই সুরগুলি সেতার ঝঙ্কারে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল।

রমলার কেশে রঙীন শাড়ীতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার আলোয় তারাগুলি ঝিকমিক করিতেছে, অদৃশ্য পরীর মত সুরগুলি আলোছায়াময় ঘরে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের তালে তালে রমলার আঙ্গুলগুলি নাচিতেছে, মুখপদ্ম টলিতেছে।

রজত ধীরে চেয়ার হইতে নামিয়া রমলার পাশে আসিয়া বসিল। জ্যোৎস্নার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দখিন বাতাসে ফুলগুলি দুলিতে লাগিল। তাহাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরের উপর প্রেম-দেবতার আনন্দময় প্রসন্নদৃষ্টিতে চিরজাগ্রত রহিল।

২০

দ্বিতীয় বৎসর।

সমস্ত দিন বৃষ্টির পর রাত্রির আকাশ নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কয়েকখানি কালো মেঘ উত্তর দিকের নারিকেল-গাছগুলির উপর জমিয়া রহিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় তারাগুলি জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। রাত কত হইবে রজতের তাহা খেয়াল ছিল না, অতি চঞ্চল হইয়া সে

বারান্দায় বেড়াইতেছিল আর মাঝে মাঝে ঘরের বন্ধ দরজার কাছে আসিয়া কান পাতিয়া শুনিতেছিল।

গির্জ্জার ঘড়িতে রাত দুইটা বাজিল, সে চমকিয়া উঠিল, এই বর্ষার স্নিগ্ধরাত্রে বাহিরেও তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছিল। একবার একটু জানলা ফাঁক করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, দিদিমা।

এক প্রৌঢ়ার স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি শুতে যাও ভাই, নাত-বৌ বেশ ভাল আছে, কোন ভয় নেই।

এই প্রৌঢ়া মামাবাবুর দূরসম্পর্কীয় এক বিধবা পিসি, রমলার সন্তান-সম্ভাবনায় তাঁহাকে আনা হইয়াছে। তিনি প্রথমে আসিয়া বাড়িতে খেরেস্তানী ব্যবস্থা দেখিয়া সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পরিচয়েই রমলা তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইল এবং পরের দিন নূতন উনান, হাঁড়ি আর এক জোড়া কেটে কাপড় আসিতেই তিনি থাকিয়া গেলেন।

ধীরে জানলা বন্ধ করিয়া রজত বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসিল, মেঘের আড়ালে চাঁদ লুকাইয়া গেল, তারাগুলি যেন কোন্ অজানা দেশের মা-হারা শিশুদের চাউনি। একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ কানে আসিল। রজত বারান্দায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল, বারান্দার পাশের দরজা দিয়া সে ঘরে ঢুকিল। মেজেতে বিছানায় রমলা শুইয়া ছিল, তাহার মাথার কাছে দিদিমা বিনিদ্রনয়নে বসিয়া, কোণের অন্ধকারে ধাত্রী নিদ্রা যাইতেছে।

ভীত করুণ নয়নে রজত দিদিমার প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া যেন একটু আশ্বাস পাইল, দিদিমা তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, কিন্তু সে পারিল না। ধীরে রমলার পাশে আসিয়া একটু নিচু হইতেই রমলা চোখ মেলিয়া চাহিল। চিরপ্রিয় চিরসুন্দর এ মুখখানি রজতের

কাছে অতি অপরূপ লাগিল, এ শ্রী যেন কখনও সে দেখে নাই। রমলা তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, লজ্জা-শঙ্কা-আনন্দ-জড়িত সে হাসির উপমা নাই, সে মধুর করুণ হাসি কোন্ অপূর্ব্ব আনন্দের আভায় বেদনাস্থন্দর মুখ মণ্ডিত করিয়া তুলিল। রজতের হাত যন্ত্রচালিতের মত রমলার এলায়িত হাতে গিয়া ঠেকিল, আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়া সে হাত-খানি দৃঢ়ভাবে ধরিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না।

পিসিমা এমন কাণ্ড তাঁহার সাত জন্মেও দেখেন নাই, তিনি প্রথমে একটু বিরক্ত হইয়া তারপর ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করিয়া মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া সরিয়া বসিলেন।

রমলার মত রজতের বুক আশঙ্কা আনন্দে দুলিতেছে, সে যদি রমলার যন্ত্রণার ভাগ লইতে পারিত, তাহার সহ্য করিবার শক্তি বাড়াইতে পারিত। অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, কষ্ট হচ্ছে, রমু?

না, বলিয়া রমলা আবার অতি মৃদু হাসিল। এই বেদনা তাহার দেহে মনে অসীম অসহনীয় সুখের মত; স্বামীর পাশে সব সহ্য করিবার শক্তি তাহার আছে। ধীরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ধাত্রী জাগিয়া উঠিল। রজত অতি ধীরে বলিল, কোন ভয় নেই, রমু। কথাগুলি তাহার জিহ্বায় জড়াইয়া গেল, সে ঘরে থাকিতে পারিতেছে না। রমলা বড় অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া মেঘতারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মন দুলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে মাথা নত হইয়া আসিল, হাত দুইটি যুক্ত হইয়া আসিল, যিনি তাহাদের প্রেম-জীবনের চিরজাগ্রত দেবতা তাঁহারই উদ্দেশে অন্তরে আকুল প্রার্থনা উঠিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে সে কখনও ভাবিতে বসে নাই, ভাবিবার দরকার বোধ করে নাই; আজ সব তর্ক সন্দেহ নিমেষে দূর হইয়া গেল, চির-

আশ্রয় চির-মঙ্গল সৃষ্টির দেবতার প্রতি প্রার্থনা উঠিল—বল দাও, শক্তি দাও, রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর। এই তাহার যৌবন-জীবনের প্রথম প্রার্থনা।

রমলার করুণকণ্ঠ আবার রজতের কানে আসিল। সে আর প্রার্থনা করিতে পারিল না। যেন কোন মানুষের সঙ্গ আশ্রয় চাই, একা থাকিতে সে পারিতেছে না। মামাবাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া রজত দেখিল, সে ঘরেও আলো জ্বলিতেছে। সহসা দরজা খুলিয়া মামাবাবু শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন। দুইজনে চুপ করিয়া বারান্দার দুই কোণে দাড়াইয়া নিচের উঠানের অন্ধকারের দিকে আর আকাশের তারালোকের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

রজত বুঝিতে পারিল রমলার অস্থিরতা বাড়িতেছে! সহসা তাহার মনে হইল, ডাক্তার ডাকা দরকার। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ধাত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, ডাক্তার ডাকতে হবে? রমলার দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।

ধাত্রী বলিল, ডাকতে পারেন।

চকিতপদে সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, নিচে হইতে বারান্দায় মামার কালো মূর্তি দেখিয়া শুধু বলিল; ডাক্তার।

এ বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহার মন যেন একটু শান্ত হয়।

ডাক্তারের বাড়ি গলির মোড়ে। তবু এইটুকু পথ তাহার যেন ফুরাইতেছিল না, স্তব্ধ-মৃদু-গ্যাসালোকিত পথ, পথ যেন শেষ হয় না। তারপর কড়ানাড়া, দরজা ঠেলা, চেঁচামেচি, চাকরের সঙ্গে বকাবকি, ডাক্তার-বাবুকে জাগান, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা—এ-সব কাজ সে যেন স্বপ্নাহতের মত করিয়া গেল, যেন কত দীর্ঘ রাত্রি।

ডাক্তারকে লইয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া রজত দেখিল, মামাবাবু দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ তিনি বারবার সিঁড়িতে ওঠানামা করিতেছিলেন। তিনজনেই চুপচাপ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া রজত ঘরে ঢুকিল। মামাবাবুর মনে পড়িয়া গেল তাঁহার গায়ে গেঞ্জি ছাড়া কিছু নাই, তিনি তালপাতার মত কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের ঘরের দিকে ছুট দিলেন।

ধাত্রীর সহিত কয়েকটি কথা কহিয়া ডাক্তারবাবু রজতকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। রমলার মধুর করুণ চাউনি আবার চোখে পড়িল। রজতের সত্যই কান্না পাইল, কেন সৃষ্টি এত বেদনায় ভরা! আপনাকে কোনমতে দমন করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া এই ভাবী পিতা জগতের চিরজাগ্রত পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল রজতের তাহা হুঁস ছিল না, বস্তুতঃ সময় সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল। গির্জ্জার ঘড়িতে চারিটা বাজিল, রজত চমকিয়া উঠিল। ধূসর আলোয় আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে, সম্মুখে যে তারাটি দপ্‌দপ্‌ করিয়া জলিতেছিল, তাহা নিভিয়া গেল।

ট্যাঁ, ট্যাঁ,—উষার আলোর সঙ্গে একটি সকরুণধ্বনি, নবজাত শিশুর প্রথম কান্না, তাহা যেমন করুণ তেম্নি মিষ্টি; স্তব্ধ অন্ধকার বাড়ি রণিত করিয়া উষার আকাশে সে কান্না ছড়াইয়া গেল।

রজত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া চমকিয়া চেয়ার হইতে উঠিল, পা টিপিয়া টিপিয়া জান্‌লার কাছে গেল, খড়খড়ি তুলিয়া দেখিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না। আবার সেই কান্নার শব্দ, এ যেমন মধুর তেম্নি ঝোড়ো হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের মত। তাহার বুক দুলিতে লাগিল।

কম্পিতকণ্ঠে রজত বলিল, কি ডাক্তার-বাবু?

ডাক্তার-বাবু ঘর হইতে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে? সেই গম্ভীরকণ্ঠ শুনিয়া রজতের ভয় হইল—কি হয়ে গেছে? রমলা! না, না, অসম্ভব।

করুণকণ্ঠে আবার রজত বলিল, ডাক্তার-বাবু! দিদিমা?

ডাক্তার-বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই, আপনি একটু অপেক্ষা করুন!

জান্‌লা দিয়া আর রজত দেখিতে চাহিল না, ডাক্তার-বাবুর অস্ত্র-গুলির শব্দ, নবজাত শিশুর স্নানের শব্দ, ধাত্রীর মৃদু গুঞ্জরণ, সব কানে আসিতে লাগিল, কিন্তু রমলার মধুর কথা একটাও শোনা যাইতেছে না। রজত চেয়ারে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার-বাবু তাহাকে ঠেলিয়া তুলিলেন, আসুন। ডাক্তার-বাবুর মৃদুহাস্যময় মুখ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য তাহার মন ডাক্তার সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণায় ভরিয়া গেল—হৃদয়হীন পিশাচ!

ডাক্তার-বাবু ধীরে বলিলেন, যেতে পারেন ঘরে, আপনার এক খোকা হয়েছে।

শঙ্কিতকণ্ঠে রজত বলিল, আর?

আর আপনার স্ত্রী খুব ভালই আছেন, বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি, বলিয়া ডাক্তার-বাবু পকেট হইতে এক সিগার বাহির করিয়া ধরাইলেন। তাঁহার প্রতি মনে মনে যে অবিচার করিয়াছিল তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া ডাক্তার-বাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে রজতের ইচ্ছা হইল। আপনাকে দমন করিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে গেল।

দিদিমার কোলে নেক্‌ড়া-জড়ান যে-সজীব মাংসপিণ্ড চীৎকার করিয়া ঘর মুখর করিয়া তুলিয়াছে তাহার দিকে রজত চাহিল না, ধীরে রমলার পার্শ্বে গিয়া বসিল। নবমাতৃত্বের অঞ্জন-মাখান তাহার হরিণ-নয়নে কি

মধুর দৃষ্টি! দিদিমা ধাত্রী সব ভুলিয়া গিয়া সে রমলার গণ্ডে আদর করিল।

দিদিমা জোর করিয়া রজতের কোলে ক্রন্দিত কাঁথার পুঁটলিটি চাপাইয়া দিলেন! পিতার কোলে আসিতেই খোকার কান্না থামিয়া গেল। এই মাংসের পুতুলের প্রতি চাহিয়া রজত পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহের ভাব জাগাইতে চাহিল, একবার রমলার দিকে চাহিল, দুইজনের চোখ ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু রজতের মনে এই অসহায় ক্ষুদ্র মানবটির প্রতি কোন স্নেহের ভাব উদয় হইল না। কেমন একটা বিরক্তি বোধ হইল, আকৃতিহীন, রূপহীন এই মাংসপিণ্ডের প্রতি চাহিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, সে তাড়াতাড়ি আবার দিদিমার কোলে খোকাকে ফিরাইয়া দিল। কিন্তু দিদিমার কোলে দিয়াই আবার তাহার দিকে চাহিতে রজতের ইচ্ছা হইল, খোকার ছোট দেহ দেখিয়া কান্না শুনিয়া রজতের মন করুণায় ভরিয়া উঠিল, ছোট বেলায় এক ঝড়ে নীড় হইতে খসিয়া-পড়া মৃতপ্রায় পাখীর শাবক কুড়াইয়া পাইয়া তাহার মনের এম্নি অবস্থা হইয়াছিল।

ধীরে রজত রমলার নিকটে ঘেঁসিয়া বসিল! নব আগন্তুক আপনার আগমন-বার্ত্তা অতি উচ্চৈঃস্বরে জানাইতে লাগিল। ঐটুকু নবনী-কোমল দেহ হইতে কিরূপে এত উচ্চ শব্দ বাহির হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য শিশুটির দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই রজত দেখিল, মামাবাবু দিদিমার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নব আগন্তুককে দেখিতেছেন— জীবাণু দেখিতে তিনি যেমন করিয়া মাইক্রস্‌কোপের উপর নিবিষ্টমনে ঝুঁকিয়া পড়েন!

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আরে রজত, এ আবার কোন্‌ বাঁদর এল রে—চেঁচিয়ে মাৎ ক'রে তুল্লে যে!

রমলা মিষ্টি হাসিয়া বলিল, দেখুন মামাবাবু, ওকে যদি কোন পোকা মাকড় কি বেঙাচি বল্‌বেন—

আল্বাৎ বল্‌ব—না, না, এ আমার সোনা মানিক, হীরের টুক্‌রো, বলিয়া দিদিমার কোল হইতে ক্ষণিকের জন্য খোকাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, কৈ ফ্লানেল কৈ? ভাল ক'রে জড়াও ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

রজত রমলার ম্যাডোনার মত নবশ্রীভরা মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

নব নব জন্মের স্থষ্টির দেবতার স্নেহময় প্রসন্ন দৃষ্টি তাহাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বৎসরের উপর আনন্দকণা বর্ষণ করিল।

২১

সেই রাত্রে মাধবী তাহার ঘরে একা রাত্রি যাপন করিতেছে। সেই দিন সে কাজীর চিঠি পাইয়াছে—তাহার পিতার ভয়ঙ্কর অসুখ। পিতার জন্য অন্তরে উদ্বেগ থাকিলেও সে-বিষয়ে সে বিশেষ কিছু ভাবিতেছে না। তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, অনুভূতির শক্তি হারাইয়াছে। পিতার প্রতি এক ক্ষুব্ধ অভিমান, নীরব ক্রোধ গোপন অন্তস্তলে ছিল বলিয়া পিতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। কাজী-সাহেবের চিঠি ভাল করিয়া পড়িল না, যাহা হয় একটা কিছু ঘটিয়া গেলে সে যেন সব ভাবনা হইতে ত্রাণ পায়।

একা ঘরে বসিয়া সে তাহার স্বামীর কথা মনে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। নীল পর্দা সরাইয়া জানালা খুলিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিল, বাতাস তাহার তপ্ত কপোলে স্নিগ্ধস্পর্শের মত লাগিল। চুল খুলিয়া জলে ভিজা হাওয়ায় দাঁড়াইয়া বারিধারাস্নাত কালো পিচে মোড়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। গ্যাসের আলোয় পথের একটি কোণ

ঝক্‌মক্ করিতেছে, কোথাও কোন মোটরকার আসার চিহ্ন নাই;
কিছুক্ষণ পরে একটি মোটরকারের আলো ঝড়ে জলে আলেয়ার আলোর মত দেখা দিল, সে মোটরকার তাহাদের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ধীরে জান্‌লা বন্ধ করিয়া মাধবী ধীরে বিছানার পাশে কোচে আসিয়া বসিল। সম্মুখের টেবিলে স্তূপীকৃত ইংরেজী ফরাসী নভেল। মোপাঁসার একখানি বই টানিয়া এক বারবনিতার গল্পে মন দিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তাহার স্বামী দুইদিন হইল বাড়ি আসেন নাই, কার্‌খানায় রহিয়াছেন, আজ রাতেও আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেদিন সন্ধ্যায় মাধবী একবার টেলিফোনে স্বামীকে ডাকিয়াছিল, তিনি এক মিনিটের জন্য আসিয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—একটি নূতন মেশিন এসেছে, বড় ব্যস্ত, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না, আজ এক নূতন ফার্‌নেসে আগুন জ্বালাতে হবে, রাত্রে যেতে পার্‌বো না বোধ হয়।

রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল মাধবীর মন বিষের জ্বালায় তত জ্বলিতে লাগিল। বাহিরের শ্রাবণ-রাত্রির মত তাহার মন কোন্ অন্ধ ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই একবৎসরের মধ্যে মাধবীর দেহে মনে ধীরে ধীরে কি বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া অবাক্ হইতেছিল। পাহাড়ের মাথায় যে-শুভ্র তুষার জমিয়াছিল কোন্ বেদনা-কামনার আগুনে রাঙ্গা হইয়া গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবার বনপর্ব্বত ভাসাইয়া প্রমত্ত স্রোতে কোন্ দিকে যাইবে কেহ বলিতে পারে না।

কাপড়ের আল্‌মারিতে লাগান লম্বা আয়নার সম্মুখে আসিয়া মাধবী দাঁড়াইল। তাহার স্নিগ্ধশুভ্র দেহের রং গলিত স্বর্ণের আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্ম্মল চোখ দীর্ঘপল্লবঘন, কালো তারা দু'টি কিসের ভারে নত, কোন্ শ্রান্তি গোপন-ব্যথা বুভুক্ষায় ভরা, যেন ওই অন্ধকারে

জগতের কত রহস্য লুকানো আছে। তাহার তনুতে কৈশোরের সুকুমার শ্রীর উপর পূর্ণবয়স্কা নারীর খরদীপ্তি ভরিয়া গিয়াছে, দেহ ঋজু হইয়া দেহের গাম্ভীর্য্য চলিয়া গিয়া গতিময় হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচের অতি নিকটে নিজের মুখখানি লইয়া চোখগুলি একবার বুজিয়া আবার মেলিয়া আপনাকে করুণোজ্জ্বল নয়নে দেখিতে লাগিল। তারপর হাডির একখানি উপন্যাস লইয়া সোফায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল।

এই নভেলগুলি তাহার একমাত্র বন্ধু ছিল। কর্ম্মহীন আনন্দহীন সঙ্গীহীন দিন ও রাত্রিগুলি সে নভেল পড়িয়া কাটাইত। দুইটি লাইব্রেরির সে সভ্য হইয়াছিল, তাছাড়া নিজেই থ্যাকারের বাড়ি গিয়া বই কিনিয়া আনিত। ইংরেজী, ফরাসী ও ইংরেজীতে অনূদিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার উপন্যাসগুলি, বিশেষতঃ যে-সব নভেলে নারীবিদ্রোহের কথা, rights of women, right to live, gospel of passion ইত্যাদি কথা লইয়া লেখা, সে-সব বই খুব বেশি কিনিয়া পড়িত। মদের মত এ বইগুলি সে পান করিত। উপন্যাস-মায়াবীর স্পর্শে তাহার অন্তরের গোপনকক্ষে কাহারা জাগিয়া উঠিত, বইয়ের নায়িকাদের সঙ্গে কোন্ অন্তরপুরবাসিনী সাড়া দিত। সাগরের এক স্রোত যেমন গভীরজলতলে অপর স্রোতকে ডাক দেয়, তেম্নি এই নভেল-রাজ্যের জীবনস্রোত তাহার অন্তস্তলের কোন্ মগ্ন স্রোতকে আহ্বান করিয়া উৎসারিত করিয়া দিত। এই ফরাসী নভেলের রাজত্ব—ইহার কাফে, বুলেভার, সালোঁ, নায়ক-নায়িকাদের প্রেমদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, লালসা-সংগ্রাম, কত প্রমোদ-উদ্যান, কত মদজ্বালাময় সুন্দরীখচিত ভোগের জ্যোৎস্নারাত্রি,—এই কাল্পনিক প্রেমসম্ভোগ-লোকে তাহার মন মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। বাহিরের পুরুষদের সঙ্গে মাধবী বড় মিশিত না। কল্পনা-রাজ্যের সুখ তাহাদের মধ্যে পাইত না বলিয়াই হউক, বা স্বামী পছন্দ করিবেন না ভাবিয়াই হউক, যে-

কয়জন বিলাত-প্রত্যাগত যুবক মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় তাহার বাড়িতে আসিত, তাহাদের সহিত সে বেশি আলাপ করিতে ইচ্ছা করিত না।

হার্ডির বইখানি কয়েকপাতা পড়িয়া সেখানি রাখিয়া আর-একখানি বই মাধবী টেবিল হইতে টানিয়া লইল। গল্পটির নাম, 'মা'। এক পতিতা মা ও তাহার মেয়ের গল্প। সে বইখানিও পড়িতে পারিল না, মন উদাস হইয়া উঠিল। হায়, তাহার মা নাই, 'মা' বলিয়া ভাবিবারও কেহই নাই, বুকে জড়াইয়া ধরিবার শিশুমানিক হয়ত হইবে না। অন্তরের কান্না দমন করিয়া জান্‌লা খুলিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। এই রাস্তা দিয়া কতবার কত কুলিমজুর রমণীদের সে যাইতে দেখিয়াছে, তাহাদের ছোট ছেলে-মেয়ে আছে; কত ছোট ছেলেমেয়ে দেখিয়াছে তাহাদের মা আছে। কৈশোরে মাতৃহীনা এই প্রেমতৃষিতা নারীর ক্ষুধিত হৃদয় বর্ষার রাত্রে মায়ের জন্য কাঁদিয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে তাহার মনে কি তীব্র জ্বালাময় ইচ্ছা জাগিত, স্নায়ুগুলি শিহরিয়া উঠিত। এতদিন সব ইন্দ্রিয় সুপ্ত ছিল, এখন যে ভোগতৃষ্ণার বহ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা তাহাকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিত; পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য সে হারাইয়াছিল। মাঝে মাঝে এই সুসজ্জিত গৃহে দিনের পর দিন সুপ্রচুর অবসরে ঐশ্বর্য্যসুখের মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিত, ইচ্ছা করিত, রাস্তায় সে বাহির হইয়া যায়। কলিকাতাটা যদি প্যারিস হইত, সুসজ্জিত পুরুষশোভিত পথে নারীর অবাধগতি থাকিত, তবে সে পথের জনতায় ঘুরিয়া যেন শান্তি পাইতে পারিত।

জান্‌লা বন্ধ করিয়া আলোর পর্দ্দা টানিয়া মাধবী বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম চোখে আসে না। স্বামীর প্রতি রুদ্ধ অভিমান তপ্তবক্ষে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীর নিয়ন্তার বিরুদ্ধে এক অন্ধ ক্রোধ তাহাকে যেন দংশন করিতে লাগিল। কাহাকে সে দোষ দিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সত্যই কি তাহাদের

বিবাহ একটা ভুল হইয়াছে? না, এ জীবন ভাল লাগে না, সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অবসাদ আসে। জীবনটা সত্যি কি, তাহা একবার দেখিতে বুঝিতে চায়—এই বদ্ধ রঙীন খাঁচায় সোনার পালকে মোড়া হইয়া সোনার দাঁড়ে থাকিতে সে চায় না, প্রাণের পাখা মেলিয়া সে উড়িতে চায়, জীবনের পাত্র ভরিয়া পৃথিবীর সব সুখ সৌন্দর্য্য পান করিতে চায়, পাত্রের তলায় সুধাই থাক আর হলাহলই থাক। তাহার পিতার মতই ওমার খৈয়াম তাহার প্রিয় গ্রন্থ হইয়া উঠিতেছিল। সে পিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

মাধবী কিন্তু যতীনকে ঠিক বোঝে নাই, তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছিল। যতীন ছিল বর্ত্তমান যন্ত্রশক্তির এক বাহক, কলরাজের এক প্রতিরূপ। নারীপ্রেমের লীলা সে বুঝিত না, প্রেমের লীলাখেলা সে বড় ভালবাসিত না, নারীকে হৃদয়-মন্দিরের রাণী করিয়া পূজা করিতেও সে পারিত না, তাহার অন্তরের রাজা অর্থও ছিল না, সে রাজা ছিল যন্ত্র। যন্ত্ররাজের এ পূজারী নারীবন্দনা গাহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। মাধবীকে সে ভালবাসিত, তাহার সুখ সুবিধার জন্য বড় বাড়ি সাজাইয়া, মোটরকার রাখিয়া, চাকর রাখিয়া ও প্রচুর হাত-খরচের টাকা দিয়া সে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু অন্তরের যে প্রেম না পাইলে চিরক্রন্দিত নারী-হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে না, তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ হয়, সেই প্রেমের কথা সে কোন দিন ভাবে নাই।

মাধবী যখন ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, যতীন তখন মানিকতলায় তাহার কারখানায় কাজ করিতেছিল। টিনের লম্বা শেডের এক কোণে কয়েকটা ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বলিতেছে। ফ্লানেলের ট্রাওজার পরিয়া শার্টের আস্তিন গুটাইয়া সে এক বৃহৎ কল সাজাইয়া বসাইতেছিল। জার্ম্মানী হইতে এই কলটি নূতন আসিয়াছে, তাহার টুক্‌রা টুক্‌রা অংশ জোড়া দিয়া কলটি বসাইতেছিল; সমস্তদিন অন্যান্য

কাজে সময় হয় না, তাই রাত্রেই কলটি জুড়িতে হইতেছিল। তিনজন মিস্ত্রি লইয়া কলের প্ল্যান হাতে করিয়া সে এক মনে কাজ করিতেছিল। এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, রাত একটা বাজিয়া গেল তাহা তাহার খেয়াল ছিল না।

মশা ও বৃষ্টির উপদ্রব বাড়াতে মিস্ত্রিরা সে রাত্রের মত বিশ্রাম চাহিল। যতীন তাহাদের ছুটি দিয়া আফিসঘরে গিয়া এক হিসাব লইয়া বসিল। যখন ঘুমাইতে গেল তখন রাত আড়াইটা।

তাহার বিবাহিত জীবনের উপর যন্ত্ররাজের চিরতৃষ্ণাময় স্বর্ণদৃষ্টি জাগিয়া রহিল।

২২

সেই রাত্রে হাজারিবাগের সেই বাড়িতে।

বাহিরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় শাল বনে বনে কালোসাপের কুণ্ডলীর মত মেঘস্তূপ ঘনাইয়া আসিয়াছে, সাপের বিষজিহ্বার মত বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, ঝঞ্ঝাঘন রাত্রির বাতাস শ্মশানের ভূতদলের মত হাঁকিয়া মাতাল হইয়া বেড়াইতেছে, বারিঝরার বিরাম নাই।

মুমূর্ষু যোগেশ-বাবুর মাথার কাছে কাজী-সাহেব বসিয়া। ঝোড়ো-হাওয়া মত্ত দৈত্যদলের মত দরজা-জান্‌লায় আঘাত করিতেছে, ঝুলানো আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

চিরপ্রসন্ন কাজীর মুখ আজ কালীতে ভরা, তাঁহার নিশিজাগরণক্লান্ত সেবাক্লিষ্ট চোখ মাতালের মত জ্বলিতেছে। যোগেশ-বাবুর মুখখানি কদর্য্য দেখাইতেছে, তাঁহার অস্বাভাবিক লাল নাক, ফুলো ফুলো গাল, নিষ্প্রভ ঘোলা চোখ, কালো কম্বলে জড়ান দীর্ঘ দেহ। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া

কাজীর মন করুণা ও হতাশে ভরিয়া উঠিতেছিল, মাঝে মাঝে একটু ভয়ও করিতেছিল। দুই বজ্রদগ্ধ পত্রহীন বৃক্ষের মধ্যে কচিবাঁশের মত মনিয়া কোণের এক চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

জ্বরের ঝোঁকে ভুল বকিতে বকিতে মৃত্যু পথিক বৃদ্ধ চুপ করিয়া ছিলেন, একবার চোখ মেলিয়া কাজীর দিকে চাহিলেন। সে চাউনিতে কাজীর গা সির্‌সির্ করিয়া উঠিল, সত্য সত্যই ভয় হইল। তিনি একটু মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘড়িতে রাত দুইটা বাজিল। যোগেশ-বাবু হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠাতে কাজী-সাহেব চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাশের টেবিল হইতে একটা ঔষধ ঢালিয়া গ্লাসটা মুখে ধরিলেন।

যোগেশ-বাবুর নিষ্প্রভ চোখ দুইটি হঠাৎ অস্বাভাবিক রূপে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। পাণ্ডুর মুখ কিসের বেদনায় কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদে ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, Oh, ওঃ, না, না, বিভা, গেলাস, ছোঁব না, বল্‌ছি—promise—ওঃ,—না।

পরম বেদনার স্বরে কাজী বলিলেন, সাহেব, এ ওষুধ।

র‍্যাগ্‌টা গা হইতে সরাইয়া দিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, একবার, শুধু একবার—দাও।

ঔষধটা খাইয়া যোগেশ-বাবু যেন একটু শান্ত হইলেন। কিন্তু ঠিক প্রকৃতিস্থ বোধ হইল না। সহসা বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিতে চাহিলেন, দুর্ব্বল বলিয়া পারিলেন না। দীপ্তস্বরে বলিলেন, কে? কে তুমি?

হতাশস্বরে কাজী বলিলেন, আমি।

—কে? মাধু?

কাজী-সাহেব মাধবীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিলেন, হাঁ, বাবা।

বৃদ্ধের ভীতপ্রদ মুখ শান্ত স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। আবেগের স্বরে বলিলেন, আয় মা, কৈ রমলা কৈ? রমলা? সে যে এই বলে' গেল—আস্‌ছি আমি তোমার চা নিয়ে।

কাজী বলিলেন, তবে এই আস্‌বে।

বিকারগ্রস্ত বৃদ্ধ অশান্ত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, মাধু, মাধু, সুখী হয়েছিস্, বিয়ে করে' সুখী হয়েছিস্?

অতি করুণকণ্ঠে কাজী বলিলেন, হয়েছি, বাবা।

বৃদ্ধের ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আর রমলা, কাকে বিয়ে করেছে সে—হাঁ সেই আর্টিষ্টকে—সে সুখে আছে রে?

কাজী ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, আছে, বাবা।

বা, বেশ বেশ, আশীর্ব্বাদ—গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া যোগেশ-বাবু অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

ভীষণশব্দে বজ্রধ্বনি হইল, সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়া উঠিল, ঝোড়ো হাওয়ায় ঘরের দরজা আর তাহার সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। ওই ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন।

যোগেশ-বাবু চমকিয়া উঠিয়া আবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, oh, oh, wife dear, come at last! যাচ্ছি, যাচ্ছি।

কাজী-সাহেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বজ্রধ্বনিতে মনিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে চোখ মেলিয়া ভীতকরুণ নয়নে চারিদিকে চাহিল। কাজী-সাহেব গেলাসের বাকী ঔষধটুকু আবার যোগেশ-বাবুর মুখে ধরিলেন।

না, না, আবার? বলিয়া যোগেশ-বাবু নিমেষের মধ্যে কাজী-সাহেবের হাত হইতে গেলাস কাড়িয়া লইয়া সম্মুখের আয়নার দিকে ছুঁড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গেলাস ধরিবার মত শক্তি হাতে

নাই, ছুঁড়িতে পারিলেন না, হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গিয়া বিছানায় ঔষধ গড়াইয়া গেল, ঝনঝন শব্দে কাঁচের গেলাস মেজেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই গেলাস-ভাঙার ঝনঝন শব্দে যোগেশ-বাবু যেন সচেতন হইয়া উঠিলেন, নিভিবার পূর্ব্বে প্রদীপের শেষ শিখার মত তাঁহার সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিল। সম্মুখের ঘরের জল-হাওয়ার মাতামাতির ধ্বনি কানে আসিতে লাগিল।

যোগেশ-বাবু একটু স্থির হইয়া শুইয়া কাজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা কাজী, life-টা কি ট্রাজেডি, না কমেডি?—হাঃ হাঃ, কমেডি, farce, farce, I say—Ah, my Beloved, fill the cup—To-morrow? To-morrow I may be—কাজী, জল, জল, গলা জ্বলে' গেল—

জল খাইয়া একটু শান্ত হইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, কি কাজী, ডাক্তার কি বল্লে, বাঁচব না?

Dust into Dust and under Dust to lie,
Sans Wine, sans Song, sans Singer,
and—sans End!

যোগেশ-বাবুর চোখ আবার ঘোলা হইয়া আসিল। তিনি অতি করুণ হাসিয়া উঠিলেন, বা, বা, কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে, বিভা! এসেছ, ও, dear dear—তিনি একটু উঠিতে চেষ্টা করিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িলেন।

বাহিরে ঝড় থামিয়াছে, ঘরে মুমূর্ষু বৃদ্ধের আর্ত্তনাদও চিরদিনের মত থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে ঘন কালো মেঘস্তূপে রক্তের ধারার মত

অরুণিমা জড়ান। পূর্ব্ব দিকের জান্‌লা খুলিয়া কাজী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সমস্ত দেহ-মন অসাড়, অবসন্ন, কিছু চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার শক্তি যেন নাই। ধীরে মনিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। তাহার দিকে চাহিতেই তাঁহার নিরুদ্ধ অশ্রুধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

আকাশে বৃষ্টি থামিয়াছে, বৃষ্টিশেষের হাওয়া প্রভাতের আলোয় মধুর বহিতেছে, কিন্তু সমস্ত প্রভাত ধরিয়া এই বৃদ্ধ মুসলমান ফকিরের অশ্রু-জলের বিরাম রহিল না।

২৩

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। মাঘের শেষে শীত যাই-যাই করিয়াও যাইতেছে না। দক্ষিণ-বাতাস বহিতেছে বলিয়া শহরে ধোঁয়া জমে নাই। ঘরের মধ্যে ঝোলান বেতের দোল্‌নায় খোকা ঘুমাইতেছিল, ললিত দোল্‌নার পাশে নত হইয়া ঘুমন্ত শিশুর নবনীকোমল গণ্ডে চুপে চুপে আদর করিতেছিল আর আনন্দমুগ্ধ নয়নে এই ক্ষুদ্র মানবশিশুর নিদ্রার ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ইহার ঘুম ভাঙাইয়া ইহাকে খানিকক্ষণ চটকায় হাসায় নাচায় দোলায় কোলে তুলিয়া সমস্ত ঘরে ঘোরে—ইহার তুল্‌তুলে গা, টুক্‌টুকে হাত পা, রেশ-মের মত চুল, ননীর মত গাল, ফুলের আধ-ফোটা কুঁড়ির মত চোখ—এই একরত্তি খোকা যেন বিশ্বের সমস্ত আনন্দ সৌন্দর্য্য চুরি করিয়া আপন বুকে রাখিয়াছে, সেই গুপ্তভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে ললিতের লোভ হইতেছিল। ইহার একটুকু হাসির প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে এ বাড়ির প্রত্যেকে আপনাকে ধন্য মনে করে, ইহার একটু কান্না উঠিলে

গোপাল হইতে মামাবাবু পর্য্যন্ত সবাই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বাড়ির সবাইয়ের উপর এই ক্ষুদে রাজাটির কর্তৃত্ব অসীম। ললিত খোকাকে আদর করিয়া পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত আঙ্গুলগুলিতে চুমো খাইতেছিল।

রমলা তখন সিঁড়ির পাশের ছোটঘরে তোলা উনানে রাঁধিতেছিল। ওই ব্যবস্থাটা মামাবাবু জোর করিয়া করাইয়াছেন। একসঙ্গে মাতা ও রাঁধুনীর সব কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যে বড় শক্ত, তাহা নানা যুক্তি দিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া তিনি একটি ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন। আর রমলার সিঁড়ি-উঠানামা বন্ধ করিবার জন্য তিনি তাঁহার রাসায়নিক সরঞ্জাম লইয়া একতালায় আশ্রয় লইয়া রমলাকে এই ছোটঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উনানে খোকার জন্য দুধ গরম করিতে বসাইয়া রমলা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ললিতের আদরের অত্যাচার দেখিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, দেখ, জাগালে কিন্তু তোমায় ঘুম পাড়াতে হবে, আমি পারব না। কাঁদলে জানিনে কিন্তু।

—বেশ, বেশ, আমি কি ডরাই কভু খোকার কান্নারে! খোকারাজার বেশভূষার তালিকাটা তৈরী হয়েছে কি?

—না।

—বেশ!

—বেশ কি, আমার সময় কখন?

—না, সময় তো নেই, তবু রজত বাড়ি থাকে না।

কথাবার্ত্তার শব্দে খোকা জাগিয়া উঠিয়াছিল। দোল্‌না হইতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ললিত বলিল, রাজা, মায়ের কি শাস্তি হবে বল তো?

খোকা মিটিমিটি চোখে চাহিল, মাকে দেখিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তুমি একটু রাখ, আমি দুধটা নিয়ে আসি, বলিয়া রমলা ঘর হইতে স্নেহমণ্ডিতমুখে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিডিং-বোতল লইয়া রমলা ঘরে ঢুকিতে ললিত খোকাকে দোলায় শোয়াইয়া দিল ও দুধ খাওয়াইতে শুরু করিল। দোল্‌নাটা মৃদু দোলা দিতে দিতে ললিত বলিল, কৈ রজত এখনও ফিরে এল না?

হাতের সোনার রিষ্ট্‌ওয়াচের দিকে সে একবার চাহিল।

—কি জানি। বলে' গেলেন শরীরটা ভাল নেই, সকাল-সকাল আসবেন।

—হাঁ রজত কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে, কেন বল তো?

—সইবে কেন অফিসের কাজ। এতদিন আদরে আব্‌দারে মানুষ; আফিসের বড়সাহেব তো আর মামা নন—তা আজই বোধ হয় শেষ করে' আস্‌বেন।

—শেষ কি?

—এই তিন মাস হয়নি, এরি মধ্যে পাঁচবার অফিসে ঝগ্‌ড়া হয়ে গেল। কাল না কি বড়বাবুর সঙ্গে খুব কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, আজ resign করে আস্‌বেন বলেছেন।

—বেশ, বেশ, ও কি কেরানি হতে পারে, বল্লুম, ভাল portrait আঁক্‌তে-শেখ, ছবি এঁকে হাতটা দুরস্ত কর, ওর তো সাধনা দরকার।

হাঁ, মামাবাবুও তো তাই বলেন, আজ খুব বকুনি দিয়েছেন, বলিয়া রমলা নিজেই মধুরহাস্যে ঘর ভরিয়া তুলিয়া খোকার মুখে একটি মিষ্টি চুম্বন দিল।

রজত যে টাকার জন্য চাকরি লইয়াছিল, তাহা নহে, কেননা মাহিনা খুব বেশি ছিল না। বাড়িতে একটানা বসিয়া থাকিয়া এই অলসতায় সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আগে প্রায়ই রমলাকে লইয়া ষ্টিমারে বেড়াইতে

বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু এই শিশু জন্মাইবার পর তাহা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া রমলাও যেন কিরূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল, মাঝে মাঝে খোকার উপর রজতের হিংসা হইত, সে-ই রমলার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। রমলা শুধু মামাবাবুর সঙ্গে নয়, তাহার সঙ্গেও এরূপ ব্যবহার করিত, যেন সে বড়খোকা। খোকাকে দুধ খাওয়ান, ঘুমপাড়ানো, তাহার কাঁথা-জামা তৈরি করা, ময়লা জামা, কাঁথা, বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি কাচা, শুকাইতে দেওয়া, সাজাইয়া তোলা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি কাজে রমলা সমস্ত দিনই ব্যাপৃতা, রজতের প্রতি মনোযোগ দিবার তাহার আর সময় থাকে না। ঘরে থাকার অবসাদ দূর করিবার জন্য সে বাহিরের কাজে যোগ দিয়াছিল। আর নিজেদের ছোটঘরে দাম্পত্যপ্রেমকে চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ রাখিলে, দুইটি হৃদয়ের প্রেম যতই সুনিবিড় যতই গভীর হউক না কেন, অবসাদ আসিবেই। সংসারে চারিদিকে নব নব মঙ্গলকর্ম্মে যুক্তহৃদয়ের প্রেমকে প্রবাহিত না করিলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়?

* * * *

দুই ঘণ্টা পরে। ললিত চলিয়া গিয়াছে। রজত মাদুরে বসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছিল, আজ সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে, সেই আনন্দেই বোধহয় রমলার কোল হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়াছিল। রমলা পাশের চেয়ারে বসিয়া মোজা বুনিতে বুনিতে মাঝে মাঝে রজতের মাথার উপর মাথা ঠেকাইয়া খোকার মুখটা দেখিতেছিল। রজত খোকাকে তুলিয়া ধরিয়া চুমা খাইতে রমলাও তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, অধরে অধর ঠেকিয়া গেল। মধুর হাস্য-মাখান মুখে রমলা খোকাকে ধীরে রজতের কোল হইতে লইয়া বেতের দোল্‌নায় শোয়াইয়া দিল, ফিডিং-বোতলটা ধুইয়া রাখিল, হ্যারিকেনের আলোটা মাদুরের মাঝখানে রাখিয়া একখানা পোষ্টকার্ড আড়াল দিয়া

দোল্‌নার পাশে বসিয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে বলিল, ওগো একটা কিছু পড়না।

রজত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল, ধীরে পাশের শেল্‌ফ্ হইতে ল্যামের Essays of Elia খানি টানিয়া বলিল। কি পড়্‌ব ?

—ওটা কি ? ল্যাম্ ? আচ্ছা, Dream Childrenটা পড়। ল্যামের জীবন ভারি করুণ ছিল, নয় ? তিনি না কি তাঁর বোনকে খুব ভালোবাস্‌তেন, তাঁকে দেখাশুনা কর্‌বার জন্য বিয়ে করেন নি ?

—হাঁ সেও একটা কারণ বটে, আর হৃদয় দিলেই তো আর হৃদয় পাওয়া যায় না, পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

—বাস্তবিক ঈশ্বরের এমন নিয়ম করে' দেওয়া উচিত ছিল, আমি যদি কাউকে সত্যি ভালোবাসি সে আমাকে নিশ্চয় ভালোবাস্‌বে, ভালোবাস্‌তেই হবে—

—তাই না কি ?

মুখ রাঙা করিয়া রমলা বলিল, যাও, পড়ো! আমি বল্‌ছিলুম যে যাকে ভালোবাসে সে যেন তার ভালোবাসা পায়, লোকে প্রেমকে অনাদর করে, তাই তো জগতে এত দুঃখ।

—তা পায় রমু। বুঝ্‌লে, কখন কারও কোন ভালোবাসা ব্যর্থ যায় না, সত্যিকার প্রেম হলে তার আনন্দ সার্থকতা আছেই—

—কিন্তু যে যাকে ভালোবাসে তাকে তো সবসময় পায় না, এই ধর ল্যাম্ যাকে ভালোবেসেছিলেন সেই আলিস্‌কে তো পেলেন না।

—কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে যখন দু'জনা দু'জনকে ভালোবাসে অথচ মিল্‌তে পার্‌ছে না, বলিয়া রজত Dream Children পড়িতে শুরু করিল।

—ওগো, তোমার বন্ধু এই আঙুর এনেছেন, বলিয়া রমলা টেবিল হইতে এক ঠোঙা আঙুর আনিয়া রজতের পাশে বসিয়া বাছিয়া রজতকে

দিতে লাগিল, নিজেও মুখে পূরিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম পাতা পড়া শেষ হইতেই রমলা খাওয়া ভুলিয়া প্রেমভরা চোখে রজতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পড়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রমলার চোখ জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহাকে পায় না কেন? রজত ধীরে পড়িতেছিল, how for seven long years, in hope sometimes, sometimes in despair, yet persisting ever, I courted the fair Alice—

রমলার চোখে ল্যামের অবিবাহিত জীবনের করুণ ছবিখানি ভাসিতেছিল। কত অন্ধকার সন্ধ্যায় বিজনঘরে আগুনের সম্মুখে বসিয়া এই কথাশিল্পী ক্ষুধিত পিতৃহৃদয়ের তৃষিত স্নেহরস দিয়া ব্যর্থপ্রেমের অম্লান পারিজাতের মত এই কাল্পনিক খোকা-খুকীদের সৃষ্টি করিয়াছেন; ভাবিয়াছেন—এরা বুঝি তাঁহার প্রিয়ার, তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তিনি তাহাদের রূপকথা বলিতেছেন। কিন্তু এ মন-ভুলান স্বপ্ন, এ মায়া যখন টুটিয়া যাইত, তখন যে ব্যথা, তাহা অশ্রুর অতীত। রজত যখন পড়িতেছিল,—We are not of Alice, nor of thee. The children of Alice call Bartrum their father. We are nothing.

রমলা অস্ফুটকরুণস্বরে বলিয়া উঠিল, আহা, বেচারা!

মুখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেই রমলা একটু ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কার কালো ছায়া দরজার গোড়ায়? একটু ভীতস্বরে বলিল, —ওগো!

রজত পড়িয়া যাইতে লাগিল। রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, দেখ দরজার গোড়ায় কে দাঁড়িয়ে?

তাহারা দুইজনে পাঠে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে যতীন কখন আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছে তাহা তাহারা দেখে নাই। রজত যখন

খোকাকে আদর করিতেছিল, তখনই যতীন আসিয়াছিল, এতক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাম্পত্যজীবনের এক আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছিল; ঘরে ঢুকিতে পারিতেছিল না, চলিয়া যাইতেও পারিতেছিল না। হ্যারিকেন্‌লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল রমলার মুখের দিকে চাহিয়া সে মায়ামুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় এই পাড়ায় এক মাড়োয়ারী ধনীর সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে দেখা করিতে আসিয়াছিল; রজতের বাড়ির সম্মুখ দিয়া ফিরিবার সময় দরজার সম্মুখে মোটর কেমন থামিয়া গেল, একবার দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। এতক্ষণ সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই ঘরটিকে, রজতকে, রমলাকে দেখিতেছিল। প্রতিদিন তাহার চোখের সম্মুখে যে-দৃশ্য অহর্নিশি থাকে—সেই বয়লার জ্বলিতেছে, মোটর চলিতেছে, চাকাগুলি ঘুরিতেছে, লেদ কাটিতেছে, মিস্ত্রিরা লোহা পিটিতেছে—সেই দৃশ্যের পর এই প্রেমস্নিগ্ধ শান্ত দৃশ্যটি দেখিয়া সে এত বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, এ স্বপ্ন সে ভাঙিতে চাহিতেছিল না।

We are nothing; less than nothing, and dreams—
বলিতে বলিতে রজত থামিল।

রমলা বলিল, ওগো দেখ, কে তোমায় ডাক্‌ছেন বোধ হয়।

আমি, আমি, বলিয়া টুপি খুলিয়া যতীন ঘরে ঢুকিল,—হ্যালো রজত!

রজত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, আরে তুমি! এস, এস।

রমলার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল, কি great surprise বলুন! সত্যি কথা বল্‌ব?—একটু overhearও করেছি।

রমলা হাসিয়া বলিল, আজ বুঝি আবার আমাদের বাড়ির সামনে মোটরের টায়ার burst করল?

—না, আজ পেট্রল ফুরিয়ে গেল। সত্যি এম্নি disturb করা—

আচ্ছা, আচ্ছা, বলিয়া রজত যতীনের হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল।

রমলা বলিল, কোথেকে আস্‌ছেন? কারখানা থেকে? এক কাপ্ চা করে' দি।

ব্যথিত-করুণস্বরে যতীন বলিল, না, না, ব্যস্ত হবেন না। খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে?

ধীরে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দোল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল।

কিছুতেই দেখ্‌তে পাবেন না, অম্‌নি কিছুতেই দেখ্‌তে দেওয়া হবে না, বলিয়া যতীন ও দোল্‌নার মাঝে গিয়া রমলা দাঁড়াইল। অম্‌নি কাকা হওয়া হবে না। কি দিয়ে দেখ্‌বেন, বলুন আগে।

অন্তরের হতাশস্বরকে কণ্ঠে সহজ করিয়া যতীন বলিল, আমি কি দিতে পারি, সঙ্গে দেবার মত কিছু নেই।

রমলা একটু দুষ্টামির সুরে বলিল, তবে আজ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না।

রজত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, রমু!

রমলা হাসিয়া বলিল, বা, ফাঁকি?

সে সরিয়া দাঁড়াইল।

আচ্ছা, আচ্ছা, এই আংটি, বলিয়া ম্লান হাসিয়া যতীন ধীরে বসান সোনার আংটি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দোল্‌নার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

রজত কিছু বলিতে পারিল না, রমলা অতি অপ্রতিভ হইয়া হ্যারিকেন্ লণ্ঠনটি তুলিয়া ধরিল। কথাবার্ত্তায় খোকা জাগিয়া উঠিয়াছিল। যতীন ধীরে শিশুটিকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া দুইটি আঙ্গুল এক করিয়া আংটিটি পরাইতে চেষ্টা করিল। সহর্ষে খোকা হাসিয়া উঠিল।

খোকাকে দোল্‌নায় শোয়াইয়া যতীন স্নিগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সোনা দেখিয়া খোকার চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছিল, সে আংটি জোর করিয়া ধরিয়া হাত নাড়িয়া ঘুরাইতে লাগিল। রমলা তাহার হাত হইতে আংটি ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করাতে সে বিশেষ আপত্তি জানাইয়া কান্না জুড়িবার উপক্রম করিল। যতীন বলিল, Fine baby! রজত এর যা grip! দেখছ, কি রকমভাবে ধরেছে! ওকে আমি একটা খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার করে' দেব দেখ্‌বে!

রমলা পুত্রগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া যতীনের দিকে চাহিল। যতীন ক্ষণিকের জন্য নির্নিমেষনয়নে রমলার দিকে চাহিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া সমস্ত দেহ যেন একটু টলিয়া গেল, তাহার মনে হইল, সেই হাজারিবাগের ডাকবাংলায় বিনিদ্র রজনীর পর কোন দুঃস্বপ্ন হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে। রমলাই সত্যই তাহার অন্তরবাসী প্রেমিক পুরুষকে জাগাইয়াছিল, আর মাধবী তাহাকে আবার ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে, এই ক্ষণিকের চাউনিতে এই কথা বিদ্যুতের মত তাহার মনে জ্বলিয়া উঠিল! খোকার নরম হাত ধরিয়া ঝাকুনী দিয়া আবেগের সহিত সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমলা বলিল, বসুন, খেয়ে যেতে হবে, আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যান না। আচ্ছা মাধবী কি একবার ভুলেও আসে না? ভাল আছে সে?

করুণ হাসিয়া যতীন বলিল, হাঁ ভালই আছে। তাহার মনে হইতেছিল, কাহারও সহিত বসিয়া খাইতে যে আনন্দ আছে, একথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। মাধবীর সঙ্গে সে কতযুগ খায় নাই, কারখানা হইতে সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া মাধবীর মুখে কোনদিন শোনে নাই, এক কাপ্‌ চা করে' দি।

রিষ্ট ওয়াচ দেখিয়া রজতের দিকে তাকাইয়া যতীন বলিল, ভাই

এক ডিরেক্‌টারস্‌ মিটিং আছে, আজ আর বসতে পার্‌ব না, আর একদিন নিশ্চয় আসব।

সে হবে না, এতদিন পরে এলেন, একটু বসুন, বলিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যেই এক পিতলের ঝকঝকে পানের মত রেকাবিতে নতুন-গুড়ের সন্দেশ, মোয়া, রসগোল্লা আর এক কাপ্‌ চা লইয়া রমলা হাজির হইল।

রেকাবিটা হাতে ধরিয়া যতীন বলিল, আর-একটা কি খাওয়া চল্‌ছিল?

ও! আঙুর, খাবেন? বলিয়া রমলা কতকগুলি আঙুর ঠোঙা হইতে লইয়া সুন্দর করিয়া রেকাবিতে রাখিল। এক লজন্‌চুষের শিশি হইতে পাটালি বাহির করিয়া যতীনকে দিয়া বলিল, ভারি সুন্দর পাটালি, চকোলেটের চেয়ে আমার ভাল লাগে।

যতীন সব খাবার খাইল দেখিয়া রজত একটু অবাক্‌ হইল। বস্তুতঃ আজ এই ঘরে যতীন ক্ষণিকের জন্য যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিল তাহার আনন্দে ভুলিয়া সে রেকাবিটা নিঃশেষ করিল।

দেখুন সব খেয়েছি, আজ তবে আসি, বলিয়া যতীন আবার দোল্‌নার কাছে একটু অগ্রসর হইল।

রমলা বলিল, আবার কবে আস্‌বেন?

—দেখ্‌ছেন কি ভয়ঙ্কর কাজ! যখন ছুটি পাব ঠিক্‌ আস্‌ব।

—ঠিক?

—হাঁ ঠিক, গুড্‌নাইট্‌ রজট্‌।

রমলা ও রজত তাহাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

মোটরে উঠিয়া যতীনের নিজে মোটর চালাইয়া যাইবার মত উৎসাহ যেন রহিল না! সোফারকে মোটর চালাইতে বলিয়া নিজে মোটরের

ভিতর গিয়া বসিল! কাজের তাড়ায় যখন মোটরে বসিয়া কাগজ-পত্র দেখিতে হইত তখনই সোফারকে মোটর হাঁকাইতে হইত, তা ছাড়া সর্ব্বদাই সে নিজে চালায়। অকারণে সাহেব মোটর চালাইলেন না দেখিয়া পাঞ্জাবী সোফারটা একটু অবাক্ হইল।

রাত্রির অন্ধকারে দু'ধারে ছায়াবাজীর মত জনস্রোত, প্রাসাদস্রোত, হীরার চুম্‌কির মত গ্যাসের আলোর সারি। চারিদিকে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু কোথাও একটু শান্তি স্নিগ্ধতা পাইতেছিল না। একটি দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল—দৃশ্যটি বিশেষ কিছুই নয়, দুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়া আঙুর খাইতে খাইতে বই পড়িতেছে, সম্মুখের দোলায় ঘুমন্ত শিশু দুলিতেছে, বাতির আলো দুইজনের মুখের অর্দ্ধেক উজ্জ্বল করিয়াছে। এই ছবিটি তাহার মাথায় যেন জ্বলিতে লাগিল, চোখের সম্মুখ হইতে কিছুতেই দূর হইতে চাহিল না।

যতীন ড্রাইভারকে বাড়িতে যাইতে বলিল। ডিরেক্‌টারস্ মিটিংএ যাইতে তাহার ইচ্ছা বা উৎসাহ রহিল না। ড্রাইভার বিস্মিতনয়নে সাহেবের মুখের দিকে চাহিল, এত সকালে তিনি কোনদিন বাড়ি ফেরেন না।

বাড়ি ঢুকিয়া যতীন শোবার ঘরে গেল, ড্রয়িংরুমে মাধবী নাই, শয়নকক্ষেও নাই। একটু রুক্ষস্বরে চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেমসাহেব কোথায়?

দীর্ঘ সেলাম দিয়া চাকর জানাইল, বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিরক্ত হইয়া যতীন বলিল, কতক্ষণ?

অতি দীনভাবে চাকরটি বলিল, সন্ধ্যে বেলা। যেন এ তাহারই অপরাধ।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল, গাড়িতে গেছেন ?

—না, ট্যাক্সিতে।

—কোথায় গেছেন জানিস্ ?

চাকরকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যে কতদূর অনুচিত তাহা যতীনের খেয়াল ছিল না।

চাকরটি ধীরে বলিল, বায়স্কোপ গেছেন।

তিক্তস্বরে যতীন বলিল, বায়স্কোপে! আচ্ছা যাও।

কথাগুলি শুনিয়া স্বামীর যেরূপ ক্রোধ বা অভিমান হওয়া উচিত ছিল তাহার বিশেষ কিছু হইল না। তবু অন্তরে কেমন ব্যথা বোধ হইল কিন্তু তাহা মাধবীর জন্য, না নিজের জন্য, তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চাকরকে বিদায় দিয়া যতীন ড্রয়িংরুমে পায়চারি করিতে লাগিল। এই সুসজ্জিত ঘরটি পঙ্খের কাজ-করা, বড় আয়না ও ছবি লাগান, আধুনিক সাহেবী আসবাবে ভরা। এই ঘরটি যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিল। মাধবী আবার ঘরটিতে অনেক ভারতীয় শিল্পদ্রব্য রাখিয়াছিল—অবনীন্দ্রের আঁকা ছবি, পিতলের ও পাথরের বুদ্ধমূর্তি, সূর্যমূর্তি, চীনের ড্রাগন, জাপানী ফ্যাশানের পর্দা, পারস্য কার্পেট ইত্যাদি দিয়া এক ইংরেজশিল্পী আসিয়া ঘরটিকে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

চাকর চা আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। এই ঘরটিতে যতীনের যেন দম আটকাইয়া যাইতে লাগিল। মোটর হাঁকাইয়া সে গড়ের মাঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল।

যতীন যখন ষ্ট্রাণ্ডরোডে মোটর থামাইয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিল, তখন মাধবী ইয়োরোপ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত এক তরুণ যুবকের সহিত বায়স্কোপ দেখিতেছে। এতদিন সে ঘরে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এবার সে নিজেকে বাহিরে মুক্তি দিয়াছে। পিতার

মৃত্যুসংবাদে সে যতখানি কাতর হইবে ভাবিয়াছিল, তাহা হয় নাই। প্রথম রাত খুব কাঁদিয়াছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন কিছুই খাইতে পারে নাই, তার পর সে শোক অতি শীঘ্রই ভুলিয়া গেল। বস্তুতঃ তাহার বিবাহের পর হইতেই তাহার পিতা তাহার কাছে যেন মৃত হইয়াছিলেন। এতদিন তবু জীবনটা একটা ভাঙ্গা নোঙ্গরে একটু বাঁধা ছিল, সে নোঙ্গর ডুবিয়া যাইতে, উচ্ছল জীবন-সমুদ্রে সে তরী ভাসাইয়া দিল। নভেল পড়িয়া অত্যন্ত অবসাদ আসিয়াছিল, এবার সত্যকার জীবন কি জানিতে তাহার অন্তর যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

মাধবী যখন বায়স্কোপে এক ফরাসী অভিনেত্রীর রোমান্স দেখিতেছিল, তখন যতীন জাহাজের মাস্তুলাকীর্ণ ধূমাচ্ছন্ন কালো নদীজলের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিল, হয়ত সে ভুলই করিয়াছে। কে যে তাহার সুপ্তচিত্তের প্রেমকে সোনার কাঠি দিয়া জাগাইয়াছিল, হাজারিবাগে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। রমলা যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে রমলাকে ভালোবাসে নাই, মাধবীকে ভালোবাসিয়াছে। বিবাহের পরও কয়লার খনিতে নবদম্পতির জীবন কি আনন্দেই কাটিয়াছে। কিন্তু সে প্রেমস্বপ্ন টুটিয়া গেল কেন? এ কি গোপন প্রেম লুকান ছিল! আজ সমস্ত অন্তর সে বেদনাময়! ল্যাম্বের মত কোন্ স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া সে আপন মনকে ভুলাইতে চায়? কোন্ ঘুমন্ত শিশুর দোলার পাশে বসিয়া মৃদু দোলাইতে দোলাইতে কাহার হাত হইতে আঙুর খাইবার জন্য তাহার মন তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! দুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়া বসিয়া আছে—এই ছবিটি তাহার মগজে যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, এই ভেজা ঘাসের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িতে তাহার ইচ্ছা করিল। রজতের ঘরের ছবিটি বার বার যতীনের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু গঙ্গার তীরে যতীন বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। কারখানায় একটি নূতন কল আসিয়াছে; সেই কলের নব রহস্য তাহার মনকে টানিতেছে, ওই যন্ত্রশক্তি তাহাকে টানিতেছে। যতীন মোটরে উঠিয়া কারখানার দিকে মোটর হাঁকাইতে বলিল। মোটরে বসিয়া যতীন ভাবিতে লাগিল, আর রজতের বাড়ি যাওয়া ঠিক হইবে কি না। বহুক্ষণ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া ঠিক করিল, রজতের বাড়ি আর সে যাইবে না।

২৪

ফাল্গুনের দুপুর। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ, শুধু সিঁড়ির দিকের দরজাটা খোলা, সেইখান দিয়া প্রচুর আলো ঘরে আসিতেছে। দরজার পাশে চেয়ারে বসিয়া রজত ছবি আঁকিতেছিল। বিবাহের পর সে মনোযোগ দিয়া বড় ছবি আঁকিতে বসে নাই, দরকারও বোধ করে নাই, কিন্তু আফিসের কাজ ছাড়িয়া কর্ম্মহীন দুপুরে ছবি আঁকায় মন দিয়াছে। রমলা ছাদে খোকার কাঁথা জামাগুলি শুকাইয়াছে কি না দেখিতে গিয়াছিল। কাঁথা তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে রমলা ঘরে আসিতে রজত বলিল, একটু দাঁড়াও না গা।

—কেন?

—হাঁ ঠিক ওই রকম ভঙ্গী করে'।

—যাও, আমায় কি মডেল, বলিয়া রমলা খাটের বিছানা ঝাড়িতে শুরু করিল।

এই সংসারের নিত্যকর্ম্মের মধ্য দিয়া রমলা রজতের নিকট নব নব সৌন্দর্য্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। এ কেবল মায়াবিনী প্রিয়া নয়, এ মঙ্গলময়ী মাতা, কল্যাণী নারী, শান্তির আনন্দরূপ। সকাল

হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত রমলা সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি কি সুন্দরভাবে কি স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত করিত—বিছানা তোলা, টেবিল ঝাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, খোকাকে স্নান করান, খাওয়ান, কাপড় কাচা, খোকাকে ঘুম পাড়ান, সেলাই করা—এই কল্যাণময় গৃহকর্ম্মের সৌন্দর্য্যে রজত মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, এ সব কাজের প্রেম ও আনন্দময় মূর্ত্তিগুলিকে সে শিল্পীর তূলি দিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিতেছিল। এত দিনের গল্প করা, উজ্জ্বল হাসি, গান গাওয়া, হেলাফেলার মত্ত সৌন্দর্য্যের চেয়ে এই মঙ্গলকর্ম্মগুলির স্নিগ্ধ মাধুর্য্যময় রূপ তাহার চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিত। তাহার ঝাঁটা ধরার ভঙ্গী, রান্না করার গান, সমস্ত কাজের মধ্যে দেহের ছন্দ—এ সমস্ত ছবির পর ছবি দিয়া আঁকিতে শুরু করিয়াছিল। রমলা যখন রান্না করিত, কি সুন্দর দেখাইত! সেই জলের ঝরঝর তেলের কলকল ঝোলের খলখল শব্দ, তাহার সঙ্গে সোনার চুড়িগুলির রিনিঝিনি, অকারণ হাসির সুর; মুক্তকেশে, দীপ্ত মুখে আগুনের আভা; ফুলেভরা লতার মত তনুবল্লরী একবার কড়ার উপর নুইয়া পড়িতেছে আবার দুলিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে দু'এক লাইন গান। পুরুষের জন্য নারীর চিত্তে যে কি স্নেহ জমা রহিয়াছে, পুরুষকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে যে নারীর কি আনন্দ, রমলার সেবিকামূর্ত্তি দেখিয়া, মুখের দিকে চাহিয়া রজত তাহা বুঝিত!

ইহার চেয়েও সুন্দর দেখাইত, যখন রমলা খোকাকে কোলে করিয়া জামা পরাইত, দুধ খাওয়াইত, আদর করিত, মাতৃস্নেহের আনন্দে আপনাকে ভুলিয়া যাইত,—তাহার চোখে স্নেহভরা চাউনি, গণ্ডে রক্তিম আভা, বুকে ভয়ের দোলা, হাতে প্রেমের ভঙ্গী—সেই মূর্ত্তিমতী ম্যাডোনাকে দেখিয়া রজত আপনাকে ধন্য মানিত।

রমলার এক ছবি রজত আঁকিতেছিল। রমলা একবার চকিতপদে

আসিয়া পেন্সিল কাড়িয়া লইয়া বলিল, সত্যি, কি হচ্ছে বল তো, আমায় পাগল পেলে? আচ্ছা, খোকার একটা ছবি আঁক না বাপু।

পেন্সিল দিয়া রজতের গালে আঘাত করিয়া সে মামাবাবুর ঘর গোছাইতে চলিয়া গেল।

চৈত্র পূর্ণিমার রাত। মাঝ রাতে রমলার ঘুম হঠাৎ কেমন ভাঙ্গিয়া গেল। পাশে রজত শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, তাহার মাথাটা ধীরে বালিশে উঠাইয়া দিয়া চুলগুলি লইয়া একটু নাড়িয়া রমলা ধীরে উঠিল। দোলায় খোকা ঘুমাইতেছে, তাহার পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিল, কোণের খোলা জানলা দিয়া জ্যোৎস্না ঘরে ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই আলোয় খোকার নিদ্রিত শান্ত মুখ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ধীরে নত হইয়া খোকাকে সে চুমা খাইল। জাপানী মাদুরের উপর ছড়ান তাসগুলি সাজাইতে সাজাইতে খোকার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে কেমন ঘুম আসিতেছে না। ঘরটা একটু অপরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদের আলোয় সে ঘরটি নিঃশব্দে গুছাইতে লাগিল।

এখন প্রতি সন্ধ্যায় রজত তাহার চার-পাঁচজন বন্ধুকে আড্ডা দিতে নিমন্ত্রণ করে। ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সুতরাং সে বাহিরকেই ঘরে আহ্বান করে। আয়োজন বিশেষ কিছুই থাকে না; রমলার হাতের তৈরী অতি মিষ্ট চা খাইয়া আর ডালমুট, চীনের বাদাম বা যে-কোন একটা খাবার দিয়া মুখ চালাইতে চালাইতে তাহাদের তাসের আড্ডা বেশ সরগরম হয়। রমলা ও ললিতের উচ্ছল হাসিতে, আর যুবক বন্ধুদের তর্ক বিতর্কে গল্পে রসিকতায় প্রতি সন্ধ্যা বেশ জমিয়া উঠে। ইহাতে শুধু অসুবিধা হয় খোকার। সবাই তাহার লাল গালটা টিপিয়া টিপিয়া ব্যথা করিয়া দিয়াছে; অবশ্য এ আদরযন্ত্রণার জন্য প্রচুর পারিশ্রমিকও সে পায়। বন্ধুরা স্নেহের চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পাউডার, খেলনা, জুতো, জামা ইত্যাদি নানা উপহারের বোঝা চাপাইয়া দেয়।

ছড়ানো ডালমুট, তাস, চায়ের প্লেট ইত্যাদি অতি নিঃশব্দে তুলিয়া রমলা ঘরের মাঝখানটি পরিষ্কার করিল। বন্ধুদের সরল প্রাণখোলা হাসি এখনও যেন ঘরের হাওয়ায় ভরিয়া আছে, তাহাদের যৌবনশ্রীমণ্ডিত মুখগুলি, বিশেষতঃ ললিতের মুখ, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে রমলা বারান্দায় বাহির হইয়া কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর আবার দোল্‌নার কাছে আসিয়া ঘুমন্ত শিশুর দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া রহিল। একবার রজতের নিদ্রিত দেহের দিকে চাহিল, তার পর করযোড়ে শিশুর মঙ্গলের জন্য বিশ্বমাতার চরণে প্রণাম করিল। যিনি নব নব জন্মের দেবতা, সৃষ্টির দেবতা, তাঁহার স্নেহময় প্রশান্ত দৃষ্টি এই জাগ্রত ভয়ব্যাকুল মাতার শিয়রে চিরজাগ্রত রহিল। ধীরে রমলা খোকাকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইল।

২৫

তৃতীয় বৎসর।

শরৎ-পূর্ণিমার রাত। বিছানায় শুইয়া গল্প করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। রজত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রমলার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। সে স্বামীর কাছে চুপ করিয়া শুইয়া জ্যোৎস্নাভরা ঘরখানি দেখিতে লাগিল। ড্রেসিং-টেবিলের উপর শেফালিফুল ও কাশের গুচ্ছ, তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া বড় করুণ দেখাইতেছে, পিয়ানোর কাঠে আলো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। রমলার মনে হইল, কতদিন সে পিয়ানো বাজায় নাই, খোকাকে লইয়া তাহার হাসি-খেলায় সে এত মগ্ন হইয়াছিল যে, পিয়ানোর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল, খোকাই তাহার জীবন্ত পিয়ানো। রমলা স্নেহনেত্রে একবার দোল্‌নার দিকে চাহিল, তারপর দোলাচেয়ারের মাথায় ওয়াট্‌সের "আশা"

ছবিখানির উপর চোখ পড়িল। সমস্ত পৃথিবীর কানে-কানে আশা কি মোহনমন্ত্র গাহিতেছে, চক্ষু তাহার বাঁধা, কোন্ স্বপ্নে মাতোয়ারা হইয়া সে ধরণীকে কোন্ নব দেশের গান শোনাইতেছে! আশা—রমলা স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিল. নিদ্রিত শিশুর দিকে চাহিল, কি আশা রমলার? এই আশার বৃন্তের উপর জীবনের আনন্দ কমল ফুটিতেছে; কোন্ আশায় রমলা বাঁচিয়া আছে? স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য তাহার কি আশা? সে জানে না, বুঝিতে চায় না, সমস্ত জীবন যেন এম্‌নি করিয়া স্বামী পুত্রকে ভালোবাসিয়া সেবা করিয়া সে তাহাদের কোলে আনন্দে মরিতে পারে। ঘরের কোণে পাথরের ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তির দিকে একবার চাহিল। এই তপস্বী মহাপুরুষটিকে সে সবচেয়ে ভক্তি করিত। তার পর খোলা জান্‌লা দিয়া স্নিগ্ধ নীলাকাশে জ্যোৎস্নার দিকে চাহিল। ললিতের কথা তাহার মনে পড়িল। তিনমাস হইল ললিত জার্ম্মানী গিয়াছে, কি একটা শিখিতে গিয়াছে বটে, তবে ইয়োরোপটা বেড়াইয়া আসাই তাহার মৎলব। আজ মেলে তাহার চিঠি আসিয়াছে। চিঠির কতকগুলি কথা রমলা ভাবিতে লাগিল। ললিত লিখিয়াছে,—বৌদি, জার্ম্মানী খেল্‌নার জন্য বিখ্যাত, জান তো। কতকগুলো ক্যাটলগ পাঠালুম, কি কি খেল্‌না পছন্দ হয় লিখ। ললিত শেষাশেষি লিখিয়াছে,—বৌদি, তোমার কথা ভাবলেই, তোমার মুখের অনুপম হাসি মনে পড়ে, অমন সুন্দর হাসি দেখ্‌লে সংসারের সব দুঃখ ভুলে থাকা যায়। খোকার একটা ফটো নিশ্চয় পাঠাবে।

একটা দম্‌কা বাতাস বহিয়া গেল, ফুলগুলি পড়িয়া গেল, ছবিগুলি নড়িয়া উঠিল, জ্যোৎস্না যেন কাঁপিতে লাগিল, রমলার কেমন ভয় হইল। তাহার মনে হইল, মামাবাবু যেন তাহাকে ডাকিতেছেন, যেন অতি করুণ-স্বরে বলিতেছেন, রমলা-মা!

রমলার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। রজতকে কয়েকবার ঠেলিয়া

ডাকিল, রজত ঘুমে অচৈতন্য ; রমলা বিছানায় বসিয়া থাকিতে পারিল না, দরজা খুলিয়া বারান্দায় হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

মামাবাবুর সম্বন্ধে তাহাদের মন অতি উদ্বিগ্ন ছিল, কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীর অতি খারাপ যাইতেছে, খাওয়া কমিয়া গিয়াছে, ইক্‌মিক কুকারের রান্না ছাড়া কিছুই খান না।

তলার উঠানে ফুলের গাছে জ্যোৎস্নার আলো ঝক্‌মক্ করিতেছে, গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা শব্দ হইল। রমলা দেখিল, নিচের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের ধ্বনি কানে আসিল। মামাবাবু কি এত রাত পর্য্যন্ত রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছেন ? সে তো মামাবাবুকে শুইতে যাইতে দেখিয়াছে। আবার একটু কাতর শব্দ কানে আসিল। চকিতপদে ঘরে ঢুকিয়া রজতের লম্বা চুলগুলি টানিতে টানিতে রমলা ডাকিল, ওগো, ওগো !

ঘুম-বিজড়িত কণ্ঠে রজত বলিল, কি !

—ওগো শীগ্‌গির ওঠ।

—কেন, ক'টা বেজেছে ?

—ওগো, নিচে মামাবাবু বোধ হয় এখনও কাজ করছেন, অনেক রাত।

আ, মামাবাবুকে নিয়ে আর পারিনে, বলিয়া রজত বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। বলিল, চল।

রজত ও রমলা নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিল। নিচের ঘরে দরজার সম্মুখে আসিতেই ঘরের দৃশ্য দেখিয়া রমলা রজতের কাঁধে হাত দিয়া দরজার কাঠে ঠেসান দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

উঁচু টুলে স্থির হইয়া বসিয়া টেবিলের উপর এক হাত রাখিয়া তাহার উপর মাথা গুঁজিয়া মামাবাবু স্থির হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি কিছু ভাবিতেছেন কি ঘুমাইতেছেন ঠিক বোঝা যাইতেছে না। আর এক

হাত মাথার পাশে খোলা খাতার উপর, কলমটা হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে ; টেবিলের উপর নত মাথার সম্মুখে মাইক্রস্কোপ, তাহার পাশে স্লাইডের খোলা বাক্স। ফ্লাস্ক্, অ্যাসিডের শিশিগুলি, টেষ্ট্‌টিউব, দোয়াত, সব খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, টেবিলের কোণে মোমবাতিটি পুড়িয়া পুড়িয়া গলা মোম এক লাল রঙের বইয়ের মলাটে পড়িতেছে।

রজতের তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া কাটে নাই। সে ধীরে বলিল, দেখ, মামাবাবু কি দিব্যি ঘুমোচ্ছেন! মামাবাবু! অ মামাবাবু!

কোন সাড়া নাই।

ও, কি ঘুমোচ্ছেন, বলিয়া রজত অগ্রসর হইয়া মামার শীর্ণদেহ নাড়া দিল।

ওগো অমন করে, বলিয়া চমকিয়া রমলা রজতের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া মামাবাবুর মাথাটা অতি কোমলভাবে ধরিয়া পরম স্নেহের সহিত তুলিতেই কপোলের হিমস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁটা দিয়া উঠিল। পুরুষকে বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচার করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, নারী অন্তরের অনুভূতি দিয়া নিমেষের মধ্যে তাহা বুঝিতে পারে। রমলা মামাবাবুর শান্ত শীতল মুখের উপর করুণভাবে হাত বুলাইল, চোখ দুইটি খোলা, চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছেন, সারাজীবনও তাহা খুঁজিয়া পান নাই। রমলা অতি কোমল হস্তে চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া, খোলা শার্টের মধ্য দিয়া বুকে হাত দিল ; বরফের মত হিম অসাড় দেহ। কাতর ব্যাকুলভাবে মাথাটি টেবিলের উপর রাখিয়া সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, তার পর টুলের কাঠে কপাল আঘাত করিতে করিতে সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, মামা-মামা! সে জানে তাহার মামা আর সাড়া দিবেন না, তবু স্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রি চিরিয়া তাহার ক্রন্দন উঠিতে লাগিল, মামা, মামা!

রজত ব্যাপারটা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, অর্দ্ধরাত্রে হিষ্টিরিয়া

রোগীর মত রমলা একি পাগ্‌লামীর অভিনয় শুরু করিয়াছে। যে-চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতেছিল, তাহাকে সে আমল দিতে চাহিতেছিল না। জোর করিয়া রমলাকে মেজে হইতে তুলিয়া লইয়া বলিল, কি হয়েছে, রমলা!

ওগো! বলিয়া রমলা তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এক হাতে রমলাকে ধরিয়া আর-এক হাত সে মামার দেহে দিল। এই তো বুক ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে! ও, না, না, এ তাহার নিজের নাড়ীর স্পন্দন। মামার সমস্ত দেহ হিম, অসাড়। তবে রমলা যাহা ভাবিয়াছে তাহা সত্য। রজতের সমস্ত মগজ যেন বিদ্যুতের স্পর্শে পুড়িয়া গেল। উঃ, ওঃ, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রমলাকে ছাড়িয়া, মামাবাবুর দেহের কাছে রজত টলিতে লাগিল।

এবার রমলা আপন অশ্রু দমন করিয়া ধীরে রজতকে ধরিল, রজত রমলার বুকে মুখ গুঁজিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

সহসা টুলটা যেন একটু নড়িয়া উঠিল, সে যে নিজের দেহের আঘাতে তাহা রমলার খেয়াল হইল না। কিন্তু সে মামাবাবুর দেহে আর হাত দিতে পারিল না, শুধু মৃদুকণ্ঠে রজতকে বলিল, ওগো, ডাক্তারবাবুকে ডাক।

রমলার বেদনাতুর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রজত বলিল, একা থাক্‌তে পার্‌বে?

নিজের হাতে সেলাই-করা মামাবাবুর গায়ের শার্টের দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, পার্‌ব। শীগ্‌গির যাও। শীগ্‌গির এস।

রজত শুধু-পায়েই ছুটিল।

প্রতিদিন যেমন করিয়া এই টেবিলটি গুছাইত, তেমনি ধীর শান্ত স্তব্ধ হইয়া রমলা টেবিলের জিনিষগুলি গুছাইতে শুরু করিল। শিশিগুলিতে ছিপি দিল, বইগুলি মুড়িয়া র‍্যাকে রাখিল, ঝাড়ন দিয়া ধূলা ঝাড়িতে

লাগিল, সব কাজ যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল। শুধু মামাবাবুর হাত হইতে খাতাখানি টানিয়া লইতে দেহ একটু শিহরিয়া উঠিল, খাতার পাতার মাঝে লেখা, ৫০৩ বার পরীক্ষা হইয়াছে; শেষের খালি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মামার মাথার টাকের দিকে চাহিল। তার পর খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া উঠানের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে যন্ত্র বসাইয়া অতি সহজকণ্ঠে বলিলেন, হার্ট ফেলিওর!

রমলা একটু নড়িয়া ঘোলাটে চোখে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া চৌকাটের কাঠের উপর বসিয়া পড়িল। ধীরে রজত আসিয়া তাহার পাশে স্তব্ধ হইয়া রাত্রি-অবসানের জন্য বসিয়া রহিল।

আকাশে চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল, বাতাস উদ্দাম হইয়া উঠিল, স্তব্ধ ঘরে বাতির শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া মোম গলিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া পড়িতে লাগিল। আর অনন্তনিদ্রামগ্ন বিজ্ঞানতপস্বীকে ঘিরিয়া মাইক্রস্কোপ, টেষ্ট টিউব, ফ্লাস্ক্‌, বইগুলি প্রহরীর মত রাত্রি জাগিতে লাগিল! আকাশের তারাগুলি যেরূপভাবে অন্ধকার বাড়িটির উপর ঝুঁকিয়া তাকাইয়া রহিল, তেম্নি রাসায়নিক সরঞ্জামগুলি এই অনন্তপথিকের উপর চির-উৎসুকনয়নে চাহিয়া রহিল।

রজত ও রমলা মামাবাবুর মত অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। মৃত্যুর দেবতার রুদ্রদৃষ্টি তাহাদের উপর জাগিয়া রহিল।

২৬

দেড় মাস পরে।

এই দেড়মাসে রমলাদের সংসারে সব ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মামাবাবুর মৃত্যুর পর রজত একেবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর সে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। প্রথমতঃ শোকের আঘাত, তার পর অর্থের চিন্তা। মামাবাবু এতদিন রজতের সংসার স্নেহ দিয়া, অর্থ দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈশব হইতে রজত মামাবাবুর আদরে আব্দারে মানুষ। সেই মামাবাবুকে হারাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া গেল। মামাবাবু তাঁহার সাত আলমারি বই ও সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছাড়া কিছুই রাখিয়া যান নাই। বইগুলি তিনি কলেজের লাইব্রেরিতে দিয়া যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা ছিল। রমলা সেগুলি সযতনে গুছাইয়া সাজাইয়া কলেজে পাঠাইবার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

সকালে রজত বিছানায় এলাইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কয়েকশত টাকা আছে মাত্র, সবগুলি এখন খরচ করা ঠিক হইবে না। টাকা রোজগার করিবার কি করা যায়। টাকার জন্য সে কোনদিন ভাবিতে বসে নাই; লোককে খোশামোদ করা, চাকরি করা তাহার হয়ত পোষাইবে না। কিন্তু টাকা তো চাই। তাহার কয়েকখানি ছবি সে কয়েকজন পরিচিতকে বিক্রয় করিতে দিয়াছে। তাহার ছবি যে দেখিয়াছে সে-ই খুব প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কিনিতে কেহই চাহে নাই। বড় জমিদার-বাড়ি কি রাজবাড়ি গেলে কি সাহেব-মেমদের চোখে পড়িলে হয়ত বিক্রি হইতে পারে, কিন্তু কে বিক্রয় করিয়া দিবে? বন্ধু বলিতে তাহার প্রায় কেহই নাই, চিরকালই সে কুণো, এক সত্যিকার বন্ধু ছিল, সে দূর দেশে। সেই জার্ম্মানী হইতে ললিত তাহাকে খুব শীঘ্র কয়েকখানি

ছবি পাঠাইয়া দিতে লিখিয়াছে। নূতন ভাল ছবি আঁকিবার মত তাহার মন্ বা উৎসাহ নাই। তাহার কি কি ছবি পাঠান যাইতে পারে তাহা রজত ভাবিতে লাগিল।

রমলা ধীরপদে ঘরে ঢুকিয়া রজতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, বা, এখনও শুয়ে আছ? আজ চাল কিনে না আন্‌লে ভাত পাচ্ছ না। ওঠ, বিছানাটা রোদে দি।

নাও, বলিয়া একটু বিরক্তভাবে রজত বিছানা হইতে উঠিয়া ইজিচেয়ারে একটা বালিশ লইয়া শুইল।

বিছানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রমলা বলিল, বা মজা! আবার শুলে? দেখ, যাবার সময় ডাক্তার-বাবুর ওখানে একবার যেও তো, খোকার পেটের অসুখ একেবারে সার্‌ছে না।

রজত কোন উত্তর দিল না।

চাদর পাট করিতে করিতে রমলা বলিল, আর দেখ, মামাবাবুর বইগুলো পাঠাবার একটা ব্যবস্থা কর। আর ওই যন্ত্রপাতিগুলো তাঁর কে প্রিয় ছাত্র ছিল, তাঁকেই নয় দিয়ে দাও!

তোমার যে তর সইছে না রমলা, বলিয়া রজত বালিশটা আর একটু উঁচু করিয়া মাথায় দিল।

রমলা নীরবে বালিশের ওয়াড়গুলি খুলিতে লাগিল। কিন্তু সাংসারিক কথা না বলিলে সংসার কিরূপে চলিবে! একটু পরে রমলা ধীরে বলিল, দেখ, আজ তো রবিবার, কাল পোষ্টাফিস থেকে কিছু টাকা বের করে' এন। হাতে প্রায় কিছুই নেই, অনেক ধার পড়ে গেছে।

হুঁ, বলিয়া রজত শূন্যনয়নে রমলার দিকে চাহিল।

আর, নিচের ভাড়াটেরা বল্‌ছিলেন, তাঁদের কলটার কি খারাপ হয়ে গেছে,—

রজত কোন উত্তর দিল না।

—হাঁ, ফুড্‌টা ফুরিয়ে গেছে, বুঝ্‌লে,—আর একটা ফুড্‌ নিয়ে এস। আর, তোমার ছবির কোন্‌টা বিক্রি হল? অমর-বাবু কি ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁক্‌তে দেবেন বল্‌ছিলেন—

—তুমি একটু চুপ কর্‌বে, রমলা!

ম্লানমুখে রমলা ময়লা চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে রমলা আবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রজত তেম্‌নি এলাইয়া হতাশভাবে ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছে। সে মৃদুস্বরে বলিল, ওগো, ওঠ, স্নান করে নাও। রমলা বুঝিল আজ তাহাকে দিয়া কোন কাজ করান চলিবে না।

রজত নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

আব্‌দার-অনুনয়ের সুরে রমলা বলিল, ওগো ওঠ, এগারটা বেজেছে, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

রজত বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল, তেম্‌নিভাবে শুইয়া থাকিয়াই বলিল, ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো তুমি খেয়ে আমার ভাতটা চাপা দিয়ে রাখগে।

রমলা কঠোর কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে জিহ্বাকে সংযত করিল। সেদিনকার 'মেলে' ললিতের যে-চিঠিখানি পাইয়াছিল, তাহারি মধ্যে একটি লাইন তাহার মনে পড়িল—বৌদি, সংসারের সকল দুঃখ আঘাতে তোমার মুখের অনুপম হাসি যেন কখনও ম্লান না হয়, তাহলে রজত একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়বে। না, সে হার মানিবে না। স্থির প্রসন্নচিত্তে সে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। রজতের হাতটি টানিয়া লইয়া চুলগুলিতে হাত বুলাইতে লাগিল। হাতের ছোঁয়ায় তাহার মুখ আরও ম্লান হইয়া গেল, রজতের কপালে হাত বুলাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল, ভয়কণ্ঠে বলিল, ওগো, তোমার জ্বর হয়েছে?

করুণ কাতর চোখে রজত রমলার দিকে চাহিয়া অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, রমু।

জ্বরের আভামণ্ডিত এই পরমপ্রিয় চির-সুন্দর মুখখানির উপর কোমল আঙ্গুলগুলি বুলাইতে বুলাইতে রমলা স্নেহ-করুণচোখে চাহিয়া রহিল।

তখন বেলা প্রায় একটা হইবে। রমলা রজতের গেঞ্জি রুমাল ও খোকার জামা-কাপড়গুলি বারান্দার কাঠ হইতে তুলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। কাপড়-জামা তুলিতে তুলিতে সে বারান্দার কোণে মেজেতে রেলিং ঠেসান দিয়া বসিয়া পড়িল। রজত অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে, এখন তাড়াতাড়ি ঘরে যাইবার দরকার নাই। তাহার মনটা যখন ভারি হইত সে বারান্দার এই কোণটিতে বসিয়া তাহাদের একতলার ভাড়াটেদের জীবনযাত্রার ধারাটা দেখিত। ভাড়াটে একজন যুবক কেরানি। তিনি তাঁহার স্ত্রী, একটি খোকা ও দুইটি ছোট মেয়ে ও তাঁহার বৃদ্ধ মাতাপিতাকে লইয়া একতলার তিনখানি ঘর ও বারান্দা জুড়িয়া সংসার পাতিয়াছেন।

রমলা বসিয়া দেখিতে লাগিল নিচের রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় কেরানিবধূ উমা কিংখাবের উপর জরি ও রেশমের শিল্পকাজকরা তালিময় আসন পাতিল, আসনটি তাহার শ্বশুরের পিতার আমলের। আসনের সম্মুখে ঝক্‌ঝকে রুপার থালায় সরু চালের ধপ্‌ধপে ভাত বাড়িয়া আনিয়া রাখিল; তারপর রুপার পাথরের কাঁসার নানা আকৃতির নয়টি বাটি ভরিয়া নয় প্রকার ব্যঞ্জন থালা ঘিরিয়া সাজাইল, শ্বেতপাথরের গেলাসে জল দিয়া থালার দুইদিকে দুইটি মোমবাতি জ্বালাইয়া তাহার শ্বশুরকে ডাকিল, বাবা। প্রায় সত্তরবৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিতে দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। তিনি একদিন যে সুঠাম সুপুরুষ ছিলেন তাহা তাঁহার জরাজীর্ণ দেহ দেখিয়া এখনও বোঝা যায়; এখন বাতে পঙ্গু, একটু কুঁজো হইয়া গিয়াছেন; মুখখানি

দুঃখ-দৈন্যের তাপে কুঞ্চিত, তবু সমস্ত মুখে একটা তেজের দীপ্তি রহিয়াছে। যৌবনে তিনি লক্ষপতি ছিলেন, এখন কপর্দ্দকহীন হইয়া গরীব কেরানি পুত্রের আশ্রয়ে থাকিলেও লাখপতির খাবারের চালটা ছাড়িতে পারেন নাই। শুক্তানি, মাছের-মুড়ো-দেওয়া ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া দই মাছ, অম্বল, ক্ষীর ইত্যাদি একুশ ব্যঞ্জন না হইলে তাঁহার খাওয়া হইত না, এখন নয়টি তরকারিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, আটদিকে আট প্রদীপ জ্বালাইয়া খাওয়া ছিল তাঁহার খেয়াল ; এখন সেখানে দুইটি বাতি জ্বলে।

বৃদ্ধ খাইতে বসিলেন, উমা পাশে দাঁড়াইয়া পাখার মৃদু বাতাস করিতে লাগিল, বাতাস হইবে অথচ বাতি নিভিবে না। শাশুড়ী ঘরে বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, তিনি নামাবলী গায়ে দিয়া কাশিতে কাশিতে বাহিরে আসিয়া স্বামীর খাওয়ার তদারকে বসিলেন। স্বামীর খাওয়া দেখা ও বধূমাতার রান্না সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার রোজ চাই-ই ; তিনি তরকারি দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারিতেন কোনটায় ঝাল বেশি হইয়াছে, লবণ কম হইয়াছে ; স্বামী চাখিয়া আপত্তি করিলেও সে মতভেদ টিকিত না ; তরকারির বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার ভুল হইতেই পারে না। উমা নত মুখে দাঁড়াইয়া পাখা করিতে লাগিল, তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে দুই কন্যা আসিয়া দাঁড়াইল—একজনের বয়স চার, আর এক-জনের তিন ; দুইজনেরই বিশেষ কোন পরিধান ছিল না ; তাহার খোকাটি ঘরে ঘুমাইতেছিল, মেয়ে দুইটি মায়ের আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুরদাদার খাওয়া দেখিতে লাগিল।

এই শুভ্র-বসনাবগুণ্ঠিতা মঙ্গলকর্ম্মরতা বধূটির দিকে চাহিয়া রমলা বসিয়া রহিল। বয়সে সে রমলার চেয়ে ছোটই হইবে। উজ্জলশ্যামবর্ণ, সুগঠিত ছিপ ছিপে চেহারা, মুখখানি স্নিগ্ধতা গাম্ভীর্য্যে ভরা, মাঝে মাঝে হাসিখুশি ভাব, তরুণী গিন্নির মত। ভোর পাঁচটা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত নয়টা পর্য্যন্ত রমলা তাহাকে অবিশ্রান্ত কাজ করিতে দেখে ; বাড়িতে

ঝি নাই ; বিছানা তোলা, ঘর ঝাঁট-দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়েদের সব কাজ করা, শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা করা, সব কাজ তাহাকে করিতে হয়। স্বামীকে নয়টার মধ্যে আফিসের ভাত দিতে হয়; তারপর শ্বশুরকে নয়টি তরকারি রান্না করিয়া খাওয়াইতে একটা বাজে, শাশুড়ীকে খাওয়াইয়া রান্নাঘরের সব কাজ সারিয়া নিজে খাইতে তিনটে হয়। ঘণ্টাখানেক ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করিয়া টেবিল বিছানা ঝাড়িয়া উনানে আগুন দিতে হয় স্বামীর সন্ধ্যার জলখাবারের জন্য। রাতে তাসের আড্ডা হইতে স্বামী কোন দিন দশটা, কোন দিন এগারটায় ফেরেন। শ্বশুর মহাশয় যে এক বেলা খান, এই রক্ষা। বৃদ্ধা শাশুড়ী মালা জপিতে জপিতে বৌমাকে কখন তিক্ত কখন বা পরিহাসের সুরে সংসার চালাইবার সম্বন্ধে তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা বলা ছাড়া বিশেষ কিছু সাহায্য করেন না। অবশ্য তিনি তাঁহার নাতনীদের দুপুর সন্ধ্যা যখন খুশি গল্প বলিতে বসেন, আর নাতিটিকে দুইবেলা ঘুম পাড়ান। ছোট ছেলেমেয়েদের আটকাইয়া রাখিলে যে কি সুবিধা, কি সাহায্য হয় তাহা গৃহকর্ম্মরতা বহুসন্তানবতী মাতারা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই অবগুন্ঠিতা তরুণী বধূ নীরবে খাটিতেছে আর খাটিতেছে, মুখে চোখে ঘোমটার ঠুলি বাঁধিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের পর দিন ঋতুর পর ঋতু একই কাজের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিয়া ঘুরিতেছে,—শাশুড়ীর ঝঙ্কারে কোন সাড়া দেয় না, শ্বশুরের আদরে অতি উৎফুল্ল হইয়া উঠে না, মেয়েদের আবদারে কান্নায় বিচলিত হয় না, শুধু খোকার মিষ্টি হাসিতে মৃদু মধুর হাসে, কিন্তু তাহার সহিত একটু খেলা করিবারও সময় তাহার নাই। রমলা যখনই তাহাকে দেখে তখনই সে কোন কাজ করিতেছে—বাসন মাজিতেছে, কাপড় কোঁচাইতেছে, উনানে গোবর লেপিতেছে, খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছে। এই

নির্ব্বাক অবগুণ্ঠিতা নারীযন্ত্রটির দিকে চাহিয়া রমলার মাঝে মাঝে গা রি রি করিত, কেন সে বিদ্রোহ করে না! সে আশ্চর্য্য হইত, দিনের পর দিন অত কর্ম্ম করিবার অফুরন্ত শক্তি এ ছোটমেয়ে কোথা হইতে পায়? রমলার সহিত ভাব করিবার গল্প করিবারও তাহার অবসর ছিল না, আর নিচে হইতে চেঁচাইয়াও সে কথা কহিবে না। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু আলাপ হইত তাহাতে রমলা বুঝিয়াছিল, মেয়েটি বেশ সুখেই আছে, এত কাজের বোঝায়, এই খাটুনির জীবনের জন্য সে কোন দুঃখই করে না, এ যে তাহার ভাগ্য, কাহার বিরুদ্ধে সে নালিশ করিবে? তাহার অন্তরে কোন ক্ষোভ নাই। মনে মনে রমলা এই তরুণীবধূকে শ্রদ্ধা করিত, আপন গৃহকর্ম্মে শ্রান্তি অবসাদ বোধ হইলে এই মেয়েটির কাজকরা কিছুক্ষণ দেখিত, তখন সে নিজের বুকে বল খুঁজিয়া পাইত।

শ্বশুরের খাওয়া শেষ হইল। উমা পাখা রাখিয়া আঁচাইবার গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া দিল, খড়কে-কাঠি দিল, আসনটি তুলিয়া রাখিল। মেয়ে দুইটি পাতের উপর কাকের মত পড়িয়া ঠাকুরদার ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহার করিতে শুরু করিল। তাহার দিকে একবার স্নেহচোখে চাহিয়া উমা উপরদিকে চাহিতেই রমলার সঙ্গে চোখে চোখে চাওয়া-চাওয়ি হইয়া গেল, রমলার দিকে মৃদু মধুর হাসিয়া চাহিয়া সে শ্বশুর মহাশয়ের গামছা আনিতে ঘরে ঢুকিল।

এই কল্যাণী তরুণী লক্ষ্মীর মধুর হাসিটি রমলার এখন বড় প্রয়োজন ছিল। রমলাও তাহার দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিল, বহুদিন পরে তাহার মুখে একটু হাসি খেলিল। দুঃখ-দৈন্যের আঁধার রাতে নারীর মুখের শুকতারার দিকে চাহিয়া পুরুষ নির্ভয়ে আনন্দে তরী বাহিতে পারে, নারীর মুখের হাসির আলো না দেখিলে সে যে পথহারা। স্থির-প্রসন্ন-চিত্তে সব জামাকাপড় তুলিয়া রমলা স্বামীর রোগশয্যার পাশে গিয়া বসিল।

২৭

রজত প্রায় দুই সপ্তাহ অসুখে ভুগিল। কয়েকদিন হইল পথ্য পাইয়াছে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রমলা তখনও তাহাকে উঠিতে দিত না। সেদিন সকালে অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম রুটি চা খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া রমলা রান্নার কাজে গিয়াছিল। বিছানায় অর্দ্ধহেলান ভাবে শুইয়া প্রভাতের আলোর দিকে উদাসভাবে চাহিয়া রজত রমলার আগমন মনে মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল, বিশেষ কিছু করা বা ভাবার মত তাহার যেন শক্তি নাই। অসুখের পর রমলা তাহার অনেক কাজ কমাইয়া রজতের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছিল। তাহাকে বই পড়িয়া শোনান, অকারণ বসিয়া গল্প করা, পিয়ানো বাজান ইত্যাদি নানা চিত্তরঞ্জক কাজ করিয়া রমলা রজতকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও আনন্দিত রাখিত।

রোগশয্যায় মানুষের মধ্যের চিরকালের শিশুটি জাগে, সে নারীর সেবাহস্তের শান্তিস্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া উঠে। তখন মানুষের অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম হয়। প্রতিদিন আপন স্বার্থের অন্ধবেগে কাজের ধূলা উড়াইয়া চলিতে চলিতে ঘরের কোণে কোণে আনন্দ চাপা পড়ে; যে-সব ছোট-খাট কথা খুঁটিনাটি ঘটনা লইয়া জীবনের মালা গাঁথা সেই প্রাত্যহিক কথা ও কাজগুলির বুকে লুকান অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগশয্যায় জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত নূতন করিয়া আবিষ্কার করা যায়—একটু পাখার বাতাস, মাথায় হাতের স্পর্শ, এক গেলাস জল গড়াইয়া দেওয়া, একটু মুখের হাসি, শাড়ীর পাড়ের রং, একটু প্রভাতের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, আস্তে আস্তে কয়েকটি মিষ্ট কথা—প্রত্যেক জিনিষ নূতন রসে অনুভব করা যায়। রজতও রোগশয্যায় শুইয়া রমলাকে নূতন করিয়া পাইল।

কিন্তু রমলা ঘর হইতে চলিয়া গেলেই তাহার মন উদাস হইয়া উঠিত, কত ভাবনা আসিত, কি করিয়া সংসার চালাইবে তাহার উপায় খুঁজিয়া পাইত না !

রমলা কৈ আসিল না। সে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, তাহার কাজের দুই একটি শব্দ কানে আসিতেছে, নিশিজাগরণক্লান্ত সেবাক্লিষ্ট তাহার মুখখানি কি মিষ্টি, সেই মুখখানির দিকে অনিমেষনয়নে তাকাইয়া থাকিবার জন্য সে বুভুক্ষু। কিন্তু রমলা খাটিয়া খাটিয়া কি রোগা হইয়া গিয়াছে !

বিছানায় অর্দ্ধহেলানভাবে শুইয়া প্রভাতাকাশের দিকে চাহিয়া রঞ্জত ভাবিতেছিল, হয়ত তাহার বিবাহ করা উচিত ছিল না, হয়ত কোন আর্টিষ্টের বিবাহ করা উচিত নয়। বিধাতা তাহাকে এমন আশ্চর্য্যকর সৃষ্টিশক্তি দিয়াছেন, কিন্তু সংসারের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি এত কম দিয়াছেন কেন ! যাহাকে তিনি ভাবুক করিলেন, পৃথিবীর বস্তুর ঘা খাইতে খাইতে তাহাকে কি মরিতে হইবে ? অর্থের জন্য, সুখের জন্য সে গ্রাহ্য করে না, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুপুঞ্জকে তুচ্ছ করিয়া সাতরং-এর স্বপ্নালোকে সে আনন্দে বাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীকে সে কিরূপে দুঃখের ভার বহিতে দিবে ?

সে ছবি আঁকিতে পারে, তাহার কি দাম নাই ? এদেশে এ সমাজে সে কি বাজে লোক ? যতীন যে বলিয়াছিল, সে ভাগাবণ্ড, তাহার চেয়ে কলের মজুরের, অফিসের কেরানির বেশি দাম, তাহার চেয়ে যান্ত্রিক ও ব্যবসাদারের এদেশে বেশি দরকার। আচ্ছা তাই মানিয়া লইলাম, তাহা হইলেও আর্টিষ্টের কি দরকার নাই ? আছে, বড়লোকের ছবি আঁকিতে পার, বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিতে পার, বর্ত্তমান বণিক্-সভ্যতার এক যন্ত্র হইতে হইবে। যে-সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর স্পর্শে প্রাণের শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার এক-একটি পাপ্‌ড়ি সে সমাজকে দিতে চায়, তাহার

দাম সে চায় না, কেন না, একটা ছবির কত দাম কে ঠিক করিতে পারে? সে শুধু চায় তাহার স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে শান্তিতে থাকিতে, আর্টিষ্টের যেমন জীবন যাপন করা দরকার, সমাজ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিক। কিন্তু সমাজ তো প্রেমের সম্মিলনের ভূমি নয়, এ যে সংগ্রামের ক্ষেত্র, এ অর্থের জন্য বীভৎস হানাহানি কাড়াকাড়িতে শিল্পী যে যোগ দিতে অসমর্থ।

ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া রজত দরজার দিকে তাকাইল, রমলা যদি আসিয়া পড়ে তবে তাহার ভাবনার স্রোত বন্ধ হয়। দেখিল খোকা তাহার পুতুলের বোঝা লইয়া মাতালের মত অসম পদক্ষেপে ঘরে আসিয়া ঢুকিল—তাহার দুই বগলে টেডী ভাল্লুক ও কুকুর, দুই হাতে এক বাঁদর ও এক নিগ্রো মেয়ে। পুত্রকন্যাদের বোঝায় সে বিব্রত হইয়া ডাকিল—বাবা! শিশুর হাস্যে ও আহ্বানে রজত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কলালক্ষ্মীর সৌন্দর্য্যকমলের এই একটি পাপ্‌ড়ি আজ তাহার দুয়ারে আনন্দের অতিথি, সেই অতিথিকে যথোচিত সমাদর করিতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। খোকা ও তাহার খেল্‌না লইয়া রজত খেলিতে শুরু করিল। খোকা আব্‌দার জুড়িল, বাবা বাঁশী। ডেস্‌ক হইতে বাঁশী বাহির করিয়া রজত বাজাইতে শুরু করিল, আর খোকা এক কোলে বাঁদর ছেলেটিকে আর এক কোলে কাফ্রী মেয়েটিকে লইয়া চুল দোলাইয়া মাথা হেলাইয়া কোমর বাঁকাইয়া শিশু কৃষ্ণের মত বাঁশীর সুরে সুরে নাচিতে শুরু করিল। সে মধুর আনন্দদৃশ্যে রজতের শিল্পীপ্রাণ জাগিয়া উঠিল। এইটুকু দেহের ভিতর অসীম মাধুর্য্য ভরা—সে যাহা করে তাহাই সুন্দর মধুর। সে যখন বালিশে কাত হইয়া ঘুমায়, সে যখন জাগে, সে যখন কথা কয়, সে যখন নীরবে চাহিয়া থাকে, সে যখন হাসে, সে যখন মুখ ভার করিয়া ঠোঁট ফুলায়, সে যখন চলে, সে যখন চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, সে যখন বসে, যখন বসিতে বসিতে

শুইয়া পড়ে, সে যখন বাঁদরটাকে আদর করে, সে যখন মেয়েটাকে মারে, সে যখন খায়, যখন মিছামিছি ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়—তাহার সব কাজের ভঙ্গী, দেহের সব গতি কি সৌন্দর্য্যে ভরা, কি মিষ্ট। এখন তাহার হীরার মত দুইটি চোখ জ্বলিতেছে, কাফ্রী মেয়েটিকে বুকে জড়াইতেছে, পা দুইটি নৃত্যদোদুল হইয়া উঠিতেছে—এ মধুর ছবিটি রজত একা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। সে রমলাকে ডাকিল, ওগো দেখে যাও, দেখে যাও।

রমলা রান্নাঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল, কি, আমার মাংস পুড়ে যাবে, এখন যেতে পারব না।

রজত আনন্দে উচ্চস্বরে ডাকিল, ওগো, একটু পুড়ুক, তুমি শীগ্‌গির এস।

এক হাতায় দুই খণ্ড মাংস লইয়া রমলা দরজা খুলিয়া চকিতপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, কি ? বা বা বেশ নাচ হচ্ছে, তুমিও শুরু কর।

—তুমিও এস, ওর না হয় কাফ্রীমেয়েটা আছে।

—যাও। দেখ তো মাংসটা কেমন হয়েছে। বলিয়া এক টুক্‌রা মাংস রজতের মুখে পুরিয়া দিল।

রজত খাইতে খাইতে বলিল, বা বেশ হয়েছে, তুমি বাস্তবিকই লক্ষ্মী; বিনা নুনে মাংস রাঁধ্‌তে পার, অথচ কি মিষ্টি।

—বা নুন দিইনি বুঝি, বলিয়া অপর মাংসখণ্ড নিজের মুখে পুরিয়া হাতাটা রজতের হাতে দিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া মাংস চিবাইতে চিবাইতে চুমো খাইতে শুরু করিল!

রজত বলিল, কি, আমায় রান্নাঘরে যেতে হবে ?

না, গো না, তোমরা নাচো গাও, বলিয়া হাতাটা রজতের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খোকাকে নামাইয়া রমলা ত্বরিত পদে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া মাংসে লবণ দিতে দিতে সে মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিল,—

বিনা নুনে রাঁধ, সাজ
বিনা চূণে পান,
টাকা বিনা বিয়ে করে'
কর নাচ গান।

এরূপ রমলা-রচিত গান অনেক আছে। তাহারই আর একটি গান একটু বদল করিয়া রজত খোকাকে কোলে দোলাইতে দোলাইতে গাহিতেছিল,—

ওরে আমার খোকা
হোস্‌নেরে তুই বোকা,
তোর বাবা আস্ত গাধা,
তোর মা মস্ত ধাঁধাঁ,
রাঁধেন শুধু ধোঁকা,
খাওয়ান শুধু ধোঁকা।

রজতের যখন গান শেষ হইল তখন সে শুনিতে পাইল, রমলা আর-একটি শুরু করিয়াছে,—

রাঁধি গো রাঁধি, যাই গো রেঁধে,
মাটির উনুন জ্বলে গো, কোমর বেঁধে
রাঁধি গো, রাঁধি···

কিছুক্ষণ খোকার সহিত খেলা করিয়া রজত ক্লান্ত হইয়া খোকাকে ছাড়িয়া দিল। নারী তাহার শিশুকে লইয়া ভুলিতে পারে, কিন্তু পুরুষ তাহা পারে না। সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যে শিশুই নারীর আনন্দের আশ্রয়, তাহার স্বপ্নের স্বর্গ, শান্তির ক্রোড়, প্রতিদিনের নবজীবনের শক্তির উৎস। পুরুষ শিশুর মধ্যে পূর্ণ শান্তি পায় না; সে যে বীর, সে নারীকে

প্রেম দিয়া জয় করিয়া আপন পৌরুষ দিয়া গর্ব্বের সহিত বহন করে, নারীকে সুখে আনন্দে রাখাতেই পুরুষের আনন্দ-সার্থকতা। বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া রমলার দুঃখের কথা ভাবিয়া রজতের মনে ধিক্কার হইল। অসুখ হইবার আগে তাহার এক বন্ধু এক আফিসে চাকরির সন্ধান দিয়াছিল, রজত চাহিলে তাহার পিতার সুপারিসে চাকরিটি হইতে পারে। রজত ভাবিতেছিল, চাকরিটি লইবে কি না রমলাকে ডাকিয়া পরামর্শ করে।

খোকা রান্নাঘরে আসিয়া জ্বালাতন করাতে রমলা তাহার পিঠে অতি মৃদু আঘাত করিল। আঘাতের ব্যথায় নয়, অভিমানে খোকা কান্না শুরু করিল। সে কান্না রজতের কানে সূচের মত আসিয়া বিঁধিতে লাগিল, বারিভূষিত কদম-গাছটির দিকে চাহিয়া তাহার যেন কান্না পাইল। বুঝিল বহুদুঃখে রমলা খোকার গায়ে হাত দিয়াছে।

খোকার কান্নার দিকে স্নেহকরুণনয়নে চাহিয়া মাংসটা উনান হইতে নামাইয়া রমলা খোকাকে কোলে করিয়া শোবার ঘরে গেল। খোকা মায়ের গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, কিন্তু রমলা তাহাকে দোলায় বসাইয়া একটু দোল দিতেই সে হাসিয়া উঠিল। তাহার জন্য দই ও রসগোল্লা আনিতে দিবে ভাবিয়া পয়সা লইবার জন্য বাক্স খুলিয়া দেখিল মোটে তিনটি পয়সা পড়িয়া আছে। সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে যা-কিছু আনা হইয়াছিল সব রজতের অসুখে খরচ হইয়া গিয়াছে। ম্লান হাসিয়া খোকার গালে চুমো খাইয়া মৃদু দোলা দিতে দিতে রমলা গানের সুরে বলিয়া উঠিল,—

Money, money money,

Brighter than sunshine, sweeter than honey! এই বিজাতীয় কথাগুলি শুনিয়া খোকা মায়ের দিকে ভর্ৎসনাকরুণ নয়নে চাহিতেই রমলা হাসিয়া তাহাকে বুকে করিয়া তুলিয়া চুমো খাইয়া বলিল—

এই যে আমার মণি, মণি, মানিক! এটা হচ্ছে brighter than sunshine, sweeter than honey.

খোকার কান্না কানে আসিতে রজত একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিছানা হইতে উঠিয়া দরজা পার হইয়া বারান্দায় বাহির হইতেই রমলার ক্লান্তকরুণস্বর তাহার কানে আসিয়া কহিল, money, money, money.

তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। আর সে অগ্রসর হইয়া রমলার কাছে আসিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিয়া সেই বন্ধুকে চিঠি লিখিতে বসিল, সে কেরানির চাকরি লইবে। চিঠিখানি শেষ করিয়া রজত চুলগুলি রোগশীর্ণ আঙ্গুল দিয়া টানিতে টানিতে অতি অবসন্ন হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। শুষ্ক কদমগাছে একটি শীর্ণ পাখী বসিয়া আছে, একটি খোঁড়া কুকুর পোড়ো-জমির আঁস্তাকুড়ে আহারের সন্ধান করিতেছে। প্রভাতের প্রখর আলোর দিকে চাহিয়া থাকিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। সে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল, কখন রমলা আসিবে।

রমলা তখন চেয়ারে দুলিতে দুলিতে খোকাকে বুকে করিয়া আদর করিতেছিল, মণি আমার, রাজা আমার, মানিক আমার,

২৮

সেই সময় যতীন তাহার আলিপুরের বাড়িতে ঘুম হইতে জাগিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল। রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়াছে, আজ উঠিতে একটু বেলা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সে দুঃখিত নয়, সদ্যজাগ্রত দেহ-মনে আজ কিসের সুখ ভরিয়া উঠিতেছে। চাকর

আসিয়া জান্‌লার পর্দ্দা সরাইয়া জান্‌লাগুলি খুলিয়া দিল। পাশের ঘরে গরমজল, টুথব্রাস, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম পূর্ব্বেই ঠিক করা ছিল। যতীন কিছুক্ষণ ঘরের আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি পূর্ব্বের চেয়ে একটু রুক্ষ হইয়াছে, চোখে গর্ব্বের তেজ, নাকে শক্তির অহঙ্কার, ঠোঁটে একটা দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছে—এই জাগরণফুল্ল মুখখানি দেখিয়া তাহার অন্তর কোন সুখে ভরিয়া উঠিল। যতীন দাড়ি কামাইয়া স্নানের ঘরে গিয়া গরম-ঠাণ্ডা জলের ধারাযন্ত্রে স্নান করিয়া তারপর চা আনিতে হুকুম দিল। সর্ব্বক্ষণই তাহার চোখে মুখে জয়গর্ব্বের এক চাপা হাসি ভরা। সে যখন টেবিলে বসিয়া মাংসরোষ্ট খাইতে লাগিল, ঠোঁটের আগায় চোখের তটে সেই হাসি জড়ান; খাওয়া শেষ করিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্যাণ্ট্‌-কোট পরিতে পরিতে সেই বিজয়গর্ব্বের ভঙ্গী সমস্ত দেহে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

শক্তির মাদকতায় ও অহঙ্কারে সে যে দিন দিন মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পুরাতন বাড়ি ছাড়িয়া কয়েকমাস হইল তাহারা এই নূতন প্রাসাদে আসিয়াছে। আগেকার বাড়ি বেশ ভালই ছিল, কিন্তু তাহার মত ধনী ব্যবসাদারের আরও বড় বাড়িতে থাকা দরকার। এই নূতন বাড়িতে বাস তাহার গর্ব্বের আনন্দের কারণ নয়, এ বিজয়-হাস্যের কারণ বলিতে গেলে অনেক। প্রথমতঃ কাগজ তৈরি করিবার যে-নূতন যন্ত্রটি জার্ম্মানী হইতে আসিয়াছে, দুইদিন অবিশ্রাম খাটিয়া কাল রাতে যন্ত্রটির সব রহস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে, সে যন্ত্রজয়ী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এক বড় ব্যাঙ্কের বাড়ি তৈরি করিবার কন্‌ট্রাক্ট্‌ সে গতরাত্রে ক্লাবে সাহেবের সহিত কথা কহিয়া জোগাড় করিয়াছে, আজই তাহা সহি হইবে। তৃতীয়তঃ কাগজ তৈরি করিবার জন্য যে নূতন লিমিটেড কোম্পানি গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার

অর্দ্ধেক মূলধন উঠিয়া গিয়াছে, এক ধনী ইহুদী কাল দুই লক্ষ টাকার শেয়ার লইবেন বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে আজ দুপুরেই যাইতে হইবে। এখন সে চারটি লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আর চতুর্থতঃ, কারখানার যে-শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তাহারা দিন পনের কোনমতে ধর্ম্মঘট চালাইয়া কাল দ্বিপ্রহরে একটা মিট্‌মাটের জন্য আবেদন করিয়াছিল, যতীনেরই প্রায় সব শর্ত্তেই তাহারা রাজী হইবে। তাহাদের সহিত কিরূপ শর্ত্তে মিট্‌মাট্‌ করা যায় তাহা ভাবিতে ভাবিতে যতীন একটু শক্ত করিয়া গলায় টাইটা বাঁধিতে লাগিল। জার্ম্মান ফ্যাশানে কাটা তাহার ছোট খাড়া চুলগুলির উপর ব্রাশ ঘষিতে ঘষিতে তাহার মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা ভুল হইতেছে। কাঁচকড়া-ফ্রেমের চশমা পরিয়া চুরুটের পাইপে আগুন ধরাইতে গিয়া মনে পড়িল, ঠিক, কাল মাধবী কিছু টাকা চাহিয়াছিল। পকেট হইতে চেক-বুক বাহির করিয়া খুব বড় অঙ্কের এক চেক মাধবীর নামে লিখিয়া দিয়া খামের ভিতর পূরিয়া চাকরকে মেমসাহেবের কাছে চিঠিটা দিয়া আসিতে বলিল। তার পর পাইপ টানিতে টানিতে ব্যাঙ্কের বাড়ির একটা প্ল্যান ছড়ির মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তেম্নি জয়গর্ব্বিত বক্র হাসি মাখান মুখে তাহার মিনার্ভা কারে গিয়া উঠিল।

মাধবী তখন তাহার ড্রেসিংরুমে আল্‌মারি খুলিয়া দীপ্তনেত্রে তাহার কাপড়-জামাগুলি দেখিতেছিল। আজ সন্ধ্যাবেলায় তাহার বাড়ির পার্টিতে কোন্ রংএর কোন্ শাড়ীখানি পরিবে তাহাই সমস্যা। আল্‌মারি-ভরা কত রকমের কাপড়-জামা, কত রংএর—কোনটা রক্তের মত লাল, কোনটা ভোরের আকাশের মত নীল। আয়নায় নিজের মুখখানি ও দেহের রং ভাল করিয়া দেখিল, বাহিরের প্রকৃতির রং দেখিল, আজ কি রং পরিলে ইহাদের সহিত ঠিক মানাইবে? শাড়ীর পর শাড়ী কার্পেটের

উপর টানিয়া ফেলিতে লাগিল, কোনটাই মনের মত হয় না। Oh how boring বলিয়া মাধবী সাতরংএর স্তূপীকৃত শাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া এক ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। জান্‌লা দিয়া এক ফুলের ঝাড় চোখে পড়িল। তাহার মন উদাস হইয়া গেল, বহুদিনের এক স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল, যেন কোন সুখজন্মের অতিমধুর কথা। হাজারিবাগে এক প্রভাতে রজত আসিবার পরদিন সে এইরূপ সমস্যায় পড়িয়াছিল, সে দিনও তাহার মনের মত শাড়ীটি সে খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু আজ যে সে শাড়ী বাছিতেছে সে কি কাহাকেও দেখাইবার জন্য? মোটেই নয়, ভাল সাজিবার নিছক আনন্দ ছাড়া তাহার আর কি আনন্দ আছে? কেন পুরুষকে আর সে ভুলাইতে চায় না, পুরুষের প্রেমের উপর তাহার বিতৃষ্ণা হইয়াছে, পুরুষদের সে ঘৃণা করে।

কিন্তু হাজারিবাগের কথা মনে পড়িতে মনটা কেমন ভারি হইয়া গেল। কিসের অজানা গোপন বেদনা। আপন মানসিক দুর্ব্বলতার চঞ্চলতায় যেন লজ্জিত হইয়া মাধবী বক্র হাসিয়া ইজিচেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সম্মুখে যে লালশাড়ীটি পাইল তাহাই পরিয়া আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যই তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু রক্তবস্ত্রপরিহিতার দেহভঙ্গিমায় যেন যৌবন প্রলয়ঙ্করী সহস্রশিখায় জ্বলিতেছে। আপনার রূপ দেখিতে দেখিতে সেই রূপকে ব্যঙ্গ করিয়া মাধবী বিদ্রূপের হাসি হাসিল। এই হাসির উদাস ভঙ্গী এই চোখের বক্র চাহনি দেখিলে সবাই ভয় পাইত, তাহার ক্ষুরধারসম তীক্ষ্ণ জিহ্বা দিয়া না জানি কি তীব্র কথাগুলি বাহির হইবে। বাক্‌-চাতুরীর জন্য সে বন্ধুসমাজে পার্টিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ব্যঙ্গোক্তি তাহার তিক্ত পরিহাস সকলেই যেমন শুনিতে ভালবাসিত তেমনি বুঝিতে ভয় করিত। তাহার সত্য কটু কথার পিছনে কেবল সত্য বলিবার তীব্র

আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহাতে তৃষিত জীবনের হতাশ্বাস ছিল, ব্যর্থপ্রেমের অন্তর্গূঢ় জ্বালা ছিল, সমাজের অনুশাসনের উপর বিরক্তি বিদ্রোহ ছিল, বাস্তবজীবনের প্রতি ব্যঙ্গ ছিল। মরুভূমির মত শূন্য জ্বালাময় অন্তর হইতে তাহার কথার স্ফুলিঙ্গ বাহির হইত।

কিন্তু আজ তাহার মুখের হাসি বেশিক্ষণ রহিল না। অন্তরের কোন বিরহিণী চিরবেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মাধবী এলাইয়া ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িল, শাড়ীর স্তূপের দিকে করুণ-চোখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, এমনিভাবে কত প্রভাত হাজারিবাগের অবারিত রক্তিম প্রান্তরের দিকে চাহিয়া সে কাটাইয়াছে। সে চাওয়ায় প্রতীক্ষা ছিল, সুখ ছিল, আশা সোনার জাল বুনিত ; আর আজ শুধু জ্বালা, জ্বালা, বিরক্তি, ব্যঙ্গ, ব্যর্থতার বোঝা। আবার হাজারিবাগের সেই দিনগুলি ফিরিয়া পাওয়া যায় না ?

আবার মাধবী আপন অন্তরের এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ভাবপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

২৯

আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। কলিকাতার গরীব কেরানি-সংসারে সহজ সুখে দুঃখে ব্যথায় হাসি-কান্নায় দিনের পর দিন যেমন একটানা কাটিয়া যায়, ঠিক তেমনিভাবে কাটিল না বটে, তবু রমলাদের বাড়ির একতলার সংসারযাত্রার সহিত দোতালার জীবনধারা প্রায় একই রূপ ধরিতে লাগিল। সুখের দিন নানাবর্ণময় ঘটনাবহুল, তাহার নানা গতি, নানা ছন্দ ; কিন্তু দুঃখের দিন একটানা চলিয়া যায়,—তাহার এক কালো রংএ সব রং, তাহার একটানা ক্লান্ত করুণ সুরে সব সুর মিশিয়া মিলিয়া যায়।

রজত ও রমলা যৌবনের সেই রঙীন স্বপ্নরাজ্য হইতে সহসা সংসারের রৌদ্রঝঞ্ঝাময় সংগ্রামপথে আসিয়া পড়িয়া তাহার আঘাতে দিন দিন অন্তরে পীড়িত হইতে লাগিল। প্রভাতের আলোর রঙীন মায়া কাটিয়া গিয়াছে, এবার সম্মুখে খররৌদ্রময় পথ, এই পথে দুইজন দুইজনের হাত ধরাধরি করিয়া যাইতে হইবে।

এই বৎসরের প্রধান ঘটনা, রমলার এক কন্যাসন্তান হইল। এই কন্যাটিকে পাইয়া তাহার খুব শান্তি বোধ হইলেও, চিন্তা বাড়িল, কেননা খরচ বাড়িল। খোকা এখন দুরন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সে আপনমনে ঘুরিয়া বেড়ায়, দিন দিন পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতেছে, এখন এই খুকীকে পাইয়া রমলা এক নতুন আনন্দের খনি খুঁজিয়া পাইল।

সংসারদুঃখের বোঝাটা রমলার খুব বেশি বোধ হইত না। সে তাহার খোকাখুকী, সংসারের খুঁটিনাটি কাজ লইয়া আনন্দেই থাকিত। সুখ ভোগ করা, সব কাজ হইতে আনন্দ নিংড়াইয়া লওয়া তাহার ধর্ম্ম ছিল, ইচ্ছা করিয়া কোনপ্রকার দুঃখ বাড়ানকে সে ভীরুতা মনে করিত। শ্রান্ত হইলেও সে কখনও বিরক্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িত না, মাধবীর মত কখনও মুখ ফুটিয়া বলিত না, I am so bored। রজতের জন্য নতুন নতুন রান্না করা, খোকাখুকীকে স্নান করান, খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, ঘর-গোছান ইত্যাদি সংসারকর্ম্মে তাহার অন্তরের মাতৃলক্ষ্মী জাগিয়া তাহাকে আনন্দ-মণ্ডিত করিয়া রাখিত। ঘরের টেবিল-চেয়ার খাট সব জিনিষ তাহার যেন সঙ্গী ছিল, তাহার ভাঁড়ারঘরে চিনি লবণ ইত্যাদি ভরা হরলিকের শিশির সারি, রান্নার মশলা ভরা বিস্কুটের চায়ের টিনের কৌটাগুলি, নানা জিনিষভরা আম-চাটনির শিশিগুলি—সব জিনিষের প্রতি তাহার যেন মাতৃস্নেহ ছিল, তাহাদের নাড়িয়া ঝাড়িয়া গুছাইয়া ঠিকভাবে সাজাইয়া তাহার দিন সহজ আনন্দে কাটিত। সেই গিরিঝর্ণার অকারণ

কৌতুক, উচ্ছল হাস্য, প্রাণখোলা গীতঝঙ্কার আর শোনা যাইত না বটে, সে ঝর্ণা এখন সমতলভূমে আসিয়া স্নিগ্ধ ও করুণ সুরে বাজিতেছে, সে নৃত্য ভঙ্গিমা প্রাণোচ্ছ্বাস গিয়াছে, এ ধীর স্নিগ্ধ ধারা।

কিন্তু রজতের কাছে জীবনটা দিন দিন বোঝা হইয়া উঠিতে লাগিল। সকালে রমলার উঠিবার অনেক. পরে সে উঠে, চা খাইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পায় না, কোনদিন খোকাকে ধরিয়া তাহার ছবি আঁকিতে বসে বা বাজার করিতেই বাহির হইয়া যায়, কোনদিন খবরের কাগজটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়ে ; রমলার রান্নাঘরে বড় যায় না। সকাল সকাল খাইয়াই আফিস ছুটিতে হয় ; সন্ধ্যাবেলা শ্রান্ত হইয়া আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে খুঁজিয়া পায় না। কোন সন্ধ্যায় কোন বন্ধুর বাড়িতে তাসের আড্ডায় যায়, কোন সন্ধ্যা চুরুট টানিতে টানিতে কোন নভেল লইয়া পড়িতে বসে। চুরুটটা বিবাহের পর সে একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল, আফিসে ঢুকিয়া আবার আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় রমলা আসিয়া পাশে বসে বটে কিন্তু গল্প জমে না, সাংসারিক খুঁটিনাটি কথা আলোচনা করিতে তাহার ভাল লাগে না। দুইজনে একসঙ্গে পড়া বা গল্প করা বড় ঘটিয়া উঠে না। কোন গভীর রাত্রে তাসের আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রজত দেখে রমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; কোন রাতে রমলা রান্নাঘরের সব কাজ সারিয়া আসিয়া দেখে, রজত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দিন দিন রজতের দেহ-মন শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, এ বর্ণহীন বৈচিত্র্য-হীন কেরানি-জীবনে বুভুক্ষিত শিল্পীপ্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত ; কিন্তু নতুন কেরানি মানুষটি দাবাইয়া বলিত—চুপ রও, জীবনের বোঝা বও।

বোঝা অনেকরূপে বহন করা যায়। রজত বহিত, ঘোড়া যেমন তাহার পিঠে গাড়ির বোঝা টানে ; কিন্তু রমলা বহিত, নদী যেমন আপন বুকে তরীর বোঝা বয়। সংসারের কাজ করিতে করিতে সে যে গুন্‌গুন্

গান গাহিত তাহা আনন্দের সুরেই, কিন্তু রজতের কানে তাহা বড় করুণ লাগিত।

রজত ভাবিত, তাহার সেই স্বপ্নলোকের রমলা, তাহার প্রিয়া বুঝি মরিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাসূর্য্যাস্তের শরৎ আকাশের মত তাহার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সে খুঁজিত, কোথায় সেই মোহিনী রমলা, তাহার মন-মাতানো রূপ, মদের মত ফেনিল, পুষ্পসৌরভের মত আবেশময়? এ মুখ বড় করুণ মধুর। সে বেশ বুঝিতেছিল, দিনের পর দিন তাহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বিচ্ছেদের জাল রচিত হইতেছে, সেই অতি সূক্ষ্মতন্তুময় পর্দ্দাটা একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিতে তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। কোন দিন বিকালে আসিয়া সে দেখিত রমলা হয়ত বাসন মাজিতেছে, ঝি আসে নাই। ঝি আসিলেও রমলা মাঝে মাঝে বাসন ধুইতে বসিত, ঝির ধোওয়া পছন্দ হইত না। বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরে রমলার বাসনমাজায়, রজত যে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাইত, আজ সে সৌন্দর্য্য কোথায়? রজত গভীর বেদনা বোধ করিত, নিজের উপর তাহার ঘৃণা হইত; এই দৃশ্যটা, ওই বাসনমাজার ঝক্‌ঝক্ শব্দটা সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। কোনদিন দেখিত কাজের তাড়াতাড়িতে একটু বিরক্ত হইয়া রমলা অতি ধীরেই খোকার গায়ে চাপড় মারিল বা হাতা দিয়া মাথায় একটা ঘা দিল। এখন খোকা আস্তে মারাতে কাঁদে না, কিন্তু ওই মৃদু আঘাত রজতের গায়ে ছিপটির ঘায়ের মত বাজে। কোনদিন দেখিত ভাঙ্গা পিয়ানোটুলে বসিয়া রমলা খোকাকে পিয়ানো বাজান শিখাইতেছে, পিয়ানো খারাপ হইয়া যাওয়াতে মাঝে মাঝে বেসুরে বাজিতেছে, সে ভুল সুরে যে রমলার অন্তর পীড়িত হইয়া যাইতেছে, তাহা সে বুঝিত। কিন্তু রমলা হাসিমুখেই খোকাকে পিয়ানো বাজান শিখাইতেছে। রজত পিয়ানোর পাশে একটু দাঁড়াইত, রমলা রজতের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ-মুখে হাসিত, রজত চলিয়া যাইত, এ দৃশ্যও তাহার

ভাল লাগিত না, ওই মাতাপুত্রের আনন্দ জগতে তাহার যেন প্রবেশের অধিকার নাই।

মাঝে মাঝে রমলার উপর রজতের রাগ হইত। ঘরের প্রতি কোণ ফিটফাট সাজান, প্রতি জিনিষ ঝাড়া, মেজেটা মোছা চক্‌চক্ করিতেছে, বিছানা কাপড়-জামা সব ধপ্‌ধপ্ করিতেছে, কোথাও একটু ধূলা নাই। বস্তুতঃ, দিন দিন রমলার ধূলার প্রতি দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কি বাসনে, কি জামাকাপড়ে, কি ঘরে, কোথাও একটু ময়লা সে সহ্য করিতে পারিত না। তার পর, রোজ ঠিক সময়ে সে খাবার দেয়, প্রতি তরকারি কি সুন্দরভাবে রান্নাকরা, কোন গৃহকর্ম্মে একটু অবহেলা অবসাদ অনাদর নাই। কেন রমলা এত খাটে? তাহাকে কিছু বলিতেও রজতের সাহস হইত না, তাহাকে যেন সে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুধু নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে রমলা একটু উদাসীন ছিল। একদিন সাহস করিয়া পরিহাসের সুরে রজত বলিল, ওগো তোমার সাদাকাপড় যে গেরুয়া রংএর হয়ে উঠ্‌ল, বৈরাগিনী হলে নাকি?—তার পর হইতে কোন দিন রমলাকে ময়লা কাপড় পরিয়া তাহার সম্মুখে আসিতে রজত দেখে নাই। আর, তাহার অকলঙ্ক মুখের অনুপম হাসি—এ হাসি দেখিলে রজত মনে মনে বল পাইত, আবার এ হাসি দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহার ক্ষোভ হইত। কেন রমলা তাহার জন্য সর্ব্বদাই হাসিবে,—কেন সে মুখভার করে না, একটু দুঃখের কথা বলে না, কেন বলে না তাহার মত সেও জীবনের ভারে নুইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত রজতের রূপকথাপুরীর রমলা জাগিয়া উঠিত, তাহার সন্তানসেবা গৃহকর্ম্ম সে ভুলিয়া যাইত, কল্যাণীমাতা মোহিনী-নারীরূপে পরম মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিত। সে সুখের দিনগুলিতে রজত আপনাকে ধন্য মানিত। কোন বর্ষার দিনে চেয়ারে দুলিতে দুলিতে সহসা রমলা লাফাইয়া উঠিয়া ভাঙা পিয়ানোর উপর প্রেমিকের মত

পড়িয়া সুরের ঝঞ্ঝা তুলিত—বেঠোভেন বধির হইয়া যাইবার পর যে-সব সিম্‌ফনিগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলির অংশ বাজাইত। কোন জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় রমলা রান্না ফেলিয়া ঘরে রজতের কোলের কাছে আসিয়া বসিত, অকারণে উচ্ছলহাস্যে কত অর্থহীন গল্প শুরু করিত। কোন ছুটির দিন দুইজনে খোকাকে লইয়া কোথাও বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িত। খুকী উমার তত্ত্বাবধানে থাকিত। যেদিন তাহারা আলিপুরের বাগানে গেল, সেদিন খোকা না রমলা কে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হইল, তাহা রজত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এই বেড়ানর মধ্যেও মাঝে মাঝে মন উদাস হইয়া যাইত, পুরাতন বৎসরের সুখস্মৃতি-গুলিতে দুইজনের মন ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু এ সুখের দিনগুলিও ক্রমে ক্রমে অতি কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাহিরে কোন প্রকাশ না হইলেও রমলার মগ্নচৈতন্যলোকে ভাঙন বহুদিন ধরিয়াছিল। পরের বৎসর তাহার প্রকাশ শুরু হইল। তাহার কল্যাণময় হাসির তলে তলে যে অন্তরতম বেদনার অশ্রু ফল্গুনদীর মত বহিতেছিল। প্রথমে রমলা আপনার আত্মার এই দুর্ব্বলতাকে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু যখন দুঃখের দেবতা তাহার অন্তরের ব্যথার ইতিহাস তাহার চোখের তটে তাহার গণ্ডের কোণে কপোলতলে তাহার এলায়িত দেহে লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সে না মানিয়া থাকিতে পারিল না।

পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত ঘটিল। সমস্ত মন ওলটপালট হইয়া গেল। রজতের মধ্যে যে-অবসাদ ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তাহা ঝঞ্ঝার মেঘের মত রমলার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। পুরুষ অপেক্ষা নারী অতি অল্প সময়ে অতি রুদ্রতালে নবরূপ লইতে পারে; প্রাণকে তাহারা জন্ম দেয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণের লীলা অতি চঞ্চলভাবে হইতে পারে; নতুনরূপ লইতে তাহাদের অল্প-সময় লাগে। পরিবর্ত্তনের ধারা রমলার মধ্যে অতি-

দ্রুত বহিয়া জীবনের আনন্দময় কূল হইতে তাহাকে অবসাদের কূলে নিমেষে তুলিয়া দিল। রজতের তাহা যখন চোখে পড়িল, সে দেখিল যে রমলা হইতে সে যেন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। নারী প্রবহমান নদীধারার মত, যে-মানুষ তাহাকে ভালোবাসে সে আপন জীবনের প্রেমতট দিয়া সেই ধারাকে বাঁধিয়া যদি তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তবেই মঙ্গল।

পর বৎসর রমলার দেহ মন যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল। শুধু শ্রান্তি নয়, শূন্যতা, ব্যর্থতার বোধ। রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে গিয়া সহসা তাহার হাসি মিলাইয়া যাইত, সে মুখ ফিরাইয়া লইত। খোকাকে চুমো খাইতে গিয়া একটি চুমো দিয়া চোখে জল ভরিয়া আসিত। সে কোন প্রভাতে রাঁধিতে রাঁধিতে উনানের ছাইগুলির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিত, ভাত ধরিয়া যাইত, মাছ পুড়িয়া যাইত। কোন রৌদ্রধূসর উদাস স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘর ঝাড়িতে ঝাড়িতে দেহ যেন এলাইয়া পড়িত, চেয়ারে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃদু দুলিত; কখনও কখনও বা বই গোছাইতে গোছাইতে, জামা সেলাই করিতে আর ভাল লাগিত না, মাদুরে হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িত, ঘুম হইত না। কোন মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় সে বারান্দার কোণে চুপ করিয়া বসিত, একতলার জীবনধারাটাও ভাল লাগিত না, নারিকেল গাছগুলির উপর মুমূর্ষু আলোর আভার দিকে চাহিয়া থাকিত, খুকীকে বুকে টানিয়া লইত, বুকে শান্তি পাইত না। কোন জ্যোৎস্নারাতে পশ্চিমদিকের বারান্দায় মেজেতে শুইয়া পড়িত, কদমগাছের মাথায় তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত,—একা, বড় একা বোধ হইত। বড় শ্রান্ত, নিঃসঙ্গ সে কিছু ভাল লাগে না।

পুরুষ যখন আপনাকে একা মনে করে সে নিঃসঙ্গতার ভার সে বহুদিন বহিতে পারে। কিন্তু নারী যখন আপনাকে একা মনে করে, সে

নির্জ্জনতা শূন্যতার বোঝায় সে ঝড়ে-ভাঙা লতার মত ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার অবসন্নতা মনের বৈরাগ্য বড় ভয়ানক। যখন তাহার ঘরকন্না ভাল লাগে না, স্বামী অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না, তাহার সন্তান হৃদয়ের অজানা বেদনা দূর করিতে পারে না, প্রাণের প্রাচুর্য্যে প্রেমের গভীরতায় সে পূর্ণ, তবু জীবনের পাত্র শূন্য মনে হয়—নারীর অন্তরাত্মায় এ শূন্যতার বোধ বড় ভয়ানক।

ভাল লাগে না। কাজ করিতে করিতে তাহার অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদাস ঘর-ছাড়া হইয়া যাইত। কিসের জন্য কাজ, কেন সে বাঁচিয়া আছে, কেন তাহার জন্ম হইয়াছিল? তাহাকে এমন জন্ম দিয়া এ জীবন না দিলে বিশ্ববিধাতার কি ক্ষতি হইত?

শরীরে অসুখ কিছুই নাই, পূর্ব্বের মতই সে কাজ করে, খায়, হাসে, গল্প করে, গান গায়। তবু শরীরে কেমন শক্তি পায় না, সহসা দেহ-মন এলাইয়া পড়ে, মনে হয় সে যেন কলের মত কাজ করে, প্রাণের আনন্দ জাগে না।

মধ্য রাত্রে প্রায়ই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কত চিন্তা মাথার ভিতর ঘুরিত, হয়ত সে বেশিদিন বাঁচিবে না। মাথা দপ্‌দপ্‌ করিত, চোখ জলিত, অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিত, মনে হইত এই ছয় বছরে তাহার যেন ষাট বছর বয়স হইয়াছে।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিত। এ কি হইল তাহার জীবনটা? তাহার জীবন কি এইরূপ চিরকাল কাটিবে? মাথার শিরাগুলি তারাগুলির মত দপ্‌দপ্‌ করিত।

"আশা" ছবিখানি চোখে পড়িত। কি আশা তাহার? সত্যই এবার তাহার আশার দুই চোখ বাঁধা, সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার। তাহার এই ছোট ছেলেমেয়েরা? হয়ত সে মরিয়া যাইবে, রজতও মরিয়া যাইবে, আর ইহাদের কি দুঃখের জীবন আরম্ভ হইবে, ভাবিতে সে শিহরিয়া

উঠিত, তবু মনটা দুঃখের কথাই ভাবিতে চাহিত। ওই যে খুকী ঘুমাইতেছে, হয়ত সেও তাহারি মত সরল আনন্দে শৈশব হইতে যৌবনে বাড়িয়া উঠিবে, হয়ত তাহারই মত তেমনই জীবনের বোঝা তাহার উপরে চাপান হইবে। কি অর্থ এই সৃষ্টির? এই বংশের পর বংশ নবনব দুঃখের মধ্যে যাত্রা?

রমলা বিছানায় গিয়া শুইতে পারিত না, মেজেতে দোলনার পাশে মাদুরে শুইত, ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই কি জীবন? প্রথম যৌবনে বোর্ডিং ঘরে কত জ্যোৎস্নারাত্রে জীবনের কত রঙীন স্বপ্নজাল বুনিয়াছে, আর কিছুদিন পরে তাহার সহিত নিচেকার উমার জীবনধারার কোন প্রভেদ থাকিবে না। সব দুঃখকে সব অবস্থাকে কি মানিয়া লইতেই হইবে?

কেন এমন হইল? হয়ত তাহার জীবন অন্যরূপ হইতে পারিত। সে যেন বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিতেছে না, যেন পাথরচাপা অন্ধকার গহ্বরে ঝর্ণাধারার মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

কে ইহার জন্য দোষী? রমলা রজতের দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহার উপর একটু বিরক্ত হইত, পর মূহূর্ত্তে তাহার মন করুণায় ভরিয়া যাইত। তাহার কি দোষ, সে তো সত্যই তাহাকে ভালোবাসে, তাহার জন্য প্রাণপণ খাটিতেছে। কাহার দোষ? এই যে জীবন ভাঙিয়া চূরিয়া গলিয়া পিষিয়া দণ্ডে দণ্ডে মরিতেছে—এই জীবন ভাল লাগে না।

ঘর অন্ধকার, স্বামী শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে, পাশে খুকী মুদিত কমলের মত নিদ্রিত। এ স্তব্ধতা তাহার ভয়ানক বোধ হইত; দিনের বেলায় নানা কাজে সে মন ভুলাইয়া থাকিত, কিন্তু রাত্রে তাহার চিন্তাগুলি এই স্তব্ধ ঘরে শূন্য অন্ধকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন ঘুরিয়া বেড়াইত তাহাদের দূর করিতে চাহিলেও পারিত না। ভাগ্য—এই তার ভাগ্য। মামাবাবুর কতকগুলি কথা কানের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—

heredity — environment — circumstances — life-force— struggle—adaptation—survival of the fittest. হয়ত মামাবাবুর মত সত্যি, মানুষ একরকম বড় পোকা, সমাজে শুধু হানাহানি কাড়াকাড়ি। ঈশ্বর হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। আর আত্মা? ওটাও মন-ভুলান কথা, বিরাট প্রাণ-সাগরে ঢেউয়ের মত উঠিয়া ঢেউয়ের মত মিলাইয়া যাইবে, আমি অমর নই, তৃণ পোকার মতই আমার জীবন। কে অমর? Man the Universal—শাশ্বত মানুষ—সেই শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, কোন স্বপ্নলোকের দিকে তাহার যুগযুগের দুঃখের সাধনা, প্রত্যেকের জীবন সেই পথের দিকে মানব-সভ্যতার রথটাকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।

এ-সব কথা সে ভাবিতে চায় না। কেন তাহার অন্তরে এ বেদনা এ অশান্তি? Life-force, জীবনশক্তির আনন্দভাণ্ডার তাহার মধ্যে দিন দিন ফুরাইয়া যাইতেছে।

বাহিরে রমলার দেহের সৌন্দর্য্যের খুব বেশি পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু একটু পাণ্ডুরতার করুণ আভা। কিন্তু তাহার অন্তরের আনন্দতট কোন গুপ্ত স্রোতের বেগে কোন্ অতলে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একদিন সে মুখ ফুটিয়া তাহার স্বামীকে বলিল, ওগো, দেখ, শরীরটা কেমন দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়্ছে, যেন একটা ভয়ঙ্কর অসুখ করবে।

ডাক্তার আসিলেন। তিনি তিন দিন আসিয়া দেখিলেন, বহু পরীক্ষা করিয়া কোন রোগের সন্ধান মিলিল না। ডাক্তার ম্লান হাসিয়া বলিলেন, neurasthenia। মনটা সর্ব্বদা কাজে ডুবিয়ে প্রফুল্ল রাখবেন, আর কোথাও চেঞ্জে যাওয়া দরকার, environment বদল করতে হবে।

করুণ হাসিয়া রমলা রজতের দিকে চাহিল। রজত তাহার দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

৩০

চৈত্র মাস শেষ হয়-হয়। দিন-দিন দিনের তাপ বাড়িয়াই যাইতেছিল, বহুদিন অনাবৃষ্টিতে নগর তাতিয়া পুড়িয়া উঠিয়াছে। সেদিন বিকালে আকাশ ঘোলা হইয়া কালো হইয়া আসিল, অগ্নিবরণী নাগিনীদের মত মেঘের দল আকাশে ভিড় করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক, এক ঝড়ের সাজসজ্জা আকাশ জুড়িয়া মহাসমারোহে ঘনাইয়া আসিল।

বহুদিন পরে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমলার মনও সেই বিকালে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার মন বড় দুলিত—কখনও অতি উল্লসিত, কখন অতি অবসন্ন হইয়া পড়িত। বারান্দার কোণে দোলানো-চেয়ারে বসিয়া খুকীকে কোলে করিয়া সে ঝঞ্ঝার সমারোহের দিকে চাহিয়া দুলিতেছিল। খুকীর সঙ্গে অস্ফুটস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সে কথাবার্ত্তার ভাষা খুকী ও তাহার মার স্বরচিত, তাহারাই এ কথা বোঝে।

খুকীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার রমলার চোখ একতলায় গিয়া পড়িল। উমা এক কাঁসার রেকাবিতে সাজাইয়া তাহার স্বামীর খাবার লইয়া যাইতেছে, সে নতমুখে যাইতেছে দেখিয়া রমলা একটু হাসিয়া লোহার রেলিংএ আঘাত করিল, উমা একবার মৃদু হাসিয়া উপরের দিকে চাহিল, রমলার মুখের দিকে তাকাতেই তাহার মুখ রাঙা হইয়া গেল, খাবারগুলি ঠিক করিতে করিতে সে চকিতপদে ঘরে গিয়া ঢুকিল। রমলা খুকীকে চুমো খাইয়া দোলনায় শোয়াইয়া আসিয়া নারিকেল গাছগুলির উপর মেঘের ঘনঘটার দিকে চাহিয়া চেয়ারে দুলিতে লাগিল।

এই শান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহার ভাল লাগে না, এক ঝড়ের দোলায়

ছুলিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ ঝঞ্ঝার ঘন সমারোহের মত তাহার জীবনে যদি কোন প্রলয়যাত্রাপথের সাজসজ্জা শুরু হইত। সাপের ফণার মত বিদ্যুৎ কালো মেঘ চিরিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খেলিয়া গেল। রমলার উল্লসিত অন্তর দেখিয়া তাহার ভাগ্য-বিধাত: অলক্ষ্যে হাসিলেন।

বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে শুরু হইল। রৌদ্রতপ্ত বাড়ির ছাদে ছাদে, শুষ্ক দেওয়ালে, তাপিত নগরের পথের পাথরে, তৃষিত বৃক্ষগুলির পাতায় পাতায় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে পড়িতে নিমেষে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। রমলা বারান্দার কোণে বসিয়া রহিল, তাহার মুক্তকেশে, তপ্তমুখে, ধূপছায়ারংএর শাড়ীতে, ব্লাউজে চোখের জলের ফোঁটার মত জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু বাতাস এত উত্তপ্ত যে জল পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জল-ঝরা থামিয়া গেল, শুধু ঘনায়মান অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলিক। 'কোন প্রমত্তা নাগিনী কি দুর্জ্জয় ক্ষোভে আপন মুক্ত কৃষ্ণবেণী সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়া চিরিয়া চিরিয়া ফেলিতেছে! ভিজে-মাটির গন্ধভরা ঈষদার্দ্র বাতাস মৃদু বহিতে লাগিল, সে বাতাস রমলার রক্তের সহিত মিশিয়া দেহে মনে কি আবেগ আনিয়া দিল। কত মুক্ত প্রান্তরের, কত ঝঞ্ঝারাত্রির স্মৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল, বহুদিন পরে সে ঘরে গিয়া পিয়ানো বাজাইতে শুরু করিল।

বাহিরে ঝড়ের বেগ বাড়িয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হইল, রমলাও তাহার ভাঙা পিয়ানোতে সুরের ঝড় তুলিল। বেঠোভেনের সোনাটার পর সোনাটাগুলি একের পর একে বাজাইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজাইয়া প্রদীপ্ত মুখে দরজার দিকে চাহিতে রমলার মনে হইল কে যেন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অন্ধকারে এক ছায়ামূর্ত্তির মত; এ আলো-অন্ধকারের কোন মায়াখেলা ভাবিয়া সে

চন্দ্রালোক সোনাটা শুরু করিল। শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল; যতীনের দীপ্ত চোখের মত দুইটি চোখ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে বাহিরের ঝড়ের সহিত পাল্লা দিয়া সুরের ঝড় তুলিল।

সত্যই যতীন তখন দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। বৃষ্টির ছাটে একটু ভিজিতেও ছিল, কিন্তু সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না, সে নির্নিমেষ নয়নে পিয়ানোবাদিনীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। তাপশীর্ণ গিরিনদীতে গেরুয়ারংএর বন্যাজলের মত রমলার ব্যথাকরুণ পাণ্ডুর মুখে আজ সুরের বান ডাকিয়া আসিয়াছে, কালোচুলের মধ্যে সিন্দূররেখা অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে, তাহার উপর শাড়ীর লালপাড় রক্তের ধারার মত—এই লাল রং প্রাণের রং, আগুনের রং, এই রংএর দিকে সে প্রদীপ্ত চোখে চাহিয়া ছিল, পিয়ানোর সুরে সুরে দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল করিতেছিল। চৈত্রের ঝড়ে ও সন্ধ্যার আলো-অন্ধকার ভরা ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রমলার দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল—এ কোন অপূর্ব্ব মায়াপুরীতে সে আসিয়া পৌছিয়াছে।

বহুদিন পরে হঠাৎ রজতের বাড়িতে যতীনের আসাটা আশ্চর্য্যের বটে। ব্যাপারটা এইরূপ। সেদিন শরীরটা একটু খারাপ থাকায় যতীন নিজের বাড়িতে লাইব্রেরিতে বসিয়া আফিসের সব কাজ করিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর কথা মনে পড়াতে তাহার সন্ধানে ড্রয়িংরুমের দরজায় গিয়া দেখিল, ড্রয়িংরুমে বেশ একটি ছোট পার্টি বসিয়াছে। মাধবী এক বাসন্তীরংএর সিল্কের শাড়ী পরিয়া সোফায় হেলান দিয়া বসিয়াছে, কার্ডটেবিল ঘিরিয়া আর সকলে বসিয়া আছেন। চ্যাটার্জ্জীসাহের মজার মজার হাসির গল্প যোগাইতেছেন, মাধবী তাস বণ্টন করিতেছে, মাধবীর ঠিক বাম পাশে এক তরুণ যুবক বসিয়া মৃদুগুঞ্জরণে মাধবীর সঙ্গে গল্প করিতেছে, তাহার সর্‌বতের গেলাস ধরিয়া

রহিয়াছে। কচি বাঁশের মত তাহার সুকুমার মুখের দিকে তাকাইয়া মাধবীর উপর যতীনের একটু রাগ হইল। মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে নিজের ঘরের দিকে চলিল। বহুবৎসর পূর্ব্বের এক ঘরের চিত্র তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, সে বোধ হয় চারবৎসর পূর্ব্বের রজতের ঘরের এক দৃশ্য।

রজতের পাড়া দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ সেদিন যতীন রজতের বাড়ির সম্মুখে মোটর থামাইয়াছিল। ধীরে দোতালায় উঠিয়া রজতের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে-স্নিগ্ধদৃশ্য সে সেদিন দেখিয়াছিল, তাহাই তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। দোলনা মৃদু দুলিতেছে, তাহার পাশে রমলা নীলশাড়ী পরিয়া হাস্যমুখে সবাইকে চা দিতেছে, রাত্রে নীলরং যে এত সুন্দর দেখায় তাহা যতীনের ধারণা ছিল না। মামাবাবু গলাবন্ধ জড়াইয়া অতি স্থিরভাবে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তাসগুলি দিতেছেন, ললিত পাশে চেয়ারে বসিয়া খোকাকে পায়ে দাঁড় করাইয়া উঠাইতেছে নামাইতেছে নাচাইতেছে আর তাহার সহিত পাল্লা দিয়া হাসিতেছে, মামাবাবুর এক পাশে তাঁহারই মত এক শীর্ণকায় যুবক, বোতাম ছেঁড়া শার্টের আস্তিন দোলাইয়া হাত নাড়িয়া কি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর রজত দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া হাস্যব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে সবাইকে দেখিতেছে আর মাঝে মাঝে শীস দিয়া উঠিতেছে।

যতীন ঘরে ঢুকিতেই সকলে উচ্চ হাসিয়া তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিল, রমলা আনন্দের সঙ্গে চেয়ারে বসাইয়া চা দিল, তার-পর আবার সকলে গল্প পরিহাসে তাস-খেলায় মগ্ন হইল।

চ্যাটার্জ্জীর সাহেবীয়ানা, ঘোষের ফরাসী-কায়দা, সেনের আমে-রিকান্ ঢং আর ওই তরুণ যুবকটির মোহবিহ্বলতা দেখিয়া যতীনের সেই মন-খোলা হাসি, প্রাণভরা আনন্দ সেই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর ঘরের কথা

মনে পড়িল, কোন শান্তিময় আনন্দ-আশ্রমের জন্য মন তৃষিত হইয়া উঠিল। একখানি দেশী ধুতি পরিয়া সিল্কের পাঞ্জাবিটি গায়ে দিয়া যতীন মোটরে করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হায়, সে তো জানিত না রজতের সেই সুখসন্ধ্যাগুলি স্বপ্নের মত কবে মিলাইয়া গিয়াছে।

পিয়ানো বাজনা থামাইয়া রমলা আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই যতীন তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল সে যেন ওই ধূপছায়ার রংএর শাড়ীর উপর উল্কার মত পড়িবে। ওই সুন্দর হাতের পদ্মের পাপড়ির মত যে-আঙুলগুলি এতক্ষণ পিয়ানোর উপর খেলিতেছিল, তাহারই সুরের অমৃতমাখান স্পর্শ সে যদি একবার পায় তবে তাহার দেহে মনে কোন স্বপ্নের গান বাজিয়া উঠে। আপনাকে দমন করিয়া যতীন তাহার শক্ত মোটা আঙুল দিয়া পিয়ানোর কাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেমন করিয়া সে মোটরের steering wheel ধরে।

রমলা প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল, তার পর দীপ্ত মুখে হাসিয়া বলিল, বা, সত্যিই আপনি এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন?

—হাঁ, এসে আপনার পিয়ানো বাজানো বন্ধ করলুম। ও, কতদিন আপনার গান শুনি নি, ভাগ্যিস এসেছিলুম।

—আমি আর পিয়ানো বাজাই না, বসুন, আলোটা জেলে আনি।

রমলা আলো জ্বালিয়া আনিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতীন ঘরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝঞ্ঝার মেঘ হইতে বিচ্ছুরিত সন্ধ্যালোকরঞ্জিত রমলার এই ঘরখানি কোন রূপকথাপুরীর মায়াগার, কিসের রংএ মন রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, সে যে কি করিতে চায়, কি ভাবিতে চায়; কি বলিতে চায় তাহা সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

আলো লইয়া ঘরে ঢুকিয়া রমলা দেখিল, যতীন পিয়ানোর পাশে

কোন্ মায়ায় যেন মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কালো চোখের হাসি ঠিকরাইয়া সে বলিল, বা, বসুন, আজ যে দিব্যি বাঙ্গালি-বাবু।

যতীন কোন উত্তর দিতে পারিল না, দীপ্তনেত্রে একবার রমলার দিকে চাহিল। রমলার মুখের দিকে একটুখানি চাহিতেই তাহার স্বপ্নমায়া যেন কাটিয়া গেল। এ কি, রমলা এত রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখের সেই অনুপম লাবণ্য কোথায়? কৃষ্ণচূড়ামঞ্জরীর মত রাঙা রং যে তুষারের মত সাদা হইয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ পিয়ানো বাজানোর মনের উত্তেজনার পর তাহার যে অবসাদ আসিয়াছে তাহা তাহার মুখে প্রকাশিত হইতেছিল। যতীনের দীপ্তচক্ষু ব্যথায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, তাহার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে, রমলার কোন অসুখ হইয়াছে কি? পারিল না। রমলার দিক্ হইতে মুখ ঘুরাইয়া লইতে দোল্‌নার উপর তাহার চোখ পড়িল। ধীরকণ্ঠে যতীন বলিল, খোকা ঘুমোচ্ছে বুঝি?

—না, ওটি আর একটি নতুন অতিথি।

—নতুন? খবর তো পাইনি।

—খবর কি নেন, না রাখেন, আপনারা কলকারখানা নিয়েই ব্যস্ত।

দোলনার দিকে অগ্রসর হইয়া যতীন বলিল, আর একটি খোকা?

—না খুকী।

দোলনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতীন বলিল, বা, বেশ সুন্দর তো, lovely।

যতীন আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিদ্রিতা খুকীকে একটু আদর করিল, রমলার দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, আবার দোল্‌নার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যতীনের স্তব্ধতা ভাবভঙ্গী দেখিয়া রমলার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছিল। কোথায় তাহার চাঞ্চল্য, তাহার বাক্‌পটুতা, তাহার প্রাণের স্বাভাবিক গতি?

মৃদুকণ্ঠে রমলা বলিল, কারখানা থেকে আসছেন, কিছু খাবেন ?

যতীন আপত্তি জানাইতে পারিল না, সম্মতিও জানাইল না, ব্যথা-করুণ-চোখে একবার রমলার দিকে চাহিল।

আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষনি আসছি, বলিয়া রমলা ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যতীন সমস্ত ঘরখানির প্রতি-কোণে চাহিতে চাহিতে ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরপদে কিছুক্ষণ ঘুরিল, একবার দরজার দিকে দেখিল, রমলা আসিতেছে কি না, তারপর দোলনায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুকীকে কয়েকটা চুমো খাইল, তাহার চুলগুলি লইয়া আদর করিল। সে বারান্দায় বাহির হইয়া কালো আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, একটি তারা এককোণে জ্বলিতেছে, জল পড়িতেছে না, বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিতেছে—আবার ঘরে ঢুকিয়া দোলনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত ঘর-ভরিয়া দারিদ্র্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারই পেষণে রমলা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এই কথাটি ভাবিতে তাহার মন বাহিরের কালো আকাশের মত ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

রমলা চা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, যতীন খুকীর দিকে অনিমেষ-নয়নে তাকাইয়া দোলনা মৃদু মৃদু দোলাইতেছে। চা ও মিষ্টিভরা প্লেট টেবিলে রাখিয়া রমলা বলিল, দেখুন, ঘরে কিছুই নেই, শুধু চা নিয়ে এলুম, আপনি এমন হঠাৎ আসেন। বসুন।

ধীরে পাশের চেয়ারে বসিয়া যতীন রমলার দিকে চাহিল। যতীনের এ ব্যথাভরা চাউনি রমলার সম্পূর্ণ অজানা। সে ধীরে বলিল, কয়েক-খানা কাটলেট ভেজে আনব, ভেজিটেবল্ কাটলেট! একটু যদি বসেন, কিছু আপনাকে দিতে পারলুম্ না।

—না, এই যথেষ্ট, আপনি বসুন, একটু গল্প করা যাক্।

—নিন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে, বলিয়া রমলা দোল্‌নার পাশে মোড়ায় বসিল।

চা খাইতে খাইতে যতীন বলিল, কৈ রজত এখনও এল না?

—না, এখনও তো আসেন নি দেখ্‌ছি, বোধ হয় বায়োস্কোপে গেছেন।

—আপনি যান না?

—না, কাজ, সময় পাই কোথা?

—রজত সেই আপিসেই কাজ কর্‌ছে?

—হাঁ, সেই আপিসেই।

—ছবি কিছু আঁকে?

—কৈ, দেখি না তো।

—আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে!

—না, কষ্ট কি, বেশ সুখে আছি। আপনি মিষ্টিগুলো সব খাবেন। আমি খুকীর দুধটা নিয়ে আসি।

রমলা চলিয়া গেলে যতীন অর্দ্ধেক পেয়ালা চা খাইয়া টেবিলে রাখিল। বুকের কি একটা বেদনায় সে আর খাইতে পারিল না। এ বেদনা তাহার সম্পূর্ণ অজানা। কি করিতে পারে সে, ইহাদের দুঃখ কি করিয়া দূর করিতে পারে? যাহাকে ভালোবাসি, সে দুঃখে দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার তিলমাত্র ব্যথা দূর করিতে পারিতেছি না, অন্তরের এ বেদনা অসহনীয়। সূচের মত তাহার বুকে কিসের ব্যথা বিঁধিতেছে।

রমলা খুকীর দুধ লইয়া আসিয়া দেখিল, যতীন চুপ করিয়া বসিয়া আছে। খুকীকে কোলে তুলিয়া রমলা বলিল, বা, কিছুই খান নি, অসুখ করেছে বুঝি?

না, এই যে খাচ্ছি, বলিয়া যতীন ঠাণ্ডা চা ও মিষ্টিগুলি নীরবে খাইতে লাগিল। রমলা খুকীকে দুধ খাওয়াইতে লাগিল। দু'জনেই

নীরবে বসিয়া। যতীন রমলার দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল না, তাহারই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কি স্নিগ্ধ, কি মধুর, কি সুন্দর এই মুখখানি! কিন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দের তীব্র দীপ্তি যে নাই: এ কোন্ মেঘের কালো ছায়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

খুকীকে দুধ খাওয়ান শেষ হইতেই যতীন চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। রমলা ধীরে বলিল, যাবেন, এত শীগ্‌গির? ওঁর হয়ত আস্‌তে দেরি হবে।

যতীন অবশ্য যাইবার জন্য উঠে নাই, কিন্তু তাহার মনে হইল, যাওয়াই ভাল। যাহার সহিত হাতে হাত ধরিয়া দুঃখ ভাগাভাগি করিয়া বহন করিতে পারিব না, তাহার দুঃখের সংসারে চুপ করিয়া ব্যথিত অন্তরে বসিয়া কি হইবে!

ব্যথিত করুণ চোখে রমলার দিকে চাহিয়া যতীন বলিল, হাঁ যাচ্ছি। তার পর সে খুকীর গালে আঙ্গুল দিয়া একটু আদর করিল।

রমলার আলো দেখানোর অপেক্ষা না করিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

রমলা খুকীকে শোওয়াইয়া পিয়ানোর পাশে বসিয়া খোলা জানলা দিয়া ঝড়ের কালো আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

রজত যখন অনেক রাতে বাড়ি আসিল, সে রজতকে অস্বাভাবিক-রূপে চঞ্চল দেখিল, যতীনের আসার কথাটা তাহার আর বলা হইল না।

৩৮

যতীন বাড়ি হইতে বাহির হইবার একটু পরেই মাধবী তাহার সভা ভঙ্গ করিয়া দিল। বেশিক্ষণ ধরিয়া একটা কিছু কাজ করিতে তাহার ভাল লাগিত না। এই তাসের আড্ডা, চায়ের পার্টি, নভেল পড়া, গল্প শোনা, বায়োস্কোপ, এই সাজসজ্জা, সুখের জীবনে সে দিন দিন শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও সে সুখ খুঁজিয়া পায় না।

একদান তাস খেলিয়া নিজে জিতিতেই সে সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিল। মাধবী জিতিলেই তাহার আর তাস খেলা ভাল লাগিত না। তাহার তরুণ বন্ধুটি বলিল, মাধবী-দি, বায়োস্কোপে চল না।

হাসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া মাধবী বলিল, কি, তোমার হুকুম?

—না, আপনাকে হুকুম করতে পারি, এ হচ্ছে অনুরোধ।

—আচ্ছা, শচী, আমি চুলটা ঠিক করে' আস্‌ছি।

—বেশি দেরি করবেন না, হয়ত এখন আরম্ভ হয়ে গেছে।

—আবার হুকুম?

—না, না, বিনীত প্রার্থনা।

আবার শাড়ী বদ্‌লাইতে চুল ভাল করিয়া বাঁধিতে মাধবীর ভাল লাগিল না। সে শুধু একটু আতর মাখিয়া শীঘ্র আসিল।

মোটরকার বায়োস্কোপের সম্মুখে আসিয়া থামিতে মাধবী বলিল, যাও শচী, দু'খানা টিকিট কেনগে।

তারপর মোটর হইতে নামিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখের থামে এক মেরী পিক্‌ফোর্ড ফিল্‌মের কতকগুলি বাঁধানো ছবি দেখিতে আরম্ভ

করিল। হঠাৎ পাশের থামের দিকে তাহার চোখ পড়িল। গেরুয়া রংএর পাঞ্জাবি-পরা একটি ছিপছিপে লম্বা বাঙ্গালি দাড়াইয়া, পাশের সাহেবের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোঁকড়া লম্বা চুলগুলি কি সুন্দর দেখাইতেছে! তন্ময় হইয়া সে কি ছবি দেখিতেছে তাহা দেখিবার জন্য একটু অগ্রসর হইতেই মাধবীর বুকের রক্ত দুলিয়া উঠিল। এ রজত! এই সেই সুন্দর শিল্পী? এ কি মলিন মুখ, কি শীর্ণ চোখ, কিসের তৃষ্ণাতুর মুখখানি! মাধবী একটু অস্ফুটধ্বনি করিয়া ওঠাতে রজত একবার জ্যাকিকুগানের অভিনয়ের ছবিগুলি হইতে মুখ তুলিল, পাশে এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মাধবী বিস্মিত ব্যথিত নেত্রে রজতের দিকে চাহিয়া বলিল, কি, চিন্‌তে পার্‌ছেন না?

রজত কোন্ স্বপ্নমায়াজড়ান উদাস চোখে মাধবীর দিকে চাহিল। চোখ দুইটি একটু জল্‌জল্ করিয়া উঠিল, ধীরে বলিল, হাঁ, পারছি বৈকি, আপনি বায়োস্কোপ দেখতে এসেছেন?

মাধবী রজতের মুখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, ও, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। ভাল আছেন?

রজতের কর্ম্মক্লান্ত উদাস মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ভাল করিয়া মাধবীকে দেখিতে লাগিল। তাহার কেশ বেশ দেহভঙ্গীতে যৌবন সহস্রশিখায় জলিতেছে, ক্ষুব্ধ বাসনার রহস্যে ভরা এ নারী! এ সেই শান্ত গুহাবদ্ধ ঝর্ণাজলের মত স্তব্ধ মাধবী নয়, একদিন হাজারিবাগে রঙীন প্রভাতে তাহার এইরূপ চঞ্চলা নৃত্যময়ী অগ্নিশিখার মত মূর্ত্তি রজত দেখিয়াছিল। একটু ভীত হইয়া সে মাধবীর দিকে চাহিল।

শচী আসিয়া বলিল, মাধবী-দি, house full, শুধু একটা বক্‌স খালি আছে।

শচীর দিকে কটাক্ষ করিয়া মাধবী বলিল, থাক্, শচী, আজ

বায়োস্কোপ, এই কুগান-ফিল্ম্‌টা এলে আসা যাবে, তার চেয়ে চল গড়ের মাঠে বেড়াইগে, কি grand ঝড় ঘনিয়ে আস্‌ছে।

রজতের দিকে ফিরিয়া মাধবী বলিল, আপনার সেই ঝড়ের ছবিটা মনে পড়্‌ছে?

শচী বলিল, মাধবী-দি, বৃষ্টি পড়্‌ছে যে!

ব্যথাতুরার অশ্রুজলের মত বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার দিকে চাহিয়া মাধবী রজতকে বলিল, তাইতো, আপনি কোথায় যাবেন, চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, আমাদের বাড়িতে একবারও তো যান না।

রজত একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, আপনারা তো আবার কোথায় নতুন বাড়িতে উঠে গেছেন, জানিও না।

—এখন তো কত ওজর দেবেন। ও, আমাদের নতুন বাড়িতে কখনও যান্‌নি। এখন সময় আছে? শচী, মোটরটা কোথায় দেখ ভাই।

সম্মুখে মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে মাধবী রজতকে ডাক দিল, আসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত রজত মাধবীর সঙ্গে মোটরে গিয়া উঠিল। তাহারা উঠিলে গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া শচী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, মাধবী-দি, আমায় মার্কেটে যেতে হবে, একটু কাজ আছে। নিমেষে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ড্রাইভারকে বাড়ির দিকে মোটর চালাইতে বলিয়া মাধবী রজতের পাশে বসিয়া রজতের মুখের দিকে চাহিল। রজত দেখিল, চৈত্র মাসের আকাশের তৃষ্ণার মত মাধবীর চোখ, সে চোখ কাজলঘন মেঘের মত স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিসের বেদনায় তাহার মুখ করুণ হইয়া উঠিতেছে। এই আতর-সুবাসিত সুন্দরী নারীর পাশে বসিয়া এই ঝড়ের সন্ধ্যার আলো অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলিক ও জলের বড় বড় ফোঁটা ঝরার মধ্য

দিয়া হু হু করিয়া মোটরে যাইতে যাইতে তাহার উদাস মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মোটরের দোলায় চড়িয়া সে শুধু মাধবীর সঙ্গের রেশটুকু অনুভব করিতে লাগিল, দুইজনেই প্রায় স্তব্ধ বসিয়া রহিল! মোটর অশ্রান্ত বেগে ছুটুক, এই দীপালোকিত জনবহুল পথ, প্রাসাদশ্রেণী পার হইয়া ওই বিদ্যুদ্‌বিদীর্ণ তমিস্রাপুঞ্জে গিয়া পড়ুক---who knows but the world may end to-night!

মোটর যখন বাড়িতে আসিয়া পৌঁছাইল, মাধবী যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল, যেন কোন মধুস্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রজতকে লইয়া আবার ড্রয়িংরুমে ঢুকিতেই তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ড্রয়িংরুমের ছবি, কারুকার্য্যকরা চেয়ার, সোফা, কার্পেট, পর্দ্দা, নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য, প্রত্যেক জিনিষ কোথা হইতে কেন বা তৈরি করান হইয়াছে, আর কোথায় ইহা হইতে ভাল জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে, কোন্ জিনিষ কোথায় রাখিয়া কি ভাবে সাজাইলে ঘর আরো ভাল দেখাইবে, কোথায় কোন্ রংয়ের সঙ্গে কোন্ রং মানাইবে, ইত্যাদি প্রতি জিনিষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তর্ক করিয়া আলোচনা করিয়া মতামত লইয়া সে রজতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ড্রয়িংরুম দেখান শেষ হইলে সে রজতকে লাইব্রেরিতে লইয়া গেল, সেখানে কি কি নূতন বই সে কিনিয়াছে, কোন্ কোন্ লেখক তাহার প্রিয়, রজতের কোন্ কোন্ লেখক প্রিয়, ইত্যাদি নানা গল্প হইল। সেখান হইতে রজতকে খাবার ঘরে লইয়া গেল, নিজের হাতে চা তৈরি করিল, রুটিতে মাখন লাগাইল, কেক কাটিল। কখন কখন খেয়াল হইলে পার্টিতে সে নিজের হাতে এসব কাজ কিছুক্ষণের জন্য করে। তার পরে দেওয়ালে কি রং, জানালায় কি রং, দরজায় কি রং দেওয়া যাইতে পারে, কি রংএর পর্দ্দা কোথায় মানাইবে, চায়ের কাপে কি রকম লতাপাতা আঁকা বেশ দেখায়, old china তাহার কি সংগ্রহ আছে, ইত্যাদি নানা গল্প হইল।

রজতের মনও কেমন খুলিয়া গেল। বহুদিনের ঘুমাইয়া-পড়া শিল্পী-প্রাণ জাগিয়া উঠিল। গল্পে তর্কে পরিহাসে সে ভরপূর হইয়া উঠিল।

রাত প্রায় নয়টার সময় রজত বিদায় হইল। শীঘ্রই আবার সে আসিবে এই শর্ত্তে মাধবী তাহাকে ছাড়িল। ট্রামে সমস্ত পথটা মাধবীর সঙ্গের রেশ, হাসির সুর, চোখের মায়া, কেশের উদ্যত ফণা, কথার ছন্দ, আতরের গন্ধ তাহার দেহ মন ঘিরিয়া রিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল।

৩২

পরদিন সমস্তক্ষণ রজতের মনে এই কথাটি বাজিতে লাগিল, সে মাধবীর কাছে আবার যাইবে বলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যায় আফিসের ছুটির পর সে ঠিক করিল যাইবে না, যাওয়াটা ঠিক হইবে না। শিল্পী বলিল, চলো; স্বামী বলিল, না। স্বামীরও ঠিক জয় হইল না, রজত মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা গড়ের মাঠে অকারণে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় রজতকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়া রমলা একটু অবাক্ হইল, তাহার কোন অসুখ করে নাই জানিয়া আশ্বস্ত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েকখানি লুচি ভাজিয়া খাওয়াইয়া মেজেতে বিছানা পাতিয়া রজতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া সে রান্নাঘরে গেল।

রজত তাকিয়া ঠেসান দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে একখানি ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল, তাহার পাশে খোকা খুকীকে দোলায় আদর করিতেছিল ও তাহার পুতুলগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেছিল। রজত সেদিন খোকার জন্য একটি জাপানী ফানুস আনিয়াছিল, সেইটি বার বার খুকীর সাম্‌নে নাচাইয়া দোলাইয়া খুকীর মনোরঞ্জনে খোকা ব্যস্ত ছিল। সহসা পিছন হইতে কে তাহার ফানুসটি কাড়িয়া লইয়া চোখ

টিপিয়া ধরাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। খোকার চীৎকারে বিরক্তির সহিত নভেল হইতে মুখ তুলিয়া রজত দেখিল, তাহার সম্মুখে হাস্যময়ী মাধবী দাঁড়াইয়া। রজত ব্যস্ত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, বা! আপনি কখন এলেন?

খোকার চোখ ছাড়িয়া ফানুসটা দোলাইয়া বলিল, এইতো আসছি, আপনি যা নভেল পড়ায় মগ্ন! রমু কৈ?

—সে বোধ হয় রান্নাঘরে। খোকা তোর মাকে ডাক্ তো।

খোকা পিতার পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া মাধবীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখে আশ্চর্য্যের ভাব দেখিয়া মাধবী ও রজত উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, মাধবী একটু অগ্রসর হইয়া খোকাকে ধীরে জড়াইয়া তাহার গালে চুমো খাইয়া বলিল, আপনার ছেলেটি lovely, কি সুন্দর চোখ, ঠিক আপনার মত মুখ।

তার পর দোল্নার দিকে অগ্রসর হইয়া খুকীকে কোলে তুলিয়া মৃদু দোলাইয়া বলিল, কি সুন্দর বেবী, কৈ বেবীর মা-টি কৈ?

হাসির শব্দ রান্নাঘরে রমলার কানে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। দুধের কড়া উনানে চাপাইয়া সে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। জান্লার ফাঁক দিয়া দেখিল—মাধবী খুকীকে নাচাইতেছে ও নিজে হাসিতেছে। এ হাসি যেমন মধুর তেমনি করুণ। রজতের কাছেও সে হাসি আশ্চর্য্য লাগিতেছিল, মাধবীর বহুপূর্ব্বের এক কথা মনে পড়িয়া গেল,—হাঁ জীবনটা কান্নায় ভরা, তা বলে' কি হাস্তে মানা। মাধবী খুকীকে নাচানো থামাইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া এক চেয়ারে বসিল। ও lovely, lovely, বলিয়া মুগ্ধ হইয়া সে আপন হাতের সরু সোনার বালা খুলিয়া খুকীর হাতে পরাইয়া দিতে লাগিল।

রজত বাধা দিয়া বলিল, ও কি করছেন?

মাধবীর ভঙ্গীতে সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

সুন্দর খোঁপাটা নাড়িয়া মাধবী বলিল, বেশ, চুপ করুন, দেখুন তো কি সুন্দর দেখাচ্ছে! আচ্ছা, আপনি না কাল আমাদের বাড়ি যাবেন বলে' এসেছিলেন?

একটু অপ্রতিভ হইয়া রজত বলিল, রোজ রোজই কি যেতে হবে!

ধীরে রমলা ঘরে প্রবেশ করিতেই মাধবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, কি ভাই, খুব রান্না করছিলে! ভারি সুন্দর হয়েছে তো খুকীটা! কি নাম রেখেছিস্?

মাতৃস্নেহমণ্ডিত চোখে খুকীর দিকে চাহিয়া রমলা বলিল, কিছু নাম হয়নি এখনও।

খুকীকে চুমো খাইয়া মাধবী বলিল, আচ্ছা, আমি ওর godmother হব, নাম ঠিক করে' দেব। আচ্ছা ভাই, আমাদের ওখানে কি একবার যেতে নেই?

খুকী কাঁদিয়া ওঠাতে তাহাকে মাধবীর কোল হইতে লইয়া রমলা বলিল, তুমিও তো ভুলে গেছ ভাই। তোমায় বুঝি যতীন-বাবু পাঠিয়ে দিলেন?

কথাটি না বুঝিতে পারিয়া মাধবী রমলার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। যে-কথা শুনিলে মনে সন্দেহ জাগে তাহা বুঝিতে সে অনর্থ প্রশ্ন করিত না। সভ্যসমাজের নীতি তাহার জানা ছিল, প্রশ্ন করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা শুনিতে হইবে না। কিন্তু রজত একটু সন্দিগ্ধ নেত্রে রমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাধবী রমলার হাতটা ধরিয়া বলিল, কি রোগা হয়ে গেছিস্!

ম্লানমধুর হাসিয়া রমলা বলিল, আর তুমিই কি মোটা আছ!

ধীরে সে খুকীকে দোলায় শোয়াইয়া দিল।

খোকা মায়ের পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে আবার এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী বলিল, জানিস্ ভাই, এসেই

তোমার খোকার চোখ টিপে ধরেছিলাম বলে' সে কি চীৎকার। খোকা, আমি তোমার মাসী হই বুঝ্‌লে?

খোকা বিস্মিত হইয়া মাতার দিকে চাহিয়া বলিল, কি মাসী, মা?

রমলা হাসিয়া বলিল, রাঙা-মাসী রে, দেখ্‌ছিস্‌ না কি সুন্দর দেখ্‌তে।

মাধবী খোকার গাল ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিল, থাক্‌ ভাই, ঠাট্টা কেন, তোমার ছেলেমেয়ে বাস্তবিক কি সুন্দর, গোলাপ-ফুলের মতন মুখটি ফুটে আছে, ভোম্‌রার মত কালো কুচ্‌কুচে কোঁকড়া চুল! এর মুখটা তোর মত হয়েছে অনেকটা।

গলার সোনার সরু হারটা খুলিয়া খোকার গলায় পরাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া রজতের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া মাধবী বলিল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

রমলা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি হচ্ছে ভাই!

বেশ কর্‌ছি, বলিয়া খোকাকে চুমো খাইয়া মাধবী রজতের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। রজতের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

বস ভাই, আমি খুকীর দুধটা নিয়ে আসি, বলিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, তখনও দুধ ফোটে নাই, উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া এক মোড়ায় বসিয়া পড়িল। মাধবীর এ রূপ তাহার সম্পূর্ণ অজানা, এ চঞ্চলা মাধবী তাহার অপরিচিতা! মাধবীর তৃষিত মাতৃহৃদয় আজ রমলার দৈন্যের সংসারে আসিয়া যে কি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে তাহা রমলা কি করিয়া বুঝিবে?

রান্নাঘরে বসিয়া থাকিতেও রমলার ভাল লাগিল না। ধীরে বারান্দায় এক অন্ধকার কোণে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কথাবার্ত্তা তাহার কানে

আসিয়া পৌঁছাইতে লাগল। রজতের গম্ভীর কণ্ঠের কথাগুলি কানে পৌঁছাইলেও ঠিক বোঝা যাইতেছিল না, মাধবীর কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

বা! পরশু তো অনেক suggestion দিয়ে এলেন, আপনার ঘরটা কি সুন্দর ছবি দিয়ে সাজান গোছান। আচ্ছা, আপনার ষ্টুডিও কোথায়, আপনাকে সব ঘর দেখালুম, আমায় কিছু দেখাচ্ছেন না—রমু আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল, এমন কুণো হয়েছে—এ ছবিখানা তো ভারি সুন্দর, সেই আপনার ঝড়ের ছবির চেয়েও ভাল হয়েছে, ঝড় আমার এত ভাল লাগে।

আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে। সুন্দর চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া রমলা দাঁড়াইয়া রহিল। এমনি চন্দ্রালোকমধুর হাজারিবাগের এক রাত্রির কথা মনে পড়িল, মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে রান্না-ঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিল দুধ উথ্‌লাইয়া উনানে পড়িয়া আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। আর কিছু করিবার যেন তাহার উৎসাহ রহিল না, শ্রান্তভাবে গোড়ায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিল, পিছন ফিরিয়া দেখিল রজত ও মাধবী দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া।

বা! ঠিক যেন সিণ্ডেরেলার মত বসে' আছে, বলিয়া মাধবী ঘরে ঢুকিল। বিস্মিত হইয়া ঘরখানি দেখিয়া বলিল, বা! কি সুন্দর সাজান, আর্টিষ্টের স্ত্রীর রান্নাঘর বটে।

রমলা ম্লান হাসিয়া বলিল, ঠাট্টা কেন ভাই?

রান্নাঘর দেখা শেষ করিয়া মাধবী রজতের ষ্টুডিও দেখিতে চলিল; রান্নাঘর হইতে রমলাকে টানিয়া লইয়া গেল।

রজতের সব ছবি দেখিয়া, একখানি আদায় করিয়া, মাধবী আবার

খুকীকে দেখিতে চলিল। তাহাকে বহু চুমো খাইয়া, খোকাকে আদর করিয়া, বিদায় লইবার সময় ধীরে মাধবী রমলাকে বলিল, বেশ সুখে আছিস্ ভাই। একবার আমার ওখানে যাবে না?

রমলা শুধু করুণভাবে হাসিল। এম্‌নিই রাতে তাহার ঘুম হয় না, সে রাত্রে তাহার মোটেই ঘুম হইল না।

৩৩

ইহার পরে প্রায় প্রতিদিনই মাধবী রজতের বাড়িতে আসিতে আরম্ভ করিল। রমলার ঘরে সে যেন কোন্ চির-ঈপ্সিত আনন্দের নীড় খুঁজিয়া পাইল। রমলাকে ঘর হইতে বাহির করা অসম্ভব, রজতও তাহার বাড়িতে যাইতে চায় না, সুতরাং মাধবী রমলার বাড়ি যাইতে শুরু করিল। ইহাদের সুখের সংসার, এই সাজান ছোট ঘরগুলি, এই সুন্দর খোকাখুকী কোন্ মায়ামন্ত্র-বলে তাহাকে প্রতিদিন টানিয়া লইয়া আসিত, তাহার অশান্ত অতৃপ্ত অন্তর এখানে আসিয়া কি অমৃতের স্বাদ পাইত! তাহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়, তাহার প্রেমতৃষিত প্রাণ, তাহার চঞ্চলচিত্তের বিরক্তিময় জ্বালা, রজতের খোকাখুকীদের সঙ্গে, রজতের সঙ্গে গল্প-পরিহাসে, রমলার সঙ্গে হাস্যে কৌতুকে একটু শান্ত হইত। সে খোকাখুকীদের জন্য জামাকাপড়, খেল্‌না, খাবার, পুতুল ইত্যাদি দিয়া রজতের ছোটঘর ভরিয়া তুলিল।

মাধবীর প্রতিদিনের ব্যবহারে রমলা অবাক্ হইয়া যাইত। তাহার দীন শান্ত জীবনধারার মধ্যে সে চাঞ্চল্য আনিয়া না জানি কি ঘটাইবে ভাবিয়া তাহার বক্ষ কোন্ অজানা আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিত। রমলা দেখিত, রজত এখন প্রতি সন্ধ্যায় আফিসের পরই বাড়ি ফিরিয়া আসে, সে ছবি আঁকায় মন দিয়াছে, মাধবীর সঙ্গে কথাবার্তায় রজতের

মুখ দেখিয়া উচ্চ হাস্য শুনিয়া স্বামীর এ মনের প্রফুল্লতায় সুখ বোধ করিলেও, কোন্ অজানা বেদনায় সে ব্যথিত হইত। ঈর্ষা? না, ঈর্ষা নয়, কি অজানা আশঙ্কা।

আর মাধবী রমলার কাছে রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছিল প্রতিদিন তাহার নব নব মূর্ত্তি। হঠাৎ কোনো দুপুরে আসিয়া খোকাকে গল্প বলিয়া লুকোচুরি খেলিয়া বই পড়িয়া সমস্তদিন কাটাইয়া রজতের আসিবার আগেই সন্ধ্যায় চলিয়া যাইত। কোনদিন রমলার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে ভাঁড়ার-ঘরে ঘুরিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। কোন সন্ধ্যায় বা রজতের সঙ্গে ছবি, আর্ট, ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে গল্পে তন্ময় হইয়া যাইত। কোন বিকালে খোকাখুকীকে লইয়া মোটরে বেড়াইয়া আসিত। একদিন জোর করিয়া রমলাকে ধরিয়া গড়ের মাঠে ব্যাণ্ড শুনাইয়া আনিল!

সেদিন সমস্তদিনের তীব্র রৌদ্রদাহের পর সন্ধ্যার আকাশ কালো মেঘে ভরিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস পথের ধূলি উড়াইয়া দরজা জানালাগুলি সজোরে নাড়াইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, আকাশ বাতাস জুড়িয়া এক প্রলয়ের সমারোহ ঘনাইয়া আসিতেছে। রমলা বারান্দায় তাহার দোলানো চেয়ারে বসিয়া পশ্চিমাকাশের ঝঞ্ঝার রুদ্র আলোর দিকে চাহিয়া দুলিতে লাগিল। স্বামী এখনও আসেন নাই, তিনি যে কোথায় গিয়াছেন তাহা ভাবিতে তাহার মন উদাস অবসন্ন হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাশেষে তারাহীন রাত্রির অন্ধকার নামিল। স্বামীর অসুখ হওয়াতে উমার কাজ শীঘ্র শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহার রান্নাঘর ধোওয়ার শব্দ নিচে থেকে আসিতেছে, এই ঝাঁটার শব্দ শুনিয়া রমলার মনে হইল, ঝড়ের ধূলায় সমস্ত ঘর বিছানা জিনিষ ভরিয়া রহিয়াছে, ঝাড়িতে বা ঝাঁট দিতে তাহার কোন ইচ্ছা বা শক্তি যেন নাই।

গির্জ্জার ঘড়িতে সাতটা বাজিল। স্বামীর আসিতে দেরি হইবে বুঝিয়া ধীরে রমলা উঠিয়া আলো জালিয়া সেলাই করিতে বসিল। সেলাইয়ের কলটি অনেক দিন চালান হয় নাই। খোকাখুকীর সব জামা রমলা নিজেই কাপড় কাটিয়া তৈরি করিত। মাধবী আসার পর হইতে কোন নূতন ফ্রক বা জামা তৈরি করিবার দরকার হয় নাই। রজতের একটা পাঞ্জাবি বহুদিন কাটা পড়িয়া রহিয়াছে, সেইটি সেলাই করিতে বসিয়া বার বার মাধবীর কথা তাহার মনে ঘুরিতে লাগিল। মাধবী যে তাহার খোকাখুকীদের খুব ভালবাসে, তাহাদের দেখিয়া আদর করিয়া তাহার তৃষিত মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটায়, তাহা রমলা বুঝিত। কিন্তু মাধবী কি কেবল সেইজন্যই আসে? মাঝে মাঝে রজতের প্রতি তাহার চাউনি দেখিয়া রমলার ভয় হইত, রজতের প্রতি তাহার গোপন প্রেমকে সে দমন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, অগ্নিশিখার মত বুঝি জলিয়া উঠে।

বাহিরে বজ্রধ্বনির সঙ্গে একটা মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। মাধবী আসিয়াছে ভাবিয়া রমলা তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের কলটা সরাইয়া রাখিল। সহসা দরজার সম্মুখে যতীনের মূর্ত্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, ভীত হইল, কোনরূপ অভ্যর্থনাও করিতে পারিল না।

যতীনের মূর্ত্তি আজ সত্যই ভয়ের—মোটরের আলোর মত তাহার দুই চক্ষু জলিতেছে, মুখ যেন কিসের তীব্র আবেগে প্রদীপ্ত, মাতালের মত একটু টলিয়া যতীন ঘরে ঢুকিল, আজ সে মরিয়া হইয়া আসিয়াছে।

আর-এক ঝড়ের সন্ধ্যায় শেষবার যখন যতীন আসিয়াছিল, সে ঠিক করিয়াছিল, আর রমলার দৈন্যভগ্ন জীবনের দৃশ্য দেখিতে সে আসিবে না। যাহার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না তাহার দুঃখের ঘরে আসিয়া কি হইবে। কিন্তু সেইদিনের পর হইতে তাহার দিনগুলি শান্তিহারা হইয়াছে, রমলার দুঃখ ভাবিয়া রাতে তাহার ভাল ঘুম হয় না। পিয়ানোর গান

সে বিশেষ কিছুই বোঝে না, কিন্তু রমলা ভাঙা পিয়ানো বাজাইতেছে এ কথা ভাবিতে তাহার বুকে ব্যথা লাগে। ব্যর্থ তাহার পৌরুষশক্তি, ব্যর্থ তাহার পুঞ্জিত স্বর্ণ, ব্যর্থ এই কলকারখানা, যে নারীকে সে ভালবাসিয়াছিল, যে তাহার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়াছিল, আজ তাহার তিলমাত্র দুঃখ সে দূর করিতে পারে না।

একথা ভাবিয়া গতরাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই। আজ কোন্ শক্তি তাহাকে রমলার ঘরে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহার দ্বারা রমলার কি কোন উপকার হয় না? রমলা তাহার অর্থসাহায্য কি গ্রহণ করিতে পারে না—এ তো বন্ধুর নিবেদন? রমলার জন্য রজতের অর্থসাহায্য গ্রহণ করা উচিত, স্বাস্থ্যের জন্য রমলার সব খাটুনি বন্ধ করা দরকার, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া দরকার। এরূপভাবে রমলাকে অর্থ দিতে আসার মধ্যে যে কি অন্যায় রহিয়াছে তাহা যতীনের খেয়াল ছিল না, সত্যই তাহার মাথা ঠিক ছিল না।

খোকার জন্য যে ইঞ্জিন গাড়ি ও বাড়ি তৈরি করিবার কাঠের খেলনা আনিয়াছিল তাহা টেবিলে রাখিয়া যতীন রমলার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এগুলো খোকার জন্যে আনলুম।

খোকার নাম হওয়াতেই রমলার মুখ খুশিতে ভরিয়া উঠিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, ও, খোকা নিচে গল্প শুনছে, আপনি বসুন।

যতীন সম্মুখের চেয়ারটা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বলিল, রজত কৈ?

—তিনি তো এখনও আসেন নি, বোধ হয় রাত হবে আসতে।

চেয়ারটা রমলার দিকে অগ্রসর করিয়া যতীন বলিল, আপনি বসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

একটু ভীত হইয়া রমলা যতীনের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিল। আবার কথা আছে! হাজারিবাগের রান্নাঘরের কথা মনে পড়াতে তাহার মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল। প্রেমকরুণ নয়নে যতীনের

দিকে সে চাহিল, মৃদুস্বরে বলিল, আপনি শান্ত হয়ে বসুন। চা খাবেন ?

যতীন আপনাকে শান্ত করিয়া বলিল, না। আচ্ছা আমি বস্‌ছি, আপনিও বসুন।

দুইজনে দুই চেয়ারে মুখোমুখি বসিল। মোহমায়াভরা চোখে রমলার দিকে চাহিয়া যতীন একটু অনুনয়ের সুরে বলিল, দেখুন, আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন, মনে আছে।

একটু বিস্মিত হইয়া যতীনের বেদনাময় মুখের দিকে চাহিয়া রমলা চুপ করিয়া রহিল। যতীনের চোখ দুইটি একবার দ্বিপ্রহরের আকাশের মত জলিয়া উঠিতেছে, একবার ঝড়ের সন্ধ্যার মত কালো হইয়া আসিতেছে।

যতীন একটু ব্যথার সুরে বলিতে লাগিল, সেই হাজারিবাগে, আমি বলেছিলুম, আমি আপনার বন্ধু হতে চাই—

ধীরে রমলা বলিল, হাঁ, মনে পড়্‌ছে, আমি বলেছিলুম আমার কোন আপত্তি নেই।

নম্রস্বরে যতীন বলিল, হাঁ, আজ সেই বন্ধু হিসেবে আপনার কিছু কাজে লাগ্‌তে চাই।

ভ্রূকুটি করিয়া রমলা কহিল, কি ?

ধীরে পকেট হইতে একতাড়া নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া যতীন অতি লজ্জিতভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল, এই।

রমলা একবার যতীনের নোটের বাণ্ডিল আর একবার তাহার আবেগময় মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে চাহিল, চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার বুকের রক্ত চলাচল যেন কোন গভীর আঘাতে একবার ঝলকিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, চেয়ারটা সজোরে ধরিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া সে দৃঢ়স্বরে বলিল, না, দেখুন—

যতীন একবার করুণচোখে রমলার মুখের দিকে চাহিল, বিনীতস্বরে বলিল, আপনি বুঝ্‌ছেন না, আমি এ রজতকে দেব, তবে আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে—

রমলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুধু মাথা নাড়িল।

বুঝ্‌ছ না, বলিয়া যতীন আপনার দৃঢ় হস্তে রমলার হাত চাপিয়া ধরিল, ইঞ্জিনচালক যেমন চালাইবার চাকাটা জোর করিয়া ধরে। কোন্‌ আবেশে রমলার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল, বুক দুলিতে লাগিল, ফণিনীর মত সে যতীনের দিকে চাহিল, হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, আপনি যান।

ঠিক সেই সময়ে জুতার শব্দে দুইজনে চমকিয়া উঠিল, যতীন চাহিয়া দেখিল সম্মুখে রজতের দীর্ঘধূসর মূর্ত্তি, রমলা দেখিল রজতের অঙ্গারের মত কালো চোখ। নোটের তাড়া যতীনের হাত হইতে পড়িয়া মেজেতে গড়াইয়া খুকীর দোল্‌নার কাছে গেল। যতীন বলিতে যাইতেছিল, হ্যালো রজত,—কিন্তু তাহার ব্যঙ্গঘৃণাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটু ভীত হইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে রজত রমলার দিকে যাইতেছিল, সম্মুখের দৃশ্যটা যেন সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, রমলার স্থির শান্তমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। এ কোন্‌ মহীয়সী নারী! রজত কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত তিনজনই স্তব্ধ দাঁড়াইয়া। সহসা এক হাসির শব্দে তিন জনেই চমকিয়া উঠিল, ঘরে যেন একটা বাজ পড়িল। রমলা ও যতীন চাহিয়া দেখিল, অগ্নিশিখার নৃত্যভঙ্গিমার মত মাধবী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

বিস্ময়ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, Oh dear! তুমি এখানে? আমি ভেবেছিলুম কারখানায়।

অতি অপ্রতিভ হইয়া যতীন তাহার দিকে চাহিল। চঞ্চলপদে দোল্‌নার দিকে অগ্রসর হইতে মেজেতে নোটের তাড়াটা মাধবী তাহার লাল ভেল্‌ভেটের নাগরা দিয়া মাড়াইয়া ফেলিল। এটা কি, বলিয়া ব্যস্ততার সহিত বাণ্ডিলটা তুলিয়া নাচাইয়া হাসিমাখা স্বরে বলিল, কার এটা ? বা, সব চুপচাপ ! কারো নয় তো ? Unclaimed property কার হয় রমলা ? যে পেয়েছে তার তো ?

রমলার মনে পড়িয়া গেল হাজারিবাগে একদিন যতীনের মোটর লইয়া সে এই প্রশ্নটি করিয়াছিল, কিন্তু আজ সে পরিহাস তাহার ভাল লাগিল না, অতি অবসন্ন হইয়া করুণ মুখে সে সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

গ্লানিভরা চোখে যতীনের দিকে চাহিয়া মাধবী কান্নার চেয়ে করুণ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ! এ নোটের তাড়া আমার আর খুকীর, কি বল টুনি ? বলিয়া সে দোলায় নিদ্রিতা খুকীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

সমস্ত দৃশ্যটা এক দুঃস্বপ্নের মত রজতের চোখে যেন চাপিয়া ছিল, তাহার দম যেন আট্‌কাইয়া যাইতেছিল, মাধবীর এই মত্ত ব্যবহারে সে দিশাহারা হইয়া গেল, তাহার কালো কেশে রক্তবেশে দেহভঙ্গিমায় প্রাণ যেন সহস্র-শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; এ নগ্ন অগ্নির মূর্ত্তি, তাহার সাহসের অন্ত নাই, এ যে কি করিবে তাহার ঠিক নাই।

ঘৃণাবেদনাময় চোখে একবার রমলার দিকে চাহিয়া রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার দম আট্‌কাইয়া যাইতেছে, অন্ধকার বারান্দায়ও আসিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, এ বাড়িতে তাহার নিঃশ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছে। ওঃ, বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

রজত ঘর হইতে বাহিরে যাইতে রমলা বাণবিদ্ধা হরিণীর মত মাধবীর দিকে চাহিল, করুণস্বরে যতীনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ওটা ওঁকে দাও। যাও ভাই, তোমরা যাও…

যতীন নির্নিমেষনয়নে একবার রমলার দিকে চাহিল। হায়, সে এ কি করিল! তাহার বুকের মধ্যে সূচের মত কি যেন বিঁধিল, হৃৎপিণ্ড বুঝি সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্‌-হীন বয়লারের মত ফাটিয়া যাইবে। মাধবীর হাত হইতে নোটের বাণ্ডিল লইয়া নতমুখে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মাধবী একবার মুদিত কমলের মত ঘুমন্ত খুকীর দিকে চাহিল, একবার ঝঞ্ঝাহতা লতার মত ব্যথিতা রমলার দিকে চাহিল, তাহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া আসিল! রমলাকে সে কি সান্ত্বনার বাণী বলিতে পারে! ক্ষমাভিক্ষাপূর্ণ বেদনাময় চোখে চাহিয়া রমলার মাথায় ধীরে হাত বুলাইয়া মিনতিস্বরে মাধবী বলিল, ক্ষমা কর ভাই, সব দোষ আমার, তোমাদের দুঃখের সংসারে দুঃখ বাড়িয়েই গেলুম।

খুকীকে নীরবে একটি চুম্বন করিয়া মাধবী চলিয়া গেল।

এতক্ষণ রমলা আপনাকে শান্ত করিয়া স্থির হইয়া চেয়ারে বসিয়া ছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বৃন্তচ্যুত পদ্মের মত মেজেতে লুটাইয়া পড়িল, তার পর দুই চক্ষুর তট ভাঙিয়া কত দুঃখদিনের কত নিরুদ্ধ অশ্রুর বান ডাকিয়া আসিল।

ইহার পর রজত ও রমলার তিনদিন তিনরাত্রি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মত কাটিল। নানা খুঁটিনাটি কাজ দিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত ভরিয়া দিন কোন রকমে কাটিত, কিন্তু অন্ধকারময় বিনিদ্র রাত্রি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। রজত খাটে চুপ্‌চাপ শুইয়া থাকিত, রমলা মেঝেতে পাটি বিছাইয়া বা ঠাণ্ডা মেঝেতেই শুইয়া থাকিত। দুই জনেই স্তব্ধ, দুই জনের মাথা দপ্‌দপ করিত, চোখ জ্বলিত, বুক দুলিত, অন্ধকারে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু কেহই ছটফট্ করিতে পারিত না, পাছে অপর জন ভাবে —ও জাগিয়া আছে। রজত যখন মাঝে মাঝে বেদনায় বিছানা হইতে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইত, রমলা মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িয়া

থাকিত। আবার কিছুক্ষণ পরে রজত বিছানায় আসিয়া শুইলে, রমলা উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিত, রজত নিঃশব্দে শুইয়া থাকিত। রাত্রে দুইজনে কতবার এইরূপ ঘর ও বাহির করিত।

অন্ধকার আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া রজত ভাবিত, এ কি হইল ; দৈন্য দারিদ্র্যের বোঝা বহন করা যায়, কিন্তু প্রেম না থাকিলে সে সত্যই মরিয়া যাইবে। হায়, সে রজত মরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রেত এ অন্ধকার বাড়ির বারান্দায় বেড়াইতেছে। তাহারই তো দোষ, কেন সে মাধবীর সঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। না, রমলার প্রেম মরে নাই। আচ্ছা সত্যই যদি প্রেম মরিয়া যায়, কি করা যাইতে পারে, জীবনে শুধু নৈরাশ্য, ব্যর্থতা! সে আমাকে আর ভাল বাসিতে পারিতেছে না, কিন্তু একদিন সে যে আমায় মনপ্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিল, সে কথা যে ভুলিতে পারিতেছি না। বিবাহটা হয়ত আদর্শ পথ নয়, ওটা অস্বাভাবিক অবস্থা, একজনের সঙ্গে সারাজীবন এম্‌নিভাবে জড়িত হইয়া বাঁধা থাকা তো প্রেমের পায়ে শিকল বাঁধা। এ বিবাহবন্ধনের খাঁচায় প্রেমের পাখীটি যেদিন মরিয়া যায় সেদিন সংসার যে সত্যই কারাগার হয়, জীবন হয় মেয়াদ খাটা। সত্যই যদি রমলা তাহাকে ভাল না বাসে তবে রজত তাহাকে মুক্তি দিতে চায়। অবরোধহীন নারীর দুর্ভাগ্য এই যে তাহারা অর্দ্ধমুক্ত। তাহারা একেবারে মুক্ত হইলে আপনাদের পূর্ণবিকাশের জন্য নিজেরাই সমাজ নিয়ম রচনা করিত। মুক্তির রূপ তাহারা দেখিয়াছে কিন্তু পায় নাই, বাহিরের জন্য তাহাদের মন চঞ্চল, কিন্তু ভাঙা ঘরেই থাকিতে হইবে। না, না, রমলার প্রেম মরে নাই, প্রেম হারাইলে রজত বাঁচিতে পারিবে না।

রমলা ভাবিত, আর কেন, আর সে বহিতে পারে না। সত্যকার রমলা তো অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ভূত ঘরবাড়ি এই স্বামী পুত্র কন্যাদের সংসার জুড়িয়া বসিয়া আছে, সে ভূত হইতে এ সংসারের

কবে ত্রাণ হইবে ? মাঝে মাঝে সে যেন জ্বরে শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিত, সত্যই হয়ত সে মরিয়া যাইবে। বারান্দায় বাহির হইয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিত,—না, দেবতা, মরিতে সে চায় না। স্বামীর প্রেম যদি সে সত্যই হারাইয়া থাকে তবু মরিতে সে চায় না ; মাতার দোষে এই ফুলের মত নির্ম্মল নিষ্পাপ শিশুদের দণ্ড দিও না প্রভু, তাহার অসহায় খোকাখুকীদের মুখে রাখ, তাহাদের জন্য তাহাকে বাঁচিতে দাও।

রজত প্রার্থনা করিত—প্রভু, এ বিভীষিকা হ'তে রক্ষা কর ; রুদ্র দয়া কর, দয়া কর, সব পাপ ক্ষমা কর, জীবনের এ অংশটাকে তোমার ত্রিশূল দিয়ে কেটে তোমার বজ্র দিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে, তোমার তৃতীয় নেত্র দিয়ে দগ্ধ কর, যে অগ্নিচক্ষু দিয়ে তুমি মদনকে ভস্ম করেছিলে,—তার পর তোমার জটাবাহিনী প্রেমমন্দাকিনীর জল ছোঁয়াও, ছোঁয়াও।

চতুর্থ নিশীথে অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া রমলা বহুক্ষণ গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিল। এ প্রেমহীন জীবন সে বহিতে পারে না। আকাশে মেঘের ঘনঘটা ভ্রূকুটি করিয়া রহিল। শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া রমলা বারান্দায় ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, সম্মুখে অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিতেছে, জলের ছাটে শাড়ীর অর্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সিক্ত মাথাটা রজত কোলে করিয়া বসিয়া আছে। বিদ্যুতের আলোয় দুইজনের অশ্রুজলভরা চোখের মিলন হইল। রজত রমলাকে কোলে করিয়া ঘরে মাদুরে আনিয়া শোয়াইল। রজতের ঈষদার্দ্র কোলে মাথা রাখিয়া রমলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অশ্রুজলসিক্তকণ্ঠে রজত বলিল, চলো রমু, আমরা কোথাও চলে যাই।

রমলা ভাঙা গলায় বলিল, তাই চলো। কিন্তু কোথায় যাবো ?

রজত রমলার ভিজে চুল খুলিতে খুলিতে বলিল, হাজারিবাগ যাবে ?

একটু আশ্চর্য্য হইয়া রমলা বলিল, হাজারিবাগ! কোথায় থাক্‌বে ?

রমলার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে রজত বলিল, যেখানে তোমায় প্রথম পেয়েছিলুম, সেই বাড়িতে।

রমলা বলিয়া উঠিল, না-না।

—তুমি জান না, সে বাড়ি কাজী-সাহেবের।

—কাজী ? তিনি এসেছেন ?—রমলার চোখের জলের বাঁধ আবার ভাঙ্গিয়া গেল।

মৃদুকণ্ঠে রজত বলিল, হাঁ তিনি এসেছেন; কাল তোমার কাছে আস্‌বেন।

ছোট মেয়ের মত আনন্দের স্বরে রমলা বলিয়া উঠিল, কাজী আস্‌বে, !—রমলা চোখের জলে রজতের কোল ভাসাইয়া দিল।

রজত চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, হাঁ কাজী-সাহেব মক্কায় গিয়েছিলেন, কিছুদিন হ'ল ফিরেছেন। ও বাড়ি যোগেশ-বাবু কাজী-সাহেবকে দিয়ে গেছেন।

অতি ধীরে রমলা বলিল, কিন্তু টাকা ? তোমার তো ছুটি নিতে হবে।

রজত রমলার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ললিত ছবি বিক্রীর পাঁচ শ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর বোম্বের একজিবিশনেও কিছু বিক্রী হয়েছে।

ললিত!—নামটি উচ্চারণ করিতেই রমলার অশ্রু আবার ঝরিতে লাগিল।

রমলাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া রজত বলিল, রমু চলো, আমরা এখান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

স্বামীর গলা জড়াইয়া রমলা বলিল, তাই চলো, তাই চলো।

বাহিরে আকাশে বারিঝরার বিরাম নাই, ঘরেও দুইজনের চোখে অশ্রু-জলের বাঁধন রহিল না!

সুপ্তশিশুর দোলার পাশে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া বহুরাত্রি পরে রমলা শান্ত হইয়া ঘুমাইল।

৩৪

রজতের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া মড়ার মুখের মত মরা আলোয় ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া যতীন কারখানার দিকে মোটর হাঁকাইয়া চলিল। দু'ধারে ভূতের ছায়ার মত বাড়ির সারি কোন প্রচণ্ড প্রলয়ের আশঙ্কায় যেন ভীতস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, গ্যাসগুলির দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে, ঝড়ের আকাশ শনির দৃষ্টির মত তাপিত পীড়িত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে, মাঝে মাঝে প্রেতের অট্টহাস্যের মত বিদ্যুতের ঝিলিক। কালীর মত অন্ধকার কালো খাল পার হইয়া ধূমে অবগুণ্ঠিত কদর্য্য বস্তি ছাড়াইয়া কারখানার কাছে আসিতেই যতীন শিহরিয়া উঠিল। পূর্ব্বাকাশে একখানা কালো মেঘের পটে কে রক্তের প্রলেপ বুলাইতেছে, ও কে সাপের ফণার মত লক্ লক্ শিখায় অন্ধকার আকাশ দংশন করিতেছে? কি বজ্রগর্জ্জন! উন্মত্তের মত লাফাইয়া যতীন চেঁচাইয়া উঠিল, Oh! fire, fire!

মোটরটা পাশের এক গাছে গিয়া ধাক্কা খাইল, ড্রাইভার হীরা সিং চকিতপদে উঠিয়া পিছন হইতে মোটরের চালন-চক্র না ধরিলে হয়ত পাশের নর্দ্দামায় গিয়া পড়িত! হীরা সিংএর হাতে মোটর

চালান ছাড়িয়া যতীন অগ্নিনেত্রে সম্মুখের অগ্নিলীলার দিকে চাহিয়া রহিল। চেঁচাইয়া বলিল, হীরাসিং, জল্‌দি হাঁকাও, জল্‌দি। আগুন না?

গম্ভীর কণ্ঠে হীরা সিং বলিল, হাঁ সাহেব, কারখানায় আগুন লেগেছে।

মোটর যখন কার্‌খানার গেটের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, যতীন মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মত কার্‌খানার মধ্যে মাঠে ছুটিয়া গেল। সাহেবকে মরিয়ার মত ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া হীরা সিং যতীনের পিছনে পিছনে ছুটিল।

শ্মশানের মত সম্মুখের অন্ধকার সহস্র জ্বলন্ত চিতার আলোকে ও ধূমে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়াছে, কি যে হইয়াছে যতীন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদিকের অন্ধকারে কতরকম শব্দের ঢেউ মত্ত সমুদ্রতরঙ্গের মত দুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, আগুনের শিখা লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতেছে।

সম্মুখে অগ্নির এই তাণ্ডব-নৃত্য এই প্রলয়-দৃশ্য দেখিয়া যতীনের প্রাণ যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। সব ভাঙিয়া চূরিয়া পুড়িয়া গলিয়া ছাই হইয়া যাক। পকেট হইতে নোটের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিয়া সে সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এ কি শব্দের ঝঞ্ঝা! চিমনি ফাটিতেছে, মেজে ফাটিতেছে, দেওয়াল ভাঙ্গিতেছে, ছাদ পড়িতেছে, মজুরেরা চীৎকার করিয়া কণ্ঠ ফাটাইতেছে, চারিদিকে ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে ভূতের মত মানুষেরা অগ্নি ঘিরিয়া প্রেতলোকের কোন্‌ তাণ্ডব-রাগিণী বাজাইতেছে।

এ কি অগ্নির নৃত্য! ওই গুদামঘর হইতে আগুন আফিসের ছাদে নাচিয়া পড়িল, ওই এদিকে হইতে ওদিকে লাফাইয়া যাইতেছে, কুলিদের খোলার বস্তির মাথায় লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে। ইট পুড়িতেছে,

কাঠ পুড়িতেছে, মাটি পুড়িতেছে, মানুষ পুড়িতেছে। মাটি জলিতেছে, লোহা জ্বলিতেছে, আকাশ জ্বলিতেছে, বাতাস জ্বলিতেছে, হৃদয় জ্বলিতেছে।

এই অগ্নিময় ধ্বংসের রক্তিম রূপ যতীনকে যেন প্রমত্ত করিয়া তুলিল, রুদ্রের পিনাকধ্বনি যেন কোন্ মায়ামন্ত্র পড়িয়া ডাক দিল। আফিস-ঘর হইতে যতীনের বাংলোর উপর আগুন লাফাইয়া পড়িতেই সে উন্মত্তের মত সেইদিকে ছুটিল। হীরা সিং তাহাকে আট্‌কাইতে পারিল না। যতীন চেঁচাইল, ম্যানেজার, ম্যানেজার! কোথায় ম্যানেজার? মানুষ পোড়ার একটা গন্ধ নাকে আসিতেই সেদিক্ হইতে ফিরিয়া ক্ষিপ্তের মত গুদাম-ঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতেই তাহার সম্মুখে একটা বাক্স প্রচণ্ড শব্দে ভাঙিয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ফাটিয়া গেল, তাহার ভিতরের শিশিগুলি ফাটিতেছে আর গলিতেছে। অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া সে দিক্ হইতে আসিয়া যতীন এবার ইঞ্জিনঘরের দিকে পাগলের মত ছুটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হীরা সিং জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া মাঠে টানিয়া আনিল। ছোড়্ দেও, the boy is burning there বলিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া হীরা সিংএর হাত ছাড়াইয়া যতীন ইঞ্জিনঘরের দিকে চলিল, সে দিক্ হইতে একটি ছেলের তীব্র আর্ত্তনাদ আসিতেছে, আর মাংস পোড়ার গন্ধ। একটু অগ্রসর হইতেই ভীম অজগরের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া এক মোটরকার আসিয়া তাহার পথরোধ করিল। দি ডেভিল! বলিয়া মোটরকারের পাশ দিয়া সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ছুটিয়া চলিল! আর-একটু যাইতেই কে পিছন হইতে টানিল, সঙ্গে সঙ্গে কারখানার শেষ প্রান্তে সমস্ত কারখানার জমি কাঁপাইয়া একটা কল ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই প্রচণ্ড শব্দে মুখ ঘুরাইয়া যতীন দেখিল মাধবী তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছে। কান্নার স্বরে মাধবী বলিল, বাড়ি চল।

ছেড়ে দাও, বলিয়া যতীন আবার অগ্রসর হইল। মাধবী তাহার

পিছনে ছুটিল। যতীন বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। আগুনের তেজে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এক জলের পাইপে পা আট্‌কাইল, একটা লোহার শিক সজোরে কপালে আঘাত করিল, মূর্চ্ছিত হইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চঞ্চল চরণে মাধবী আসিয়া নতজানু হইয়া যতীনের দেহ দুই হাতে জড়াইয়া আগুনের ঝল্‌কা হইতে অনেকখানি টানিয়া লইল। মাথাটায় হাত বুলাইয়া, এবার সে কি করিবে ভাবিতেছে, তাহার সম্মুখে একটা দেওয়ালের এক পাশ ভাঙিয়া পড়িল। অগ্নির তেজ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এরূপভাবে যতীনকে ফেলিয়া যাইতেও তো সে পারে না।

না, কেন সে যাইবে, ওই অগ্নির লক্ লক্ শিখা তাহাকে যেন বাঁশী বাজাইয়া ডাকিতেছে, এ প্রলয় উৎসবে অগ্নিনাগিনীদের সঙ্গে সেও যোগ দিবে, ওই তাণ্ডব নৃত্যে অগ্নির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেও ছাই হইয়া যাক্ না। অগ্নিমদিরা তাহাকে যেন মত্ত করিয়া তুলিতেছে, যাদুমন্ত্রে ডাকিতেছে, আবেগের সঙ্গে মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল, মরিয়া হইয়া বুঝি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ে। পায়ের কাছে যতীন আর্ত্তনাদ করিয়া নড়িয়া উঠিল। যতীনের অর্দ্ধদগ্ধ সিল্কের সুটের দিকে চাহিয়া মাধবী নতজানু হইয়া তাহার পাশে বসিল। যতীনের কপাল দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। মাধবী আতর-সুবাসিত রুমালটা কপালে চাপিয়া ধরিল। সম্মুখে অগ্নি-নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্য ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিছনে এক দরজা ভাঙ্গিয়া-পড়িয়া যাইবার পথ বন্ধ করিল। মাধবী নির্নিমেষ নয়নে যতীনের রক্তাক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মা—জী!

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া একটু ভীত হইয়া মাধবী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যেন্ আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া দাঁড়াইল,

তাহার চোখ জ্বলিতেছে, মুখ জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত দরজাখানা সে ঠেলিয়া যাইবার পথ করিতেছে।

ভাঙা দরজাখানা ঠেলিয়া দিয়া যাইবার পথ করিয়া গালপাট্টা দাড়ি নাড়িয়া হীরা সিং ডাকিল, মা-জী! সে পাগ্‌ড়ি খুলিয়া যতীনের মাথায় জড়াইল, তার পর আপন সবল দুই বাহু দিয়া যতীনের অর্দ্ধমূর্চ্ছিত দেহ তুলিয়া কোলে করিয়া মোটরের দিকে ছুটিল। মাধবী যতীনের মাথাটা হাত দিয়া ধরিয়া হীরা সিংএর সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

মোটরে অর্দ্ধশায়িত ভাবে যতীনকে রাখিলে, বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে যতীন একটু সচেতন হইয়া নড়িয়া উঠিল, রক্তাক্ত পাগ্‌ড়ি খসিয়া গেল, মাধবী তসরের শাড়ীর আঁচল ছিঁড়িয়া কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাহার পাশে বসিয়া আপন বুকে যতীনের মাথাটা রাখিয়া বলিল, হীরা সিং, জল্‌দি।

হীরা সিং মোটর ছুটাইয়া বাড়ির দিকে চলিল। ইঞ্জিনচালকের মত কয়লার গুঁড়া ধোঁয়া ধুলোয় কালো অর্দ্ধেক-পোড়া স্যুট-জড়ান যতীনের তপ্ত দেহ নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্তাক্ত কপাল নিজের কাঁধে রাখিয়া মাধবী একবার ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিল। কালো আকাশে বিদ্যুৎ অগ্নিবরণী নাগিনীর মত খেলিয়া বেড়াইতেছে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল, সজল ঝোড়ো হাওয়া দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে।

জলহাওয়ার স্পর্শে যতীনের মূর্চ্ছা ভাঙিয়া গেল, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে আর্ত্তনাদ করিয়া চেঁচাইয়া মাধবীর বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া লাফাইয়া উঠিতে চাহিল।

কে—পালাও—আগুন—চুরমার—বয়লার—রমলা—ছেড়ে দিচ্ছি—পালাও—boy burning—ছোড় দেও—আহা grand—বা জ্বলে যাক্—সব পুড়ে যাক্—আহা—ছেড়ে দাও—fire—রমলা—

হীরার মত উজ্জ্বল মাধবীর চোখ নীলার মত স্নিগ্ধ হইয়া আসিল, গভীর প্রেমের সহিত সে যন্ত্ররাজের অগ্নিলীলাদগ্ধ এই যান্ত্রিককে আপন বক্ষে সজোরে জড়াইয়া রাখিয়া তাহার রক্তাক্ত কপালে ধীরে চুম্বন করিল। একবার দূরে কারখানার দিকের আকাশে ধূমের কুণ্ডলীর দিকে চাহিল, যেন কোন সর্পযজ্ঞ হইতেছে। তার পর অনিমেষ নয়নে যতীনের মুখের দিকে মাধবী চাহিয়া রহিল। কত যুগ পরে সে স্বামীকে এইরূপ বক্ষে জড়াইয়া চুম্বন করিল! যতীন শান্ত হইয়া মাধবীর বুকে শুইয়া রহিল। অন্ধকারে উল্কার মত মোটর ছুটিয়া চলিল।

৩৫

এই অগ্নিকাণ্ডে কার্‌খানা যেমন পুড়িয়া গেল, যতীনের মনও তেমনি ঝল্‌সিয়া গেল; কলগুলি যেমন ভাঙিয়া গেল, যতীনের বলিষ্ঠ দেহও তেমনি ভাঙিয়া গেল। ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা হইয়াছিল, তাঁহার মত অর্থপতির নিকট বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু সে আর এ-যন্ত্রের বোঝা বহিতে, এ-অর্থের দাসত্ব করিতে অসমর্থ। কিছুদিন হইতেই এ-শক্তির দোলায় দুলিয়া দুলিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত দিন কলের মত খাটা,— আফিস হইতে কার্‌খানা, কার্‌খানা হইতে বাজার ব্যাঙ্ক, সর্ব্বদাই এ অর্থের মজুরি করিয়া জীবন যেন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। আর সে টাকা জমাইয়া সুখ পায় না। টাকার জন্য সে এ-কলকার্‌খানার কাজে লাগে নাই, বুকের মধ্যে কোন শক্তি তাহাকে ইঞ্জিনের মত চালাইয়াছে, সে শক্তির আগুন যেন নিভিয়া যাইতেছে।

সেদিনকার অগ্নিকাণ্ডে যতীনের দেহ দগ্ধ হয় নাই, কপালে শুধু একটু ক্ষত হইয়াছিল, ঘোর মানসিক অশান্তির পর এরূপ অগ্নিদৃশ্যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এ কি অশান্তি তাহার বুকে

বাসা বাঁধিয়াছে, কিছুই তাহার ভাল লাগে না। এই কলকারখানা, এই ঘর-বাড়ি, এই পুঞ্জিত শক্তি, ধনের স্তূপ, সব অর্থহীন, তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে। কিসের জন্য সে খাটিয়া মারিতেছে? science civilization, humanity—মানব-সভ্যতার কতটুকু উন্নতি সে করিয়াছে? দেশের সে কি কল্যাণ করিয়াছে? এই অগ্নিকাণ্ডে যে কুলিবালক পুড়িয়া মরিয়াছে তাহার কথা মনে হইলে তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিত। কুলিদের পোড়া-বস্তির সংস্কারের জন্য সে নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়াছে। কিন্তু, সেই কুলিবালকের জীবনের জন্য কে দায়ী?

দিনটা কোনরকমে আফিসে, ব্যাঙ্কে, কারখানায় ভূতের মত ঘুরিয়া সব নূতন করিয়া গড়িবার ব্যবস্থা করিতে কাটিয়া যাইত, কিন্তু দুঃস্বপ্নময় রাত্রি অসহ্য হইত। কোন রাতে সে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিত—আগুন, আগুন, পালাও, পুড়লো—বাঃ! তাহার চোখের সাম্‌নে রাঙা আলো জ্বালিয়া উঠিত, এক দগ্ধ বালকের আর্ত্তনাদ কানে আসিত, অর্দ্ধরাত্রে প্রলয়ঙ্করের ডমরুধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া জান্‌লা খুলিয়া সে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত, আর ঘুম হইত না।

স্বামীর ব্যথাভরা মুখের দিকে মাধবী করুণ নয়নে চাহিয়া থাকিত। দেহের ক্ষত কত সেবা করিয়া সে সারাইয়াছে; কিন্তু মনের এ অশান্তি, এ জ্বালা, সে কি করিয়া দূর করিতে পারে! প্রতিদিন সে বড়-বড় সাহেব ও বাঙালি ডাক্তার ডাকিয়া স্বামীকে দেখাইত। কি হইয়াছে? মাথা কি বিকল হইয়া যাইবে?

সবাই এক কথা বলিত, victim of modern civilization, complete nervous breakdown. কি চিকিৎসা হইবে? কি টনিক, কি ওষুধে সারিবে? সবাই এক উত্তর দিত, কোন টনিক, কোন ওষুধ নয়। এই নগরজীবন ও সভ্যতার দুর্ব্বহ বোঝা ছাড়িয়া শ্যামা-

বসুন্ধরার স্নিগ্ধ কোলে ফিরিয়া যাইতে হইবে, পৃথিবীমাতার সৌন্দর্য্য-সুধাভরা স্তন্যরস পান করিয়া চিন্তাহীন মুক্ত জীবন যাপন করিতে হইবে, এই দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, হিংসা, অর্থশক্তির জন্য হানাহানি নয়, সূর্য্যের উদার আলো, নির্ম্মল জল, শ্যামল মাটির টনিক, প্রকৃতির আপন হাতের জীবনসুধা পান করিতে হইবে।

যতীন ভাবিত; জীবনের দুই ক্ষুধা,—অন্নের জন্য ও অন্তরের জন্য। অর্থ আর সে চায় না, সে যথেষ্ট অর্থ পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সে প্রেমের জন্য তৃষিত। তাহার স্ত্রী কি সত্যই তাহাকে ভালোবাসে না? আগুন হইতে সে বাঁচাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে কি স্নেহ ও নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে। কিন্তু এ মাতার সেবা নয়, সে প্রিয়ার প্রেম চায়। এই অর্থ ছাড়িয়া, স্ত্রী ছাড়িয়া, এই মন্ত্রশক্তি ও বিংশশতাব্দীর সভ্যতা ছাড়িয়া, এই সূর্য্যালোকদীপ্ত বিচিত্রবর্ণময় নদী-মেখলা বনচ্ছায়াস্নিগ্ধ সুন্দরী ধরণীর মুক্ত ক্রোড়ে এক নগ্ন বর্ব্বর উন্মুক্ত জীবনের জন্য সে তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সহজ সরল বন্যজীবনে প্রাণের নবশক্তি দিয়া বাঁচিয়া থাকিবার নিছক আনন্দ উপভোগ করিতে সে চায়।

তাহার যে যান্ত্রিক প্রতিভা ছিল, তাহা তো মানব-সভ্যতার উন্নতির কাজে সে লাগায় নাই, সে শক্তির ব্যভিচার করিয়াছে; যে নব যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া মানবের কর্ম্মশক্তি বাড়াইতে পারিত সে বণিক্ হইয়া স্বর্ণের নিগড় গড়িয়াছে। এ যন্ত্রের দাসত্ব, স্বর্ণের দাসত্ব আর নয়, সে বিদ্রোহী, এ আর ভাল লাগে না।

যতীন ড্রয়িংরুমে খোলা জানলার কাছে এক ইজিচেয়ারে শুইয়া সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। মাধবী তাহার পাশে সোফায় আসিয়া বসিল, ধীরে বলিল, আজ ডাক্তার কি বল্লে?

মাধবীর দিকে না চাহিয়া যতীন বলিল, কি আর বল্বে, victim of machine, neurasthenia.

ধীরে কপালে ক্ষতের দাগের উপর একটু হাত বুলাইয়া মাধবী বলিল, কি ভাব্‌ছ ? কি কর্‌বে ?

—তাই ভাব্‌ছি জীবনটায় কি কর্‌বার আছে ?

একটা দমকা বাতাসে পথের ধূলাবালি ঘরে উড়িয়া আসিল। মাধবী শার্শী বন্ধ করিয়া দিতে উঠিলে যতীন বলিল, না, না, থাক্ জানলাটা খোলা, ঝড়ের মেঘগুলো ভারি স্থন্দর দেখ্‌তে।

ধীরে আবার পাশে বসিয়া মাধবী বলিল, অত নিরাশ হয়ো না।

—হাঁ, এস, কিছু করা যাক্, কি করা যায় বল তো !

—ক্ষতি তো বিশেষ কিছু হয় নি, এত দমে' পড়েছ কেন ?

—না, ও ক্ষতির জন্য ভাব্‌ছি না। কিন্তু ও-জীবন আর নয়, শুধু শক্তির সাধনা কর্‌তে গিয়ে প্রলয়াগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল। দেখ, কি কর্‌লুম, মানুষগুলোকে ভূতের মত খাটিয়ে পশুর মত রাখা।

—সবাইকে বাঁচ্‌তে হবে তো, খেতে হবে তো।

—কিন্তু আনন্দ কৈ, কিছু দেশের কাজ সমাজের কাজ—

—কিন্তু—

—না কিন্তু নয়, হাঁ কিন্তু, আমরা কে যে পরের জীবন নিয়ে খেলা কর্‌ব, চালাতে গিয়ে উল্টো হবে, আবার এম্‌নি অগ্নিকাণ্ড—

—কিন্তু কিছু কর্‌তে হবে তো।

—না, সেটা ভুল। আগে ঠিক কর্‌তে হবে—জীবনের উদ্দেশ্য কি, আমাকে দিয়ে কি কাজ হ'তে পারে, কিসের জন্য আমার সৃষ্টি। সে কাজ যতই তুচ্ছ যতই সামান্য হোক, সে কাজ করাই আমার ধর্ম্ম—জীবনের সত্যি কাজ আমরা খুঁজি না—

—সবাইয়ের কাজ কি সমান—

—তা নয়, কিন্তু আমার শক্তি দিয়ে আমি পৃথিবীর কি কল্যাণ করে' যেতে পারি—আমার শক্তি—না শক্তি নয়, প্রেম দিয়ে, প্রেম—

প্রেম, এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া যতীন করুণ-চোখে কালো মেঘ-স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মনও উদাস হইয়া উঠিল। প্রেম,—তাহাদের প্রতিদিনের জীবনে কতটুকু প্রেম আছে?

মাধবী ভাবিল, স্বামী যে অসুখী, তাহা কি তাহার দোষে? সে তো একদিন প্রেমের সুধাপাত্র হাতে করিয়াই স্বামীর জীবনপথে আসিয়াছিল তখন স্বামী শক্তির রথে জয়যাত্রায় চলিয়াছে, তাহার দিকে চাহে নাই। তাই শূন্য পাত্র কত রকমে ভরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, কত রকমে সে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু হৃদয় তো পূর্ণ হইল না। আজ এই ঝড়ের অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারা কি আবার নূতন করিয়া বোঝা-পড়া করিয়া লইতে পারিবে, নবপ্রেমের জীবন আরম্ভ করিতে পারিবে?

ধীরে সে উঠিয়া গেল। বাতাস আরও উদ্দাম, অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল।

যতীন ভাবিতে লাগিল, সত্যই সে কি এতদিন বৃথা কাজ করিতেছে, এই যন্ত্রপূজার কি কোন সার্থকতা নাই? আছে বৈ কি। মানবের সভ্যতার উন্নতির জন্য যন্ত্রেরও দরকার। কিন্তু প্রথমে যে হৃদয়ের দরকার, প্রেম চাই, একথা যে সে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার সমস্ত দেহে যেমন স্নায়ুগুলি বেদনায় বিকল হইয়াছে, তেম্নি সমস্ত মানব-সভ্যতার নাড়ীতে নাড়ীতে কিসের ব্যথা, কি ক্ষুব্ধ তৃষ্ণা, কি করুণ আর্ত্তনাদ। শক্তির সহিত শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে হিংসা স্বার্থের আগুন জলিয়া উঠিতেছে, শান্তি নাই, আনন্দ নাই।

পরদিন সমস্ত বিকাল মাধবী বৃহৎ বাড়ির সব ঘর আন্‌মনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার তাসের আড্ডা ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও বাহির হইতে ভাল লাগে না, সাজানো শূন্য ঘরগুলি ঘুরিয়া আপন সাজ-সজ্জার ঘরে আসিয়া আল্‌মারির আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল; কোন্

বেদনার আগুনের ঝল্‌কায় তাহার দেহও শুকাইয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

চোখগুলি আয়নার অতি কাছে আনিয়া আঙুল দিয়া টানিয়া মুখখানি দেখিতে লাগিল। সহসা পিছনে এক ঝাঁকুনি খাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। যতীন তাহার ঘাড়ের কাছে নীল ব্লাউসটা ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকা মারিতেছে।

অবাক্ হইয়া সে যতীনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া ভাঙা-মাস্তুল ভাঙা-নোঙর জাহাজের মত যতীন দাঁড়াইয়া, তাহার শুষ্ক মুখ, রুক্ষকেশ, বিশৃঙ্খল কাপড়। মাধবী ঘুরিতে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মাধবীর হাত ধরিয়া তাহার সমস্ত দেহ নাড়াইয়া যতীন গম্ভীর স্বরে বলিল,—শো'ন, তোমার কি চাই ?

অবাক্ হইয়া মাধবী বলিল, কি চাই ?

হায়, তাহার কি চাই, সে কি করিয়া বলিবে ? এতদিন পরে কি খোঁজ করিবার সময় হইল ? মাধবীর চোখের দিকে চাহিয়া যতীন আশ্চর্য্য হইল, ও যেন বরফের চোখ, রক্তের একটু লেশ নাই।

মাধবী ম্লান হাসিয়া বলিল, কি বল্‌ছ ?

ধীরে যতীন বলিল, বল্‌ছি তোমার কত টাকা চাই ?

—কত টাকা ?

—হাঁ, কত টাকা হ'লে তোমার চল্‌বে ?

মলিন দৃষ্টিতে সে ভীত হইয়া যতীনের দিকে চাহিল। তাহার কান্না আসিল। তাহার স্বামীর কি সত্যই মাথা খারাপ হইতেছে।

ম্লান হাসিয়া সম্মুখের কাপড়ের আল্‌মারি খুলিয়া নানারঙের শাড়ী-গুলি দেখাইয়া মাধবী বলিল, আচ্ছা তুমি suggest করনা, কি পর্‌ব, আমার ঠিক করতে এত দেরি লাগে।

যতীন থাকে থাকে সাজান শাড়ীগুলি একবার হাত দিয়া ঘাঁটিল,

তার পর মাধবী যে শাড়ীখানি পরিয়া ছিল, তাহার দিকে চাহিল, একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ও সব শাড়ীই সমান, যেটা ইচ্ছে পর।

—ওগো!

—হাঁ, এস তুমি, কত টাকা তোমার চাই, দিয়ে যাই।

ধীরে যতীন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, মাধবীও তাহার পিছন পিছন ম্লানমুখে চলিল!

দুইজনে লাইব্রেরিতে দুই চেয়ারে মুখোমুখি বসিল। স্থিরনেত্রে মাধবীর পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া যতীন বলিল, দেখ, আমি আজ চ'লে' যাচ্ছি।

—কোথায়?

—তা জানি নে, এ সব ছেড়ে যেখানে হয়, যে-কোন বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে—

ভীতবিস্মিত নয়নে মাধবী স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মুখ গম্ভীর, দৃঢ়, বেদনার ছায়া যেন কাটিয়া যাইতেছে। কান্নার সুরে সে বলিল, সত্যি? কোথায় যাবে?

—হাঁ সত্যি যাব। তোমার খরচের জন্য কত টাকা রেখে যাব বল?

ড্রয়ার হইতে চেক্‌বুকটা সে বাহির করিল।

ভাঙা-গলায় মাধবী বলিল, আমিও যাব।

চেক্‌বুকটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটু হাসির সুরে যতীন বলিল, তুমিও যাবে?

মৃদুস্বরে মাধবী বলিল, হাঁ। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, যেখানে হয়, আমারও এ-সব আর ভাল লাগ্‌ছে না—

উৎসাহের সঙ্গে যতীন বলিয়া উঠিল, পারবে? সুন্দরবনের জঙ্গলে যেতে?

মাধবীর পাণ্ডুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল, সুন্দর বন! শিকার করতে?

—না, শিকার করতে নয়, বাস করতে।

ছোট মেয়ের মত মাধবী উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, হাঁ, আমিও যাব।

চেক্‌বুকটা ঘরের কার্পেটে ফেলিয়া দিয়া যতীন বলিল, আচ্ছা তবে এস, আমি ষ্টিম্‌লাঞ্চ্‌টা ঠিক করে' রাখ্‌তে বলেছি।

খোলা জানলা দিয়া মেঘের ভ্রুকুটির দিকে চাহিয়া মাধবী ধীরে বলিল, এক্ষুনি? ঝড় আস্‌ছে যে!

দাঁড়াইয়া উঠিয়া যতীন বলিল, তবে থাক, আমি চল্‌লুম।

মাধবী যতীনের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, না, না, আমিও যাব, দাঁড়াও।

মাধবীর পিঠ চাপড়াইয়া যতীন বলিল, শীগ্‌গির এস, কিছু সাজ করতে হবে না, শুধু কয়েকখানা কাপড় নিয়ে এস।

ছোটমেয়ের মত লাফাইতে লাফাইতে মাধবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া, সম্মুখে যে-কাপড়-জামা পাইল, তাহাই এক সাদা আলোয়ানে জড়াইয়া পুঁটুলি করিয়া বগলে চাপিয়া নাচের তালে চুল দোলাইতে দোলাইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।

দ্বারের কাছে শচী তৃষিতের মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মনে পড়িল, তাহার সহিত বায়োস্কোপে যাইবার কথা ছিল বটে।

শচী অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল, কি মাধবী-দি, এত ছুটোছুটি? দিন পুঁটুলিটা।

মাধবী মধুর হাস্যে পুঁটুলী দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, Oh Sachi! wild life! forest! lovely!

হতভম্ব হইয়া শচী মাধবীর দিকে চাহিল। তাহার গালে দুই টুস্‌কি

মারিয়া সিংহের গর্জ্জনের নকল করিয়া মাধবী ডাকিয়া বলিল,—ঘাঁউ, ঘাঁউ, জঙ্গলে চল্‌লুম, ta—ta—

স্নিগ্ধ চোখে তাহার দিকে চাহিয়া মাধবী স্বামীর পাশে মোটরে লাফাইয়া গিয়া বসিল। হীরাসিং মোটর ছুটাইল। শচীর বিদায়করুণ তরুণ মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চাহিয়া হাতের রুমালখানি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী অন্ধকারে মিশিয়া গেল। মেঘঘন আকাশ প্রেমিকের সজল দৃষ্টির মত শূন্যবাড়ির উপর চাহিয়া রহিল।

৩৬

আবার হাজারিবাগের সেই বাড়িতে। বহুদিনের অযত্নে বাড়িখানি পোড়ো দেখাইতেছে, রক্তের মত লাল রং ঝরাপাতার মত কালো হইয়া আসিয়াছে, সমস্ত বাড়িখানি যেন কোন মধুর দিনের উদাসস্মৃতি—কোথাও গাছ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোথায় বালি খসিয়া গিয়াছে, লাল কাঁকরের পথে ঘাস জমিয়াছে, ফুলের বাগান আগাছা, পরগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘরে ধুলো জমিয়াছে, কার্পেট ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দেওয়ালের রং মলিন হইয়া গিয়াছে।

রজতেরা প্রায় দিন পনের হইল এই বাড়িতে আসিয়াছে। দোতলার ধুলোভরা ঘরগুলো তালাবন্ধই রহিয়াছে, সেই ঘরগুলির সুপ্রচুর ধূলা ঘাঁটিয়া পরিষ্কার করিতে রমলার খুব ইচ্ছা থাকিলেও তাহার আর সে শক্তি নাই। নিচের বড় ড্রয়িং-রুমটা পরিষ্কার করিয়াই বসিবার শুইবার ঘর করা হইয়াছে। শুধু কাজী-সাহেব তাঁহার পুরাতন ঘরে গেছেন।

সুন্দর সকালবেলা, ড্রয়িং-রুমটা মধুর উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। পিয়ানোর ঠিক উল্টোদিকের কোণে এক ছোট মার্ব্বেল টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া খাওয়া হইতেছিল। রমলার এক পাশে রজত, আর-এক

পাশে খোকা বসিয়া; তাহার উল্টোদিকে কাজী-সাহেব খুকীকে কোলে করিয়া।

কাজী-সাহেবের চেহারার খুব বেশি পরিবর্ত্তন হয় নাই, শুধু কোঁকড়ান দীর্ঘ চুলগুলি সব প্রায় পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, শ্মশ্রু দীর্ঘ শুভ্রবর্ণ, চোখের জ্যোতি একটু তীক্ষ্ণ, পক্ক আম্রের মত মুখের লাবণ্য, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তিনি খুকীকে কোলে করিয়া ফিডিং বোতল ধরিয়া দুধ খাওয়াইতেছিলেন।

রজতের দেহ শীর্ণ হইয়াছে, কপালে কয়েকটি চিন্তার দুঃখের রেখা টানা, চোখের কোলের কালি চশমার কাচ দিয়া দেখা যাইতেছে, হাত-পাগুলি একটু সরু হইয়াছে, গলায় কয়েকটি ধমনী স্ফীত দেখা যাইতেছে। রমলার তনুখানি সন্ধ্যার আলোকের মত করুণ সুন্দর, তাহার হীরার মত জ্বল্‌জ্বলে মুখ নীলার মত স্নিগ্ধ, বিদ্যুতের মত দীপ্তিভরা চোখ এখন সুদূর পথহারা তারার আলোর মত চাহিয়া আছে। খোকার নিকারবকারের খোলা বোতাম লাগাইয়া সে একটু নাক সিঁট্‌কাইয়া দুধের পেয়ালা টানিয়া লইল।

রজত মুচ্‌কিয়া হাসিয়া রমলার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া বলিয়া উঠিল, বাসি লুচি, O lovely! কিন্তু দুধটা—আঃ!

সাত বছর আগে এই বাড়িতে এম্‌নি এক স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে রমলা রজতকে এই কথাগুলি বলিয়াছিল।

রাগের ভান করিয়া রমলা বলিয়া উঠিল, দেখ, অমন কর্‌লে আমি কিছুতেই দুধ খাব না।

—বা, খাবে না, ডাক্তার বলেছে—

—ডাক্তারেরা অমন ছাইপাঁশ কত কি বলে।

খোকা মায়ের দিকে হাসিয়া চাহিয়া বলিল,—বা, মা, আমাদের বেলায় খোকা শীগ্‌গির দুধ খা, আর নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি—

রজত খোকার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, বল তো বাবা, বল তো।

খোকা সম্মুখের দুধের পেয়ালা সরাইয়া বলিল, তুমি দুধ না খেলে আমিও খাব না।

খুকীও ফিডিং বোতল হইতে মুখ সরাইয়া বলিয়া উঠিল, তাজী!

কাজী হাসিয়া বলিলেন, এই দেখ, খুকীও বল্‌ছে আমিও না।

রজত দুষ্টামিভরা চোখে রমলার দিকে চাহিয়া দুধের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দিল। রমলা মুখটা একটু বিকৃত করিয়া কুইনাইন খাওয়ার মত দুধ খাইতে লাগিল। সেই ঈষৎবিকৃত প্রিয়মুখের অপূর্ব্ব সুষমার দিকে রজত মুগ্ধ-চোখে চাহিয়া রহিল। কোনমতে দুধ খাইয়া রমলা পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল! তলায় একটুখানি পড়িয়া রহিল!

রজত বলিল, ওটুকুন?

—আর আমি কিছুতেই পারব না, সরের কুচি কে খাবে?

আমি, বলিয়া খোকা মায়ের প্রসাদ পাইল।

খাওয়া শেষ হইলে রজত রমলার হাত ধরিয়া উঠাইল। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার সর্দ্দি-জ্বর হইয়াছিল; এখানে আসিয়া একটু সারিয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা একেবারে যায় নাই। রজতের হাতে মৃদু ভর্ করিয়া রমলা ঘর হইতে বাহির হইল। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নামিয়া এক বড় গাছের তলায় গিয়া থামিল। এই গাছের তলাটাই মাধবীর প্রিয় স্থান ছিল; এখন সে গাছ আরও বড় হইয়াছে, চারিদিকে নানা আগাছা জন্মিয়াছে। গাছের ছায়ায় দোলান-চেয়ারে রমলাকে বসাইয়া রজত নিচে ঘাসের উপর তাহার পাশে বসিল। রমলা অতি মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিল। এই রোগশীর্ণ প্রিয়ার মুখে করুণ-সুন্দর প্রেমের আভামণ্ডিত হাসিটির প্রতি রজত বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। ধীরে মাথাটা রমলার চেয়ারে ঠেকাইয়া হাতের বইখানা

খুলিয়া রজত বলিল. কোন্ গল্পটা পড়্ব বল তো, The Thousand Dollar Smile।

রমলার পাণ্ডুর মুখ রাঙা হইয়া গেল, সে ধীরে বলিল, বই থাক। এস গল্প করা যাক্, আচ্ছা জীবনটা কি মজার নয়? সাত বছর আগে এই বাড়িতে কেমন এসেছিলুম, আবার এ কেমন এলুম! হাসি পায়।

রজত রমলার হাতটা টানিয়া লইয়া বলিল, হাঁ দেখ্তে গেলে মজার বটে। কিন্তু ভাব্তে গেলে, বুঝতে গেলে মনটা ভারি হ'য়ে আসে। আচ্ছা, সেই সন্ধ্যেবেলা, তোমার মনে পড়ে, মোটরকারে তোমায় প্রথম দেখি?

রমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি কিন্তু সত্যি রুমাল ওড়াইনি, আমি মুখ মুছ্ছিলাম।

—ও দুষ্টু! আচ্ছা তোমার বেশ লাগছে এখন, চলে আস্তে কোন কষ্ট হ'ল না!

—না, এবার নেহাৎ মরলুম না দেখ্ছি।

ধীরে রজত পাঞ্জাবির বুক-পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া রমলাকে একটু দেখাইয়া বলিল, আচ্ছা এটা কি পাগলামী হ'য়েছিল?

—ওমা, ওটা কোত্থেকে পেলে? দাও, দাও, শীগ্গির, আমি ছিঁড়ে ফেলি।

—আচ্ছা, কি বলে' লিখেছিলে!

—সত্যি, কল্কাতার অসুখের সময় এত ভয় হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমি আর বাঁচব না। ওটা ছিঁড়ে ফেল, দাও আমায়।

—না।

দুইজনে হাতে হাত দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন কোন

পবিত্র মুহূর্ত্ত, মনের সব কথা ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া নীরবতার অতল সাগরে হারাইয়া গিয়াছে।

চিঠিখানি রমলা কলিকাতায় রোগশয্যায় লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল—

"আমি যদি মরি, তুমি খুব কষ্ট পাবে জানি! কিন্তু খুব দুঃখ কোরো না, তা হ'লে আমি পরলোকে গিয়ে শান্তি পাব না। তোমার মত স্বামী পেয়েও যদি মরি, সে আমার পরম দুর্ভাগ্য, আর তোমার কোলে মাথা রেখে মরব এমন সৌভাগ্য আর কি আছে! মরার পর মানুষ বেঁচে থাকে কি না জানি না, আমার বোধ হয় থাকে, আমার আত্মা তোমার ভালোবাসা পরজন্মে গিয়েও ভুল্‌বে না। জানি, তোমার খুব কষ্ট হবে, কিন্তু যিনি প্রেমের দেবতা, আমাদের মিলন ঘটিয়েছেন, তিনি তাঁর শান্তিমঙ্গলময় কোলে টেনে নেবেন, তোমার কোল ছেড়ে আমি তাঁর কোলেও যেতে চাই না, কিন্তু জীবনে তো আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

"তুমি খোকাকে শুধু দেখো, আর মাধবী যদি খুকীকে মানুষ কর্‌তে চায়, তাকে দিয়ে দিও, ও তার godmother হ'তে চেয়েছিল। ও আমাদের খুবই ভালোবাসে। এবার ও বদ্‌লে যাবে, ও সত্যি খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু জীবন ওকে ব্যঙ্গ করেছে বলে' ও জগৎকে ব্যঙ্গ কর্‌তে চায়; ভাগ্য ওকে কাঁদিয়েছে বলে' ও ভাগ্যের সঙ্গে তাল ঠুকে হাস্‌তে গেছে, কিন্তু এবার ও সত্যি ভাল হবে।

"দেখ, আমার সব গয়না খোকার বউকে দিয়ে গেলুম, আর সব জামা-কাপড় খুকীকে; সুধু মুক্তার হারছড়া তুমি ললিতের বউয়ের জন্য রেখ। ললিতকে আমার ফাউন্‌টেন্‌-পেন্‌টা, কাজীকে আমার হাতীর-দাঁতের বাক্সটা আর হাফেজের বইখানা, যতীনবাবুকে আমার দোলানো চেয়ারটা আর মাধবীকে আমার পিয়ানো আর ভেল্‌ভেটে-বাঁধান খাতাটা

দিও। এ-সব জিনিষ তুমি রাখ্‌লে, রোজ দেখে তোমার কষ্ট হবে। আমার নামে জমানো যা টাকা আছে, তা কোন বালিকা-ইস্কুলে মামাবাবুর নামে দান কোরো।

"তোমাকে তো আমি আমার দেহ-মন সমস্ত জীবনই দিয়েছি, মৃত্যুর পর তোমারই থাক্‌ব। তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার দেহ-মন ফুলের মত ফুটে উঠেছিল, আজ তোমারই পায়ের তলায় সে ঝরে' পড়েছে। তোমার প্রেম পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে, যিনি প্রেমের দেবতা, জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা, তাঁকে বার বার প্রণাম করে' খোকা-খুকীদের তোমার কাছে রেখে আমি সুখে মর্‌ছি, জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম তুমি।"

এই চিঠিখানি রজত কতবার চোখের জলে ভিজাইয়া পড়িয়াছে। ধীরে চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া সুদূর-দিগন্তের নীল-পাহাড়ের দিকে-চাওয়া রমলার মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কি সুন্দর!

মৃদু হাসিয়া রমলা বলিল কি?

তুমি, বলিয়া রজত তাহার গালে তিলের উপর চুমো খাইল।

রমলা ধীরে বলিল, আচ্ছা, দেখ, এই পাহাড়টা, খুব বেশি দূরে? নদী পেরলেই পৌছান যাবে?

—তোমার যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে?

—ভারি ইচ্ছে করে পাহাড়ের শালবনে গিয়ে ঘুর্‌তে।

—আচ্ছা সেরে ওঠ।

—বা, বেশ তো সেরেছি। আচ্ছা, মাধবীর চিঠিখানা কি তোমায় দেখিয়েছি?

—না।

—দিব্যি বেড়াচ্ছে তারা ষ্টীমার করে। সুন্দরবন ঘুরে পদ্মা দিয়ে তারা ব্রহ্মপুত্রে গেছে, ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে নাকি যাবে। লিখেছে,

তাদের নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে। আহা, দেখ, কি সুন্দর কচি ঘাস!

চেয়ার হইতে নামিয়া রমলা রজতের পাশে বসিয়া ঘাসগুলির উপর হাত বুলাইতে লাগিল, যেন তাহারা কোমল সুকুমার শিশুর দল। রসহীন রুক্ষ রুদ্র প্রান্তরে শুষ্ক ভূমি ভেদ করিয়া জীবনের জয়ধ্বনির মত এই সবুজ শিশুগুলি আলোর দিকে মাথা তুলিয়া চাহিয়া আছে, সবাইকার পায়ের-তলার পেষণে-পেষণেই তাহাদের যাত্রা; তবু এই ঘাসগুলি শালগাছের চেয়েও, নব-মুকুলভরা আমগাছের চেয়েও, গোলাপ-ঝাড়ের চেয়েও, মধুর রহস্যময়।

রমলা ঘাসে হাত বুলাইয়া বলিল, দেখ, এই ঘাস কি তুচ্ছ বোধ হয়, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর মধ্যে অনন্ত অফুরন্ত জীবন রয়েছে। বাস্তবিক পৃথিবীতে কিছুই তুচ্ছ নয়, আচ্ছা প্রত্যেক জীবনের একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে।

—নিশ্চয় আছে।

—আমরা যা ভাবি ব্যর্থ, তা ব্যর্থ নয়; যেখানে মনে করলুম হেরে গেছি, হয়ত সেখানেই জিতেছি; মনে করলুম যে লোকটা বৃথা মল্ল, হয়ত সেই সবচেয়ে বেশি বেঁচে গেছে।—দেখ কি সুন্দর দেখাচ্ছে কাজীকে! আ, কি মিষ্টি খোকার হাসি!

বারান্দায় কাজী খোকা-খুকীকে লইয়া খেলা করিতেছিল, তাহাদের কলহাস্যে রমলা দাঁড়াইয়া উঠিল। কাজীর কোলে খুকী ও পিঠে খোকা। এই পক্ককেশ শুভ্রশ্মশ্রু গেরুয়া-রংএর আল্‌খাল্লা-পরা মুসলমানটি দুই গোলাপের মত শিশুকে জড়াইয়া বসিয়া আছে, নব-কিশলয়-ভরা প্রাচীন গাছের মত সুন্দর দেখাইতেছে।

রজত রমলার আঙুর-আঙুল টানিয়া বলিল, কি, উঠ্‌ছ? না, রান্নাঘরে যাওয়া হবে না।

অনুনয়ের স্বরে রমলা বলিল, না, দেখ, আজ ভাল আছি। আচ্ছা, খোকা ঝুরি আলুভাজা খেতে কি ভালোবাসে আর ডিমের বড়া, ও খান্‌সামাটা কিছুতেই করতে পার্‌বে না।

—খুব পার্‌বে।

—আচ্ছা, আমি যেদিন করে' দি, দেখেছ তো, কি আনন্দের সঙ্গে খায়।

—না, লক্ষ্মীটি বস।

রমলা করুণ মিনতির চোখে রজতের দিকে চাহিল। রজত ধীরে উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আচ্ছা, চল, কিন্তু ওই দু'টো হয়ে গেলেই চলে' আস্‌তে হবে।

—আচ্ছা, তাই হবে—বলিয়া রজতের হাত ছাড়াইয়া রমলা রান্নাঘরের দিকে চলিল।

৩৭

সাত বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারিবাগের সেই বাড়িখানি আর ভাঙা-পোড়ো হইয়া নাই, আবার সেখানি রঙীন সুন্দর সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে নূতন ফুলের গাছে ভরা বাগান নানারঙে ঝল্‌মল করিতেছে।

পুরাতন হাস্নাহানা ঝাড়টির স্থানে আর একটি নূতন প্রকাণ্ড হাস্না-হানার ঝাড় জন্মিয়াছে। তাহার চারিদিকে বিকেল-বেলায় একটি মেয়ে ও দুইটি ছেলে লুকোচুরি খেলিতেছে, ঝাড়ের ধারে বারান্দায় এক চেয়ারে কাজী-সাহেব খেলার বুড়ী হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এখন অতিবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এখন আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ছুটিয়া খেলিতে পারেন না, বুড়ী হইয়াই থাকিতে হয়। তাঁহার কোলে

কতকগুলি ছবি, খেলনা, পুতুল ; সেগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া ছেলেরা খেলিতেছে। দীর্ঘ পক্ক দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি উদাস দৃষ্টিতে পশ্চিমের ধূসর গিরিমালার উপর পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপে অস্তমিত সূর্য্যের বর্ণমাধুরীলীলা দেখিতেছিলেন। তাঁহার জীবনসূর্যও শীঘ্রই অস্তমিত হইবে। সূর্য্যের আলো যেমন সম্মুখের ফুলগুলির উপর ঝিকিমিকি করিতেছিল, তেমনি দীপ্তনেত্রে তিনি রহস্যময় শিশুগুলির খেলা দেখিতেছিলেন।

হাস্নাহানা-ঝাড়ের মাথায় দোতলার জানলা হইতে রমলা তাহার ছেলে-মেয়েদের খেলা দেখিতেছিল, আর, মাঝে মাঝে এক একবার বাগানের মধ্যে রজতের দিকে তাকাইতেছিল। ছোটখোকাকে তাহার দিদির লুকানোর জায়গা একটু বলিয়া দেওয়াতে সবাইয়ের কাছে বকুনি খাইয়া রমলা উচ্চ হাসিয়া উঠিল। বাগানের মধ্যে এক ইজি-চেয়ারে বসিয়া রজত কি আঁকিতেছিল, রমলার হাসির শব্দে একটু মুখ ঘুরাইয়া স্নিগ্ধ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিল। এখন রজত এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, দেশে ও বিদেশে তাহার যথেষ্ট নাম ও সম্মান।

ছেলেমেয়েদের খেলা শেষ হইয়া গেল। মাকে দেখিয়া ছোট খুকী বার বার চেঁচাইতে লাগিল, মা, পিয়ানো। রমলা নিচে নামিয়া আসিয়া ছেলে-মেয়েদের লইয়া পিয়ানো বাজাইতে বসিল। এই পিয়ানোটি ললিত জার্ম্মানী হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে এখন এক ফরাসী যুবতীকে বিবাহ করিয়া ফ্রান্সে বসবাস করিতেছে।

বেঠোভেনের সোনাটার সুর ঝঙ্কার শুনিয়া রজতও ঘরে আসিয়া জুটিল।

রমলা পিয়ানো বাজাইয়া চলিয়াছে, সুরপরীরা সমস্ত ঘর নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে, রজত বিমুগ্ধ-নেত্রে পিয়ানো-বাদিনীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই প্রিয়াকে সে এক অপরূপ সন্ধ্যায় প্রথম

পিয়ানো বাজাইতে দেখিয়াছিল। সেই মদের মত তীব্র আবেগময় রূপ নাই বটে কিন্তু এ শান্তস্নিগ্ধ রূপটি তাহার চেয়েও মধুর সুন্দর পবিত্র।

বাহিরে পূর্ণিমার চাঁদের আলো ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছগুলির মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া লালপথে অভ্রগুলির ওপর ঝিকিমিকি করিতেছে। এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রঙীন মায়াপথ দিয়া দুইজনে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে উঠিয়া আসিতেছিল—মাধবী ও যতীন। ইহারা দুইজন নষ্টনীড় শান্তিহারা দুই পাখীর মত পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরিয়াছে। প্রায় দুই বছর ধরিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া তাহারা দেশে ফিরিয়াছে। এখন কিছুদিন তাহারা রমলার অতিথি। সুন্দরী পৃথিবী মাতার বিপুল বক্ষ হইতে নব নব সৌন্দর্য্যধারা, জীবনধারা পান করিয়া তাহারা দেহমনে সুস্থ সবল হইয়া উঠিয়াছে।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া যতীন তাহার কলকারখানা ও ব্যবসায়ীর জীবন একেবারে ছাড়ে নাই বটে, কিন্তু সে এক নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মত্ত হইয়াছে। সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া নূতন আদর্শে নূতন গ্রাম বসাইয়াছে, গঙ্গার মোহনার কাছে ছোট দ্বীপ লইয়া সেখানে পল্লী-নগর প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহার দেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহুলোককে বিনামূল্যে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছে। দুই দ্বীপটির নামকরণ মাধবীর নামে হইয়াছে। এই নব উদ্যোগে মাধবী তাহার বন্ধু, সহায়, শক্তি।

মাধবী ও যতীন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে লাগিল; জ্যোৎস্নার আলোয় লাল বাড়িখানি রূপকথার পুরীর মত, পিয়ানোর সুর পুষ্পগন্ধ-ভারাক্রান্ত বাতাসে মৃদু ভাসিয়া আসিতেছে; দুইজনে হাস্নাহানা কুঞ্জের কাছে আসিয়া এক পাথরের উপর কাছাকাছি বসিল।

পিয়ানোর সুরের ঝর্ণাধারায় যতীনের মন ডুবিয়া তলাইয়া গেল কিন্তু মাধবীর চোখে সমুদ্রগীতমুখর জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত শান্তকুটীরাচ্ছন্ন তাহার

পর ছবি বারবার ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চাষী-মজুরদের পরিবারের শান্তিময় গৃহগুলিতে সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথাও বাঁশী বাজিতেছে, কোথাও সাঁওতালেরা নৃত্য শুরু করিয়াছে, কোথাও ছেলেমেয়েদের লইয়া মা গল্প বলিতেছেন। চাষী-মজুর ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। শালবনের মাথায় পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া সে নবস্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।

পিয়ানোর সুরে ভরা চাঁদের আলো গাছের পাতায় দুলিয়া দুলিয়া সম্মুখের প্রান্তরে ঝরিয়া কাঁপিয়া দূরে শালবনের মাথায় মিশাইয়া চারিদিকে স্বপ্ন-মায়াজাল রচনা করিল। রক্তের মত রাঙা লালমাটির পথ সুদূরের হাতছানির মত, দিগন্তে কোন স্বপ্নলোকের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৩৮

রজতের ডায়েরি হইতে—

জীবনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; রূপের স্রোত, বর্ণের ধারা। হে অরূপ, তোমা হইতেই এই অপরূপ রঙের ঝর্ণা অহর্নিশি ঝরিয়া পড়িতেছে, এই সুধার ফোয়ারা, জগৎচিত্রের নদী।

কিশলয়ের মত শিশু জন্মে, ফুলের মত ফোটে, গানের সুরের মত আসে, পাতার মত ঝরিয়া পড়ে। তারা জ্বলিয়া উঠে, তারা নিবিয়া যায়; মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মানুষ চলিয়া যায়। এই রূপের জগতে বস্তুপুঞ্জ কোন্ প্রাণের আবেগে ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, গলিতেছে, ঝরিতেছে, শূন্যে মিলাইয়া আবার নব নব রূপে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে অরূপ, তোমার তূলির টানে নব নব রূপরেখা আঁকিয়া মুছিয়া আবার নূতন রঙে আঁকিয়া তুমি চলিয়াছ, এক একটি পৃথিবী তোমার হাতের সৌন্দর্য্য-শতদলের একটি পাপ্‌ড়ির মত ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে। অনন্ত আকাশে কোটি কোটি তারায় ঝলমল চন্দ্রাতপতলে সূর্য্যচন্দ্রের

গমনাগমনের ছন্দে সমুদ্রস্তনিত সুন্দরী ধরণীর পটে কত বর্ণের কত ছবি—বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা, আষাঢ়-মেঘের ঘন সমারোহ, শরতের সোনা প্রভাত, শীতের রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ন, মাধবী জ্যোৎস্নারাত্রি—ঋতুর পর ঋ ফুলে ফুলে পা ফেলিয়া জলে স্থলে কত রঙের উত্তরীয় উড়াইয়া তোমা যাত্রা!—হে অপরূপ, তোমাকে নমস্কার!

আমার চোখের সম্মুখে কত সুখ, কত ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে—খুকীর হাসি, ছেলেদের খেলা, প্রিয়ার চাউনি, গায়িকার সুরালোকদীপ্ত আননপদ্ম, বন্ধুর প্রেমের হাসি, শালবনে প্রেমিকপ্রেমিকা, নগরের জনস্রোত, কারখানার কুলিমজুর, ষ্টেশনের যাত্রী, জ্যোৎস্না রাতে তরুণ তরুণী, মানবজীবনের সুখদুঃখের কত চিত্র তুমি আঁকিতেছ! শিল্পী তোমাকে নমস্কার!

পৃথিবীর এই নানা রূপের পুরীতে শুধু আমাকে আমন্ত্রিত কর নাই, এই রূপকথালোকের সোনার কাঠি আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছ! সেই চুনি-মানিকের স্পর্শে জগৎ লাবণ্যে ভরিয়া গিয়াছে। তোমার হাতের একটি তুলি আমার হাতেও দিয়াছ, এই রঙের ঝর্ণাতলায় বসিয়া আমার এ ছোট হৃদয়ের পাত্র ভরিয়া সবাইকে বার বার তোমার আনন্দসুধা পান করাই! অফুরন্ত তোমার রূপের ফোয়ারা, অফুরন্ত আমার হৃদয়-পেয়ালা, আমি ধন্য হইলাম।

বিশ্বলীলাকমল হাতে করিয়া কোন্ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তুমি হাসিতেছ। এ জ্যোৎস্না-রাতে তোমার প্রসন্নমুখের হাসি দেখিয়া নয়ন মুগ্ধ সার্থক হইল। তোমার এই কোটি কোটি রূপের প্রদীপজ্বালা বিশ্ব-মন্দিরে আমারও তুলি দিয়া প্রাণের শিখায় পৃথিবীর অঙ্গনতলে একটি রঙের আরতিপ্রদীপ জ্বালাইয়া ধন্য হইলাম। বিশ্বশিল্পী তোমাকে নমস্কার!

(সন ১৩২৮-২৯।)

় অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি সেই কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম। আমার কার্য্যোদ্ধারের জন্য অত্যন্ত নোংরা কৌশল হইলেও—”

জেরাল্ড ফ্রষ্ট সিন্থিয়ার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “হউক অত্যন্ত রা কৌশল; কিন্তু আমি ইহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য ও অপরিহার্য্য ই মনে করিয়াছিলাম। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীর আদেশ য় করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলে, তোমার সেই অপরাধ ক্ষমা করা

সিন্থিয়া হলগেট কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “কিন্তু—কিন্তু—”

জেরাল্ড ফ্রষ্ট তাহার কুণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “আর ‘কিন্তু’র কোন প্রয়োজন নাই। আর এক সপ্তাহ মধ্যে ক্যাক্সটন হ রেজিষ্টারের আফিসে আমাদের বিবাহ হইবে, ইহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছি আশা করি, এই এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি বিবাহের সকল আয়োজ শেষ করিতে পারিবে। আর একটি কথা তোমাকে বলা হয় নাই; আমি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি চাকরী পাইয়াছি; এতদিন ে ভাবে সংবাদপত্রের সেবা করিয়া আসিয়াছি—তাহার সহিত এই চাকরীর বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে আমি অসাধারণ দক্ষ; আমার এই দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি আমাকে তাঁহার সেরেস্তায় একটি ভাল চাকরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই চাকরীর বেতন ও সম্মান উভয়ই অধিক এবং সংবাদপত্রের সেবার ন্যায় ইহাও জনসেবা।”

‘মর্ণিংমুন’ সম্পাদক গর্ডন জেরাল্ড ফ্রষ্টের পত্র পাইয়া, পরদিন ‘মর্ণিংমুন’এ তাহার ফটো প্রকাশ করিলেন; ঐ প্রকার মূল্যবান্ সংবাদপূর্ণ জরুরী পত্র বহু কালের মধ্যে লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। খ্যায় উক্ত পত্র প্রকাশিত হইল, সেই সংখ্যা লক্ষ লক্ষ

পত্রখানি এইরূপ,—

"ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমাকে আমার অবলম্বিত কার্য্যভার করিতে হইল। সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি এই সংবাদ তাঁপর পত্রিকায় বিঘোষিত করিতেছি যে, আমি আমার পেশা ত্যাগ করিলাতে অতঃপর আমাকে যে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, আমার তাহা আনন্দদায়ক এবং আমি পরমাগ্রহে তাহাতে যোগদান করিতেছি। অতিরিক্ত আমার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই ভবিষ্যতে গালো 'নিশাচর বাজে'র কার্য্যধারার আর কোন পরিচয় পাইবে না।

—নিশাচর বাজ।"

সমাপ্ত